...এবং ইনকুইজিশন



অভীক সরকার

...এবং ইনকুইজিশন

অভীক সরকার



বুক ফার্ম

Ebong Inquisition
by
Avik Sarkar

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২০

প্রচ্ছদ : কামিল দাস
নামাঙ্কন : স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়
অলংকরণ : গৌতম কর্মকার
প্রুফ সংশোধন : তুষার মাজি

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩
মুদ্রক এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

উৎসর্গ

সঙ্ঘমিত্রা সরকারকে

প্রাককথন

দু-হাজার সতেরো সালের আগস্ট মাসের এক মশকবহুল সন্ধে। পরম সুহৃদ গৌতম চক্রবর্তীদা-র বাড়িতে বসে আড্ডা দিচ্ছি, সঙ্গী বলতে নবীন প্রকাশনা সংস্থা 'দ্য কাফে টেবিল'-এর কর্ণধার শ্রীমান অরিজিৎ ভদ্র এবং অগ্রজতুল্য সাহিত্যিক শ্রীরাজা ভট্টাচার্য। আমাদের চারজনের মুখেই চিন্তার ছায়া। যেন কোনো এক অতি জটিল, গভীর এবং গোপন ষড়যন্ত্র রচনা করতে করতে শেষ পর্যায়ে এসে পুরো প্ল্যানের একটা মস্তবড়ো ফাঁক খুঁজে পেয়েছি।

গলাটা খাঁকারি দিয়ে বলে উঠলাম, 'আমার মত ওই দেড়-শো থেকে তিন-শো মতো, বুঝলে তো?'

অরিজিৎ কোল্ড ড্রিঙ্কসের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে উদাস গলায় বলল, 'পাঁচ-শো-র কমে তো খরচায় পোষাবে না গুরু। তবে তুমি যদি তোমার বলো তিন-শো-র ওপরে বিক্রি হওয়া প্রতিটা পিসে তোমার কোনো ইয়ের দাবি থাকবে না, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।'

বলেই ছোকরা মনীষী রাজাদা-র দিকে তাকিয়ে একটা আলতো চোখ মারল, স্পষ্ট দেখলুম। গৌতমদা তাঁর বিশাল চেয়ারে কিঞ্চিৎ রসস্থ মুডে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সামান্য নড়ে ঈষৎ স্খলিত স্বরে বললেন, 'ভা ভা ভালোই তো, বা বা বাকিগুলোর টাকায় আ আ আমরা না হয় পি পি পিকনিক করব?'

সেই শুনে রাজাদা যে প্রসন্ন উদার হাসিটা বিলিয়ে দিলেন, তার দামই লাখ টাকা!

ব্যাপারটা খোলসা করে বলার আগে কিছু প্রাক্ কথন আবশ্যক।

এই কাহিনিরও আরও বছর দুয়েক আগেকার ঘটনা, তখন এই অর্বাচীন কর্ম সূত্রে মুম্বাইতে পোস্টেড। ফেসবুকে চাট্টি স্বভাবসুলভ 'ফাইZলোমি কইরা' দিন কেটে যাচ্ছিল। মাঝেমধ্যে লিখি, তাতে কেউ কেউ পরম করুণাবশত লাইক মেরে যান। ভবের হাটে আমি এক স্বীকৃতিবুভুক্ষু নাদান, সেটাকেই স্বন্ধন্ধোপরি 'শাবাশ বেটা' মার্কা থাবড়ানো বলে মেনে নিই। এমত অবস্থায় ঋতবাক ব্লগজিনের সম্পাদিকা শ্রীময়ী সুস্মিতা বসু সিং আমাকে ধরে বসলেন একটা 'অন্যরকম' গল্প লিখে দেওয়ার জন্য।

আমি অশিক্ষিত মানুষ, সাহিত্যশাস্ত্রে অদীক্ষিতও বটে। কিন্তু সুস্মিতা দেবীর অনুরোধ কিছুতেই ফেলতে পারলাম না। কারণ একে ভদ্রমহিলা অতি জাঁদরেল সম্পাদিকা, তার ওপর রোজ দু-বেলা ফোনে 'লেখাটা কবে দিচ্ছেন' মার্কা তাগাদা পেলে কেই-বা সুস্থ থাকে বলুন?

সে যাই হোক। কোনোমতে একটি ছোটোগল্পের প্লট বানালুম, মনে হল হাজার তিনেক শব্দের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু শাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যে সম্পাদক প্রপোজেস, লেখক ডিসপোজেস। শেষমেশ ঠগি, পুনর্জন্ম, শবসাধনা ইত্যাদি নিয়ে লেখা গল্পটির আকার দাঁড়াল প্রায় দশ হাজার! গল্পটির নাম দিলাম 'শোধ'।

ঋতবাক ব্লগে গল্পটি প্রকাশিত হয়, কথঞ্চিৎ সুখ্যাতিও জোটে। সুস্মিতা বোধ হয় এতটা আশা করেননি, তিনি ধরে বসলেন আরেকটি গল্প লিখে দেওয়ার জন্য। মাথা থেকে হাঁটু, এই দুর্বল শরীরে যা যা খাটানো যায়, সেসব খাটিয়ে আরেকটি গল্প লিখলাম। একটি যুবকের গল্প, বন্ধুর কিউরিও শপ থেকে এক অচেনা তিব্বতি মূর্তি কিনে বিপদে পড়ার গল্প। গল্পের প্রসঙ্গে এল তিব্বত, তন্ত্রসাধনা, বন্ধুর সন্তানের প্রতি এক প্রফেসরের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর রাস্তা থেকে ঘর অবধি উঠে আসা এক পিশাচী। তার নাম দিলাম ডামরী।

আর গল্পের নাম দিলাম 'ভোগ'।

বলতে নেই, গল্পটি বেশ খানিক জনপ্রিয় হয়। ফেসবুকে, মেসেঞ্জারে, হোয়্যাটসঅ্যাপে দু-চারটে 'আগে বড়ো নওজোয়ান, অউর থোড়া হেঁইসা' পেয়ে-টেয়ে ধারণা হল যে গল্পটা বোধ হয় খুব একটা খারাপ লিখিনি। ধারণাটা আরও পোক্ত হল যখন পরম সুহৃদ মৌপিয়ালি দে সরকার এবং আমার পার্টনার ইন ক্রাইম শ্রীময়ী অনুষ্টুপ শেঠ ফোন করে নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক স্বরে জানালেন যে 'ভোগ' গল্পটা মোটের ওপর ভালোই। তবে আশা করা যাচ্ছে যে লিখতে থাকলে হয়তো একদিন এর থেকেও ভালো গল্প লিখতে পারব।

ইত্যবকাশে একদিন 'দ্য কাফে টেবিল'-এর কর্ণধার অভিজিৎ ভদ্রর ফোন। ভদ্রলোক তাঁর নামের সঙ্গে মানানসই ভদ্র এবং অতীব শীতল স্বরে জানালেন যে গল্প দুটি নিয়ে তাঁরা বই করতে ইচ্ছুক। তবে আরও অন্তত দুটি বড়ো গল্প চাই, নইলে বইয়ের সাইজ ঠিকঠাক দাঁড়াচ্ছে না। আমি তো হতভম্ব, বইয়ের সাইজ লেখকের আকারের সমানুপাতিক হতে হবে, এ কেমন অন্যায় দাবি, প্রিয়ে?

সে যাই হোক। ততদিনে আমি বৌদ্ধ বজ্রযান নিয়ে ঘোরতর পড়াশোনায় ডুবে আছি। মাথায় উঁকি দিচ্ছে হিন্দুধর্মের দেব-দেবীদের সঙ্গে কয়েক জন বৌদ্ধ দেব-দেবীর আশ্চর্য সাদৃশ্য। হয়তো সেই চিন্তাই ফুটে উঠল আমার পরের গল্প, 'রক্তফলক'-এ। আমদানি করলাম একটি প্রকৃত ভিলেইন ক্যারেক্টারকে, টেনিয়া। মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম পালযুগে রচিত এক ভয়ংকর অভিশাপের সঙ্গে আধুনিক কলকাতার এক নেশাসক্ত, নারী পাচারকারীর জীবনের গল্পকে। আর সারা গল্পের পটভূমিকা জুড়ে রইলেন এক বৌদ্ধ দেবী, বজ্রবারাহী; যাঁর সঙ্গে অসম্ভব মিল দশমহাবিদ্যার সবচাইতে ভয়ংকরদর্শন দেবী, ছিন্নমস্তার।

আর এই তিনটি গল্প জুড়ে রইলেন বাংলার এক ঐতিহাসিক চরিত্র, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

কৃষ্ণানন্দ যখন 'শোধ' গল্পে প্রথম আবির্ভূত হন, তখনই আমি একটি অতি গর্হিত কালানৌচিত্য দোষ ঘটিয়ে ফেলেছি। 'শোধ' গল্পটি যে সময়ের, কৃষ্ণানন্দ তার শ-দুয়েক বছর আগেকার মানুষ। কিন্তু বাংলার এই মহান তন্ত্রবিদকে গল্পে আনা ছাড়া আমার আর উপায় ছিল না। আমি চেয়েছিলাম এমন একজন ঐতিহাসিক চরিত্রকে আমদানি করতে যিনি তন্ত্রশাস্ত্রে অতি পারঙ্গম এবং একইসঙ্গে যিনি অপশক্তির বিপ্রতীপে সমস্ত শুভশক্তির প্রতীক হিসেবে দাঁড়াবেন। তাই আমি বাংলার তন্ত্রজগতের সবচেয়ে বিখ্যাত নামটিই বেছে নিয়েছিলাম।

'শোধ' প্রকাশিত হওয়ার পরেই আমাকে কেউ বলেছিলেন যে কৃষ্ণানন্দকে টাইম ট্রাভেলার হিসেবে দেখাতে; যিনি বিপদাপন্ন মানুষের ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হন, প্রকট হন যাবতীয় পরাশক্তির প্রতীক, সমস্ত শুভত্বের দ্যোতক হয়ে। যেমন লর্ড অফ দ্য রিংস-এর জাদুকর গ্যান্ডাল্ফ। যেমন হ্যারি পটারের প্রফেসর ডাম্বলডোর।

আর সেই হ্যারি পটারের 'লাভ ইজ দ্য বিগেস্ট ম্যাজিক'-এর সূত্র ধরেই উঠে এল 'এবং ইনকুইজিশন'-এর সারবাক্য বা পাঞ্চলাইন, ভালোবাসাই হল সবচেয়ে বড়ো তন্ত্র, সবচেয়ে বড়ো জাদু।

'এবং ইনকুইজিশন' নামকরণ হয়েছে অবশ্য চতুর্থ উপন্যাসটি থেকে, যার নাম 'ইনকুইজিশন'। এর সূত্রপাত প্রায় বছর পাঁচেক আগে গোয়া বেড়াতে গিয়ে। সেখানে গিয়ে আমি বম জিসাস দেখে ভারি বিমোহিত হই। আর কোনো কিছু নিয়ে মোহিত বা বিমোহিত হলেই সেই নিয়ে আমি কিছু জানার চেষ্টা করে থাকি। হাতের কাছে এই বিষয়ে কোনো বই ছিল না বটে, তবে হোটেলে ফ্রি ওয়াই-ফাই ছিল। সেই রাতেই হোটেলের রুমে শুয়ে উইকিপিডিয়াতে বম জিসাস তথা গোয়ার ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে অবগত হই গোয়ার ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়ের, ইনকুইজিশন!

মনটা বিক্ষিপ্ত হয়েই ছিল। পরের দিন সপরিবার যাই গোয়ার মিউজিয়াম ঘুরতে। সেখানেই একটি অতি বিচিত্রদর্শন মূর্তি দেখি। মূর্তির পরিচয়জ্ঞাপক প্লেটে লেখা ছিল যে এটি ভারতের একমাত্র বেতালমূর্তি যার পুজো করা হয়। আর এই মূর্তি এসেছে আমোনা গ্রাম থেকে, ভারতে একমাত্র গ্রাম যেখানে বেতালকে গ্রামদেবতা হিসেবে পুজো করা হয়।

সেই রাতেই আমার মাথায় জন্ম নেয় ইনকুইজিশন-এর গল্পের অবয়ব।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আমি সবসময়ই গল্পের ক্লাইম্যাক্স বা শেষ অংশটা ভেবে তবেই গল্প লেখায় হাত দিই। যতক্ষণ না শেষ দৃশ্যটি মাথায় সম্পূর্ণ রূপ নিচ্ছে, ততক্ষণ আমি লেখা শুরু করতে পারি না। এক্ষেত্রে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ইনকুইজিশন-এর শেষ দৃশ্যটি, যেখানে কোনো এক মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে একটি কৃষ্ণবর্ণা বালিকা, যার পরনে লাল কালো শাড়ি আর সিঁড়ির শেষ ধাপ পেরিয়ে সে ডান হাত তুলে বলছে, 'তিষ্ঠ', এই দৃশ্যটি আক্ষরিক অর্থেই স্বপ্নাদ্য। বাকি পুরোটাই স্বকপোলকল্পিত।

এইখানেই আমদানি করেছি একটি পর্তুগিজ চরিত্রকে, যার নাম মার্টিনেজ ভাজ; যিনি ইউরোপের যোদ্ধশ্রেষ্ঠ সুপারকম্যান্ডো। ঘনিষ্ঠ বৃত্তে লোকে তাঁকে ডাকে 'ইউরোপের ইস্পাত' বলে। তাঁর সাহস, কর্মদক্ষতা, নেতৃত্বগুণ সবই ইস্পাতকঠিন। আর্তের প্রয়োজনে তিনি একা হাতে জনা দশেক ক্রিমিনালের সঙ্গে মহড়া নিতে দ্বিধাবোধ করেন না। এই উপন্যাসে আমি দেখাতে চেয়েছি যে মানুষের উত্তরণ তার কর্মে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য কোনো অর্জিত সম্পদে নয়। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চেয়েছি যেমন পুণ্যের কোনো ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স থাকে না, তেমনই পাপের উত্তরাধিকার বলেও কিছু হয় না। প্রত্যেককেই তার জীবনের যাবতীয় পাপ ও পুণ্যের হিসেব এই জীবনেই চুকিয়ে যেতে হয়। মানুষের সাহায্য করলে মানুষই সাহায্য করবে, সে সাহায্য যতই ঐশী হোক না কেন! তাই গল্পের শেষ বাক্যে মার্টিনেজ তাঁর ছেলে তিয়াগোকে বলেন, 'বি গুড টু দিস ওয়ার্ল্ড, দিস ওয়ার্ল্ড উইল বি গুড টু ইউ। তারজন্য ম্যাজিক শিখতে হবে না সোনা, ভালোবাসতে শিখলেই হবে। সবসময়ে মনে রাখবে ভালোবাসাই হল সবচেয়ে বড়ো ম্যাজিক, সবচেয়ে বড়ো জাদু।'

আশা রাখি, একদিন আমার অন্য কোনো উপন্যাসে মার্টিনেজ ভাজকে আমি আবার ফিরিয়ে আনতে পারব। ইওরোপের ইস্পাত ফিরবেন, ফিরবেনই।

আপাতত ফিরে আসি প্রথম কাহিনিতে। গৌতমদা-র বাড়িতে সেদিন আমি অরিজিৎকে বলেছিলাম 'এবং ইনকুইজিশন' যেন তিন-শো কপির বেশি ছাপা না হয়। আমার ঘোর সন্দেহ ছিল এই বই তিন-শো কপির বেশি বিক্রি হবে কি না। আমার পরম সৌভাগ্য যে সেদিন অরিজিৎ আমার পরামর্শ শোনেনি, প্রথম প্রিন্টেই হাজার কপি ছাপাবার ঝুঁকি নিয়েছিল। আজ স্বীকার করতে বাধা নেই, ওর সিদ্ধান্তই ছিল ঠিক। আজ অবধি 'এবং ইনকুইজিশন' বিক্রি হয়েছে প্রায় তিন হাজার কপি।

প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকদের অকুণ্ঠ আনুকূল্য পেয়েছে এই বইটি। এই সামান্য, অতি নগণ্য কলমচি ভেসে গেছে পাঠকদের অপার ভালোবাসায়। অনেক সাহিত্যগ্রুপে এর উচ্চপ্রশংসিত রিভিউ বের হয়। প্রচুর পাঠক আমাকে তাঁদের ভালোলাগা ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

খুব সম্ভবত সেই আশীর্বাদের ফল হিসেবেই 'ভোগ' গল্পটি নির্বাচিত হয় রেডিয়ো মির্চির সানডে সাসপেন্সে পঠিত হওয়ার জন্য। এর পেছনে পরম সুহৃদ, বন্ধুবর শ্রীসন্ময় দে-র ভূমিকা আমি কোনোদিনই ভুলব না। ভুলব না রেডিয়ো মির্চির দীপ, এখন যে দীপ আমার কাছের বন্ধু, তার কথাও। রেডিয়ো মির্চির টিমের বাকিদের সঙ্গে অয়ন্তিকা এবং গোধূলির যথাক্রমে ডামরী এবং মাতঙ্গীর অভিনয় শ্রোতাদের মন জিতে নেয়। শেষ অবধি পাওয়া খবর অনুযায়ী প্রায় বারো লাখ লোক গল্পটি ইউটিউবে শুনেছেন। আজ অবধি সানডে সাসপেন্স-এর সর্বাধিক শ্রুত গল্প হচ্ছে 'ভোগ'।

তবে রোমাঞ্চর আরও বাকি ছিল। আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে কল্যানী থেকে কাজকর্ম মিটিয়ে ফিরে আসছি, আমার ফোনে একটি কল আসে। ভদ্রলোক নিজের নাম বলেন রাজর্ষি দে, পেশায় তিনি একজন পরিচালক। তিনি জানান আমার বইয়ের তিনটি গল্প নিয়ে একটি সিনেমা বানাতে চান। বলা বাহুল্য, প্রথমে শুনে ভদ্রলোককে আমি স্রেফ হাঁকিয়ে দিই, ব্যাপারটাকে ঠাট্টা মনে হয়েছিল। পরে বুঝতে পারি যে ভদ্রলোক সত্যিই 'এবং ইনকুইজিশন'-এর প্রথম তিনটে গল্প নিয়ে সিনেমা বানাতে চান। তাঁকে আমি আমার

অফিসে আসতে বলি এবং প্রথম আলাপেই আপাদমস্তক নিরীহ এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দিব্যি দোস্তি হয়ে যায়। একদিন প্রযোজক সুচন্দ্রা ভানিয়ার বাড়িতে গিয়ে আলাপও করে আসি।

তারপর কাস্ট সিলেকশন, শুভ মহরত, শুটিং এসবই শুরু হয়ে যায় জোরকদমে। আমি মাঝে মাঝেই রাজর্ষি এবং সুচন্দ্রার টিমের ফেসবুক পেজ থেকে আপডেট পেতাম। অবশেষে গতকাল, অর্থাৎ বাইশে নভেম্বর রিলিজ করেছে রাজর্ষি দে-র পরিচালিত এবং সুচন্দ্রা ভানিয়া প্রযোজিত চলচ্চিত্র 'পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ, উত্তর আসবেই।' সারা শহর ছেয়ে গেছে পোস্টার, হোর্ডিং আর ব্যানারে। আমার নিজের কাছেও ফেসবুক থেকে সিনেমা হল পর্যন্ত উত্তরণের পর্যায়টি স্বপ্নের মতো লাগছে বই কী!।

ইতিমধ্যেই অবশ্য আরেক বদল ঘটে গেছে 'এবং ইনকুইজিশন'-এর জীবনে। দু-হাজার উনিশ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে এই বইটির দায়িত্ব নিতে চলেছেন 'বুক ফার্ম' নামের সুপরিচিত প্রকাশনা সংস্থা। বুক ফার্মের শান্তনু ঘোষকে আমি অনেক আগে থেকেই চিনি তার ব্যতিক্রমী প্রয়াস এবং তুখোড় মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির জন্য। তা ছাড়া বইয়ের ব্যাপারে শান্তনু-র যত্ন, চিন্তাভাবনা সবই খুব চমকপ্রদ এবং অন্যদের থেকে আলাদা। যে যত্নের সঙ্গে এঁরা একটি বইয়ের বিপণন করেন সেটা শেখার মতো।

'বুক ফার্ম' যেভাবে এই বইটিকে প্রচুর ইলাস্ট্রেশন সহ সাজিয়েছেন তারজন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। বুক ফার্ম টিমের জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা রইল। ইলাস্ট্রেশনের সঙ্গে রইল তন্ত্রের ইতিহাসের ওপর আমার লেখা একটি ছোটো প্রবন্ধ।

কৃতজ্ঞতা জানানো বাকি রয়ে গেল আরও তিন জনের কাছে। প্রথম সংস্করণের কভার এঁকেছিলেন বন্ধুবর শান্তনু মিত্র। এবং শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি একটিও পয়সা নেননি। এই ভালোবাসার কোনো দাম হয় না।

এর পরের কভারটি আঁকেন স্বর্ণাভ বেরা। ছোকরাকে আমি বইটা উপহার হিসেবে দিয়েছিলাম। রাত আটটায় তার কাছ থেকে আমার মোবাইলে একটি বার্তা ভেসে আসে, 'দাদা, পড়া শুরু করলাম।' পরের দিন সকাল ন-টা নাগাদ যে রাফ স্কেচটি ছোকরা আমাকে পাঠায় তা দেখামাত্রই আমি চমকে যাই। প্রথম কভার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং একইরকম চিত্তাকর্ষক সেই কভার বহুদিন যাবৎ 'এবং ইনকুইজিশন'-এর অঙ্গশোভা বর্ধন করেছে।

বুক ফার্মের পক্ষ থেকে এই কভারটি এঁকেছেন কামিল দাস, অলংকরণে গৌতম কর্মকার। ক্যালিগ্রাফিটি করেছেন আমার স্নেহভাজন স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়। সম্পূর্ণ অন্যধরণের আঙ্গিকে আঁকা একটি অতীব ভয়াল কভার, আশা করি পাঠকদের ভালো লাগবে।

আমি চিরকালই বিশ্বাস করে এসেছি যে পাঠকই আসল সম্রাট। তাঁরা পড়েন বলেই লেখকেরা লেখেন। আশা করি যে অনাবিল ভালোবাসায়, অকুণ্ঠ আশীর্বাদে তাঁরা 'এবং ইনকুইজিশন'-এর অদ্যাবধিকালের যাত্রাপথ ভরিয়ে দিয়েছেন, তার থেকে এই নবকলেবরায়িত, পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণটি বঞ্চিত হবে না। আপনাদের সেই আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এখানেই শেষ করছি। অলমিতি।

অভীক সরকার।
কলকাতা।
২৩ নভেম্বর, ২০১৯

তন্ত্র

এই শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে প্রথম যে অনুভূতিটি জাগ্রত হয় তার নাম ভয়। কোনো এক অশরীরী ভয়, দুর্নিবার রহস্যের ভয়, সর্বগ্রাসী সর্বনাশের ভয়। কারণ তন্ত্র বলতে আমরা শুধুমাত্র একটি জিনিসই বুঝি, কোনো এক অতিলৌকিক পৈশাচিক প্রক্রিয়া বা শক্তি, যার সঙ্গে কোনো এক অশরীরী রহস্যের ইঙ্গিত রয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, এর পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। তন্ত্রবিদ্যা বলতে আমরা এখন বুঝি শ্মশানে বা কোনো গুপ্তস্থানে আচরণীয় কিছু ভৌতিক অলৌকিক প্রক্রিয়া, যার দ্বারা কারো ক্ষতিসাধন করা হয় বা কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। আর যাঁরা এইসব ক্রিয়াকর্মে সিদ্ধ, তাঁদের বলে তান্ত্রিক। একে তো এসবই ভূতপ্রেত অপদেবতা সংক্রান্ত ব্যাপার। তার ওপর এঁদের বেশভূষা অশন বসন কথাবার্তা আচার-আচরণ এতই বিচিত্র, যে সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মনে তা যুগপৎ কৌতূহল এবং ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। তাঁদের একটি হ্রীংক্লীংফটফটস্বাহা শুনলেই মনে হয় এই রে, ওই বুঝি কোনো বীভৎসদর্শন প্রেত ভয়ংকর মুখব্যাদান করে তেড়ে এল বলে!

তন্ত্র সম্বন্ধে আরও একটি আকর্ষণীয় এবং আগ্রহোদ্দীপক দিক হচ্ছে এর সরল, প্রকৃতি অভিমুখী জীবনযাত্রা এবং নারী পুরুষের যৌন স্বাধীনতার ধর্মীয় বিধান। এই বিষয়ে বিদেশিরা অধিক উৎসাহী। বিদেশিদের কাছে কামসূত্রের পর প্রাচ্যদেশীয় যৌনতার সবচাইতে বেশি আকর্ষক এবং উত্তেজক অভিজ্ঞান হল তান্ত্রিক সেক্স!

বলা বাহুল্য, এসবই তন্ত্র নামক বিশাল জ্ঞানবারিধির অতীব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নখণ্ড, বরং বলা উচিত অপতন্ত্রের ক্লেদময় অংশবিশেষ। তন্ত্র বলতে যাঁরা একমাত্র মারণ উচাটন বা তান্ত্রিক যৌনাচার বোঝেন, তাঁরা খুব সম্ভবত ইলেকট্রিসিটি বলতে ইলেকট্রিক চেয়ার বোঝেন, মাতৃভূমি বলতে মাতৃভূমি লোকাল।

অথচ আমরা খেয়াল করি না যে বর্তমান হিন্দুসমাজের স্মার্ত প্রথা ও ধার্মিক পূজা পদ্ধতির অধিকাংশই তান্ত্রিক কৃত্য। যেমন ষটকর্ম, দীক্ষাদান, বীজমন্ত্র, দশবিধ সংস্কার, ধারণী, মুদ্রা, ঘটস্থাপন, যন্ত্রাঙ্কন-- সবই তান্ত্রিক ধর্মাচার। এবং এর ওপর শুধু বৈদিক নয়, বৌদ্ধ এবং জৈনতন্ত্রেরও প্রবল প্রভাব রয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বর্তমান হিন্দুধর্মের পূজা প্রকরণ যতটা না বৈদিক তার থেকে অনেকাংশে বেশি তান্ত্রিক!

তন্ত্র একটি এতই বিশাল শাস্ত্র যে তার প্রকৃতি, প্রকরণ, চর্চা, দর্শন, ইতিহাস এইসব নিয়ে নমস্য ভারততত্ত্ববিদেরা অজস্র বই লিখে গেছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে আমি তন্ত্রচর্চার ইতিহাসের ওপর একটি অত্যন্ত অতিসাধারণী বা সুপারফিশিয়াল ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব মাত্র।

তন্ত্র শব্দের অর্থ নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিস্তর বাদানুবাদ আছে। কেউ বলেন তনুকে যা ত্রাণ করে তাই তন্ত্র। কেউ বলেন তন্ মানে ছড়িয়ে দেওয়া, তানেত্ মানে জ্ঞানবৃদ্ধি। তন্ত্র শব্দের অর্থ তাই জ্ঞানের বিস্তারসাধন করা— 'তনোতি বিস্তারং করোতি', অথবা, 'তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানং অনেন ইতি তন্ত্রম্।' কেউ-বা বলেন তন্ত্র হল সেই শাস্ত্র যা তত্ত্ব ও মন্ত্রকে যুক্ত করে, 'মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ।'

বস্তুতপক্ষে যেকোনো শাস্ত্রকে বোঝাতেই তন্ত্র শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন সাংখ্যদর্শনের অন্য নাম কাপিলতন্ত্র, ন্যায়দর্শনের নাম গোতমতন্ত্র, মীমাংসা দর্শনের নাম পূর্বতন্ত্র। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বেদ বা শ্রুতির সঙ্গে তন্ত্র সমান মর্যাদার অধিকারী। মনুসংহিতার ব্যাখ্যায় হারীতঋষির

যে প্রসিদ্ধ বচনটি কুল্লুকভট্ট উদ্ধৃত করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, ‘শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা— বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।’ অর্থাৎ শ্রুতি, বা অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র দুই প্রকারের, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী।

তন্ত্র শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে, ৭১.৯ সূক্তে। এই দশম মণ্ডলেই ১৪৫ এবং ১৫৯ নং সূক্তে যে সপত্নীবিনাশ এবং পতিবশীকরণের মন্ত্রের কথা উল্লিখিত আছে তা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন, ‘এই যে তীব্র ওষধিযুক্ত লতা...ইহাদ্বারা সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়, ইহাদ্বারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়। ...হে ওষধি, তুমি প্রধান; আমি যেন প্রধানেরও প্রধান হই। আমার সপত্নী যেন নীচেরও নীচ হইয়া থাকে। ...হে ওষধি, তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা... আইস আমরা উভয়ে ক্ষমতসম্পন্ন হইয়া সপত্নীকে হীনবল করি। ...আমি ইহা বুঝিয়াছি, সকল সপত্নী আমার নিকট পরাস্ত। আমি স্বামীকেও বশ করিয়াছি। ...আমার শত্রু জীবিত থাকে না, শত্রুদিগকে আমি বধ করি, জয় করি, পরাস্ত করি।... আমি এইসকল সপত্নীদিগকে জয় করিয়াছি, পরাস্ত করিয়াছি। সে কারণে আমি এই বীরের ওপর প্রভুত্ব করি, পরিবারবর্গের ওপরেও প্রভুত্ব করি।’

শুধু তাই নয়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২/৩/৯/১) সাংগ্রহণী নামে একটি ইষ্টির বিবরণ পাওয়া যায়। এই সাংগ্রহণী ইষ্টি এবং বশীকরণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে সোমকে বশীভূত করার জন্য প্রজাপতিদুহিতা সীতা আভিচারিক ক্রিয়ার সাহায্য নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ঐতরেয় আরণ্যকে (৪/২৭) এমন একটি মন্ত্রের উল্লেখ আছে যা সায়নাচার্যের মতে অভিচার কর্মে প্রযুক্ত হয়।

তবে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকের মতে অথর্ববেদের সৌভাগ্যকাণ্ড থেকেই ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক তন্ত্রের উদ্ভব। একদা নয়টি ভাগে বিভক্ত অথর্ববেদের একটি শাখার নাম ‘পৈপ্পলাদসংহিতা’। ভারতের পূর্বাঞ্চলে এর খ্যাতি এবং প্রসার ছিল বিপুল। বলা বাহুল্য, ভারতের পূর্বাঞ্চলে তন্ত্রচর্চার যে বিপুল ও সুমহান ঐতিহ্য আছে, তার সঙ্গে পৈপ্পলাদসংহিতার জনপ্রিয়তার সাযুজ্য লক্ষণীয়।

পৈপ্পলাদসংহিতায় ভক্তিপ্রার্থনা এবং বিবিধ দার্শনিক আলোচনার সঙ্গে রয়েছে রোগমুক্তির জন্য বিবিধ তাবিজকবচের ব্যবস্থা এবং মারণ উচাটনের উল্লেখ। যেমন ‘স মে অস্তু ন্যাক্ষক’, সে যেন আমার থেকে হীনতর হয়। ‘শাসাই শ্বশুরা উভৌ’, অর্থাৎ শ্বশুর শাশুড়ির ওপর যেন আমার আধিপত্য জন্মে। ‘মৃধি অভিঘাতীর্ব্যস্য’, অনিষ্টকারীর সর্বনাশ হোক।

শুধু তাই নয়, অথর্ববেদে বিবিধ জাদুবিশ্বাসের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হয়। এখানে উল্লিখিত একজাতীয় জাদুমন্ত্রকে বলা হয় ‘ভৈষজ্যানি’। প্রথম কাণ্ডে উল্লিখিত কয়েকটি মন্ত্রের নাম হল ‘মূত্রমোচনম’, ‘যক্ষ্মনাশনম’, ‘রুধিরস্রাবনিবৃত্তয়ে ধমনীবন্ধনম’ ইত্যাদি। অর্বাচীন কালের ঝাড়ফুঁকের সঙ্গে এর ব্যবধান সামান্যই। বোধকরি সেইজন্যেই নেপাল দরবার লাইব্রেরিতে খুঁজে পাওয়া ‘কালীকুলার্ণব’ পুঁথির প্রথমেই বলা আছে, ‘অথাত আথর্বণসংহিতায়াং দেব্যুবাচ।’ এমনকী রুদ্রযামলের ১৭শ পটলে স্বয়ং মহাদেবীকে বলা হয়েছে ‘অথর্ববেদশালিনী’।

এখান থেকেই ভারতবর্ষে তন্ত্রের আবির্ভাবের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। স্যার জন উডরফ এবং অধ্যাপক উইন্টারনিজের মতো কয়েক জনকে বাদ দিলে অধিকাংশ পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতদের মতে তন্ত্রের উৎপত্তি ভারতের বাইরে। অধ্যাপক গ্রিয়ার্সনের মতে ভারতে আর্যদের অভিবাসনের সঙ্গে সঙ্গে আর্যাবর্তে তন্ত্রের প্রবেশ ঘটে। আর্যদের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী বৈদিক ধর্মের সূচনা ঘটায়, তাদেরই বাকি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ভারতে তন্ত্রধর্মের প্রচলন করে। ডি বি স্পুনার থেকে শুরু করে অনেকেই বলেছেন যে পারসিক পুরোহিত বা মেজাইদের হাত ধরেই ভারতে তন্ত্রের প্রবেশ। হডসন আবার সেমেটিক জনজাতির ধর্মাচরণের সঙ্গে ভারতীয় তন্ত্রের মিল খুঁজে পেয়েছেন। বলা বাহুল্য এর বিরুদ্ধেও যুক্তি কম নেই। ‘ললিতসহস্রানাম’-এর ভাষ্যকার ভাস্কররায়ের মতে তন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল উপনিষদের অংশরূপেই, - যেমন শ্রৌতসূত্রকে বৈদিক সাহিত্যের অংশরূপে গণ্য করা হয়। তা ছাড়াও অথর্ববেদ থেকে শুরু করে তৈত্তিরীয়

আরণ্যক, বৈদিক সাহিত্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে অপ্রধান ধর্মচেতনা হিসেবে তন্ত্রের উপস্থিতি কোনোমতেই উপেক্ষণীয় নয়।

এখানে বলে রাখা ভালো যে এই তর্কে দু-পক্ষের ভাষ্যই সমানভাবে বিচার্য এবং গ্রহণযোগ্য। বস্তুতপক্ষে তন্ত্রচর্চার যে বাহ্যিক কৃত্যগুলি আমাদের চোখে পড়ে, তার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত আদিম ধর্মবিশ্বাসের প্রভূত মিল আছে। যেমন মন্ত্র বা জাদুক্রিয়ার মাধ্যমে আরোগ্যলাভ তথা শত্রুবিনাশ, উপাসনায় মদ্যাদির ব্যবহার, বলিদান, ইন্দ্রিয়াসক্তিমূলক কার্যকলাপ (যেমন দেবীস্থানে প্রকাশ্যে যৌনসংসর্গ, লিঙ্গপূজা), আপাত নিরর্থক শব্দসমষ্টির অলৌকিক শক্তির ওপর অন্ধবিশ্বাস, প্রভৃতি। ফলে একথা মেনে নিতে অসুবিধা নেই যে প্রাচীনতম ধর্মবিশ্বাসগুলির মধ্যেই তন্ত্রের আদিচিহ্নগুলি নিহিত। এবং সেইজন্যই তন্ত্রোপাসনার চরিত্র একান্তভাবেই লোকায়ত। শুধু যে লোকায়ত তা নয়, এই ধর্মাচার বহুধাবিস্তৃত, বহুবিচিত্র এবং সদাপ্রবহমাণ। মানুষের জাগতিক এবং বৈষয়িক জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রচর্চারও বিবর্তন ঘটেছে।

খুব সম্ভবত সেই কারণেই বৈদিকমত এবং তান্ত্রিকমতের মধ্যে বিরোধের ইতিহাস সুদীর্ঘ। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা আছে যে তন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে বৈদিক শ্রাদ্ধাদি নিষিদ্ধ। কূর্ম্মপুরাণমতে পাঞ্চরাত্র ও পাশুপতদের সঙ্গে বাক্যালাপও পাপ। এ ছাড়াও বরাহপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে এসব পুরাণের মর্মকথা হচ্ছে জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য বা বেদবিরোধী জনগণের আশ্রয়স্থল হিসেবে তন্ত্রের উৎপত্তি। যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতির যে অনুবাদ অপরার্ক করেছেন, তাতে এও লেখা আছে যে কাপালিক, পাশুপত এবং শৈবদের দেখলেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ছুঁয়ে ফেললে তো স্নান করা অবশ্যকর্তব্য!

এদিকে আবার তন্ত্রশাস্ত্রেও বৈদিক উপাসনা পদ্ধতির নিন্দামন্দ কম নেই। কাকচণ্ডেশ্বরীতে উল্লিখিত আছে, ‘বেদানাঞ্চ বয়োহর্থেন ন সিদ্ধিস্তেন জায়তে’, অর্থাৎ বেদের মতো একটি স্থবির শাস্ত্রের পক্ষে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নয়। কুলার্ণবতন্ত্র কৌলমার্গের বিখ্যাত শাস্ত্র, সেখানে শাস্ত্রকার লিখছেন, ‘বেদস্মৃতিপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব। ইয়স্তু শাম্ভবীবিদ্যা গোপ্যা কুলবধূরিব।’ স্পষ্টতই এখানে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহকে সামান্য গণিকা এবং শাম্ভবীবিদ্যা, অর্থাৎ তন্ত্রবিদ্যাকে কুলবধূর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

এই বিরোধকে দু-ভাবে দেখা যায়। প্রথম মত হচ্ছে যে বৈদিক ধর্ম প্রথম থেকেই সমাজের মান্যগণ্য এবং প্রভাবশালী অংশের ধর্ম। অন্যদিকে তন্ত্র প্রথম থেকেই প্রকৃতিপূজক, অন্তেবাসী এবং প্রান্তিক মানুষদের আচরণীয় ধার্মিক এবং বৈষয়িক কৃত্য। ভারতীয় সমাজ যেহেতু অসংখ্য বৃত্তিজীবী জনগোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত একটি বহুত্ববাদী সমাজ, তাই প্রতিটি বৃত্তি তথা জাতিভিত্তিক সমাজের নিজস্ব জীবনশৈলী এবং গোষ্ঠীগত বিশ্বাসের ছাপ পড়েছে ভারতীয় তন্ত্রদর্শনের ওপর। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে জাতিভেদপ্রথা আসলে কৌমসমাজের অসমাপ্ত বিলোপের পরিণাম। ফলে বিভিন্ন আদিম কৌমসমাজের এমন কিছু বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান বা দার্শনিক ধারণা তন্ত্রে মিশে গেছে যেগুলো বৈদিক আদর্শের বিরোধী। সেই কারণেই তন্ত্রকে বেদবাহ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় মত হচ্ছে যে এই সংঘাত আসলে পুরুষশাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে মাতৃতান্ত্রিক অনার্যধর্মবিশ্বাসের সংঘাত। বলা বাহুল্য এই মত প্রচারের পেছনে ঐতিহাসিক বা তাত্ত্বিক কারণের থেকে রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কায়েমি স্বার্থের উসকানি রয়েছে বেশি। এই অতিসরলীকরণের ভাবার্থ হচ্ছে পূর্বদেশীয় (পড়ুন বঙ্গদেশীয়) মাত্রেই অনার্যবংশোদ্ভূত তথা মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী, এবং উত্তরভারতীয় মাত্রেই কঠিন কঠোর নারীবিদ্বেষী বৈদিক আর্য। বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা অত তরল ও সরল নয়।

একথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি আদিম কৃষিজীবী কৌমসমাজে মাটি বা ভূমির উৎপাদক শক্তির সঙ্গে নারীজাতির প্রজননশক্তিকে এক এবং অভিন্ন করে দেখার রীতি বর্তমান। সমস্ত পৃথিবীতে যাবতীয় জনজাতির মধ্যে এই আদিম বিশ্বাসচিহ্ন রয়ে গেছে। এই আদিম বিশ্বাসপুঞ্জ থেকেই একদিকে যেমন কুমারীবলির উদ্ভব,

আরেক দিকে দেবীপূজার প্রচলন। এই একই কারণে (জননাত্মক শক্তিকে পরমতম শক্তির আধার হিসেবে দেখার ফলে) তন্ত্রপূজায় ইন্দ্রিয়ানুষ্ঠানের এত অবারিত প্রচলন। এখন যেভাবে প্রাচীন কৌমসমাজের রীতিনীতি আধুনিক তন্ত্রাচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে স্বীকৃত হয়ে গেছে, তাতে মনে করা কঠিন নয় যে এ হচ্ছে বহুবছর ধরে সহাবস্থিত দুইটি বিপরীতধর্মী অথচ পরিপূরক ধর্মমতের মিলনাত্মক মিথস্ক্রিয়ার ফল। তাই আজ বেদের রুদ্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান দেবাদিদেব মহাদেব। পর্ণশবরী, চণ্ডিকা মতো অন্ত্যজজাতির আরাধ্য দেবীরা হিন্দুধর্মের প্রধানতম দেবীদের মধ্যে পরিগণিত হন। কিন্তু তাকে বঙ্গদেশীয় বনাম উত্তরভারতীয় বিদ্বেষের রূপদান করার এই যে হাক্লান্ত চেষ্টা, তার পেছনে একটি সুস্পষ্ট রিলিজিও-পলিটিক্যাল ষড়যন্ত্রের ছায়া স্পষ্ট।

এখানেই তার্কিকরা প্রশ্ন তুলবেন যে তাহলে পূর্বদেশে তন্ত্রমন্ত্রের এত প্রাদুর্ভাব কেন? কেনই-বা শাস্ত্রবচন বলে, 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা, মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃতা। ক্বচিৎ কচিন্মাহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা।' শ্লোকটি অর্বাচীন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে এই প্রশ্ন রয়েই যায়, যে বিদ্যা গৌড়ে প্রকাশিত হয়ে মিথিলায় (অধুনা মধুবনী দ্বারভাঙা অঞ্চল) প্রবলস্রোত ধারণ করে, কেনই-বা তা আরও পশ্চিমে গুর্জরদেশে গিয়ে লয়প্রাপ্ত হবে?

এর পেছনে কথঞ্চিৎ নৃতাত্ত্বিক কারণও আছে বই কী। 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' নামক সুবিখ্যাত বইটিতে অতুল সুর দেখিয়েছেন যে বাঙালি আসলে আলপাইন আর্য এবং প্রোটো অস্ট্রালয়েডদের থেকে উদ্ভূত একটি মিশ্রজাতি। বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছি না, কারণ সে গুরুগম্ভীর বিষয়ের প্রবেশপথই যথেষ্ট বিজৃম্ভণক্লিষ্ট। তবে সেই আলোচনা থেকে অনুমিত হওয়া অসম্ভব নয় যে সেই প্রোটো অস্ট্রালয়েড বা আদি অস্ট্রাল রক্তের গুণে আমাদের সমাজে আদিম কৌমধর্মের প্রচুর প্রভাব রয়ে গেছে। আমাদের শাক্তসাধনা সেই আদিম মাতৃতান্ত্রিক অস্ট্রালয়েড জাতির প্রকৃতিপূজা এবং নারীজাতির ক্ষমতায়নের গর্বিত উত্তরাধিকার। তাই কৌমবিশ্বাসআশ্লিষ্ট তন্ত্রধর্মে বাঙালির রুচি কিঞ্চিৎ অধিক হবে, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

বিষয়টিকে সামাজিক দিক থেকেও দেখা যায়। বাঙালির তন্ত্রবিশ্বাস যতটা লৌকিক হিন্দুধর্মের অনুসারী, ঠিক ততটাই বজ্রযানী বৌদ্ধতন্ত্রদ্বারা অনুপ্রাণিত। দীর্ঘস্থায়ী বৌদ্ধপ্রভাবের ফলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এখানে হিন্দুদের জাতিগত সংস্কার অনেক শিথিল। তাই যে ধর্ম ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অমান্য করতে বলে, বা নীচ জাতির মানুষদেরও সাধনায় সিদ্ধ হলে গুরুপদে বরণের বিধান দেয় তাতে আমাদের উৎসাহ থাকবে সে তো স্বাভাবিক।

বাঙালির শাক্তধর্মে আসক্তিও আসলে তন্ত্রমতে নারীশক্তির আরাধনার উদ্যাপন। শাক্তধর্ম অনুযায়ী নারীমাত্রেই মহামায়া, তিনি পেশায় গণিকা হলেও। তন্ত্রমতে নারী কখনো অধঃপতিত হতে পারেন না, সাধনায় সিদ্ধি ঘটলে তিনিও পুরুষের মতো দীক্ষাদানের সমান অধিকারী। বহুদিন ধরে অসংখ্য লাঞ্ছিতা, পরিত্যক্তা, অপমানিতা নারীদের বাঙালির তান্ত্রিক বিশ্বাস আশ্রয় দিয়েছে, তাঁদের ভৈরবী, সাধিকা, যোগিনী বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে হয়তো ফেরানো যায়নি, কিন্তু অন্তত মর্যাদার আসন দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

তন্ত্র কোথা থেকে এল, এই কূটপ্রশ্নটির মতো আরেকটি বিতর্ক এখনও প্রবলভাবে জীবিত। তা হচ্ছে হিন্দুতন্ত্র হতে বৌদ্ধতন্ত্রের উৎপত্তি নাকি তার বিপরীতটাই ঠিক? এ প্রসঙ্গে মহা মহা পণ্ডিতদের মধ্যে বিপুল মতদ্বৈধতা আছে। একপক্ষে যদি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থাকেন তো অন্যদিকে আছেন গোপীনাথ কবিরাজ বা নগেন্দ্রনাথ বসু-র মতো প্রাচ্যবিদ্যার্ণবমণ্ডলী। সে কূটতর্কের মধ্যে গিয়ে আমাদের কাজ নেই। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য আমরা আজকে তন্ত্রের যে রূপ বা প্রকরণটিকে জানি ও চিনি, তার ওপর বজ্রযানী বৌদ্ধতন্ত্রের বিপুল প্রভাব আছে। এবং এর পেছনে বৌদ্ধধর্মের ভাঙাগড়ার ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

করুণা ও নির্মাণের ব্যাখ্যা নিয়ে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতির সময়েই বৌদ্ধসঙ্ঘ দুইভাগে ভেঙে যায়। প্রথম দলের নাম হীনযান, দ্বিতীয় দলের নাম হয় মহাযান। মহাযানপন্থা অনেক ভারতখ্যাত দার্শনিক উপহার

দিয়েছেন, যেমন নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, আর্যদেব, দিঙনাগ, ধর্মকীর্তি ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে অসঙ্গ এবং বসুবন্ধুর প্রবর্তিত যে দার্শনিক ধারা, সেই বিজ্ঞানবাদের হাত ধরেই বৌদ্ধদের মধ্যে তন্ত্রাচারের প্রবেশ শুরু। আবার ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অনুযায়ী এই একই সময়ে ভারতে গুপ্তযুগের উত্থান, এবং গুপ্তদের হাত ধরে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের অপ্রতিহত জয়যাত্রা শুরু। এই সময় থেকেই বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ পূর্বাভিমুখী হতে হতে শেষমেষ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং কামরূপে এসে আশ্রয় লাভ করে। রাজশক্তির অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম হীনবল হয়ে পড়লে যে উচ্চ আদর্শ নিয়ে মহাযানপন্থার বিকাশযাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আর ততটা দৃঢ় রইল না। এর মধ্যে প্রবেশ করল বিভিন্ন বিকার ও অসদাচরণ। শূন্যতা ও নির্বাণ, বা প্রজ্ঞা ও উপায়ের উপমার বদলে উদ্ভব ঘটল ‘মহাসুখবাদ’-এর। অবাধ যৌনাচার, স্ত্রীসঙ্গ, চক্রানুষ্ঠান, এসবই বোধিলাভের পরম উপায় বলে প্রচারিত হতে লাগল। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বলে বেড়াতে লাগলেন, ‘কর্মণা যেন বৈ সত্ত্বাঃ কল্পকোটিশতান্যপি/ পচ্যন্তে নরকে ঘোরে তেন যোগী বিমুচ্যতে।’ অর্থাৎ যে সমস্ত কর্মের দ্বারা মানুষ শতকোটিকল্প নরকে পচে মরে, যোগীরা সেসব কর্মের সহায়তাতেই মোক্ষলাভ করেন। এই মতবাদ যে মানুষের কাছে আকর্ষক হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কী?

এর ফলে জন্ম নিল বৌদ্ধধর্মের শেষ পর্যায়, বজ্রযান।

বজ্রযানের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণভাবে একটি তান্ত্রিক আচারসর্বস্ব ধর্ম হয়ে উঠল। শাস্ত্রপাঠের স্থান নিল ধারণী (একটি পুঁথির মূল বক্তব্য বা ভাবকে একটি শ্লোকে ব্যক্ত করা)। বৌদ্ধাচার্যরা প্রচার করতে লাগলেন শাস্ত্রপাঠে যা প্রজ্ঞা লাভ হয়, ধারণী উচ্চারণ করলেই তার সমতুল পুণ্যফলের প্রাপ্তি ঘটে। গোপন চক্রানুষ্ঠান, তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে শুরু হয়ে যায় মূর্তিপূজা। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের হাত ধরে ইতিমধ্যেই অনেক রমণীয় এবং মনোহর দেব-দেবীর মূর্তিকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। অনেক বৌদ্ধধর্মী স্বধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুমন্দিরে শান্তি খুঁজে পেতে শুরু করেছেন। এসব দেখে-শুনে বৌদ্ধরাও পিছিয়ে থাকার বদলে মহাসমারোহে বিভিন্ন দেবদেবীদের মূর্তিপূজা শুরু করে দিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের শ্রেণিবিভাগও করা হল। আদিবুদ্ধ হলেন সৃষ্টির আদি কারণ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তির আধার। আদিবুদ্ধ থেকে আবার পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের উদ্ভব, যথা বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। তাঁদের আবার একেকজন শক্তি আছেন, আছেন পৃথক পৃথক বোধিসত্ত্ব। আর প্রতিটি বুদ্ধকুলে রয়েছেন অসংখ্য দেব এবং দেবী। কত বিচিত্র তাঁদের নাম, ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর, উচ্ছুষ্মজম্ভল, মঞ্জুশ্রী, তারা, অবলোকিতেশ্বর, বসুধারা, হেরুক, বজ্রসত্ত্ব আরও কত কী! বৌদ্ধপণ্ডিতেরা সব মূর্তিকে আবার শূন্যের প্রতিমূর্তি বলে ব্যাখ্যা করলেন, ‘স্ফূর্তিশ্চ দেবতাকারা, নিঃস্বভাবা স্বভাবতঃ। যথা যথা ভবেৎ স্ফূর্তি, সা তথা শূন্যাত্মিকা।’ অর্থাৎ এসব মূর্তি শূন্যেরই বহিস্ফূর্তি মাত্র, আসলে এঁদের অন্তরাত্মা পরম শূন্যতায় লীন।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এবং পালবংশের শাসন শুরু হওয়ার আগের এক-শো বছর ধরে বাংলায় যে মাৎস্যন্যায় চলেছিল বাংলার বুকে, তাতে বৌদ্ধধর্মকে অনেকটাই গুপ্ত বা আন্তর্ভৌম ভাব ধারণ করতে হয়েছিল। সদ্ধর্মের পতাকা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন সিদ্ধাচার্যরা, যাঁদের প্রায় প্রত্যেকে নিম্নবর্গীয় এবং অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। অনুমান করা অসংগত হবে না, তখনই বিভিন্ন প্রান্তিক জনজাতির ধর্মকৃত্যগুলি বৌদ্ধধর্মাচরণের মধ্যে প্রবেশ করে। তার ওপর ইতিমধ্যেই ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম তিব্বতীয় পোন ধর্মের সংস্পর্শে এসেছে। আচার্য পদ্মসম্ভবের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন পোন দেব-দেবীদের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে অঙ্গীভূত করে নেওয়ার প্রচলন শুরু হল। বৌদ্ধতন্ত্রে প্রবেশ করল আরও ভয়ংকর সব মূর্তি, বিচিত্র সব পূজা পদ্ধতি! বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে পালবংশের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন উদ্যমে আরও বিচিত্র সব তান্ত্রিক প্রথা, তান্ত্রিক পূজা, তান্ত্রিক মূর্তি এবং তন্ত্রশাস্ত্র রচনা শুরু হয়ে গেল।

কালের নিয়মে এই বজ্রযানের থেকে উদ্ভূত হল আরও দুটি শাখা, কালচক্রযান এবং সহজযান। তাদের কথা আর অধিক বিস্তারে লিখছি না, তাতে এই প্রবন্ধ বিপুল কলেবর ধারণ করার সমূহ সম্ভাবনা।

পালবংশীয় শাসনের অবসানে কর্ণাটদেশাগত ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনবংশের শাসন শুরু হয়। তার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের দ্রুত অবক্ষয়ের পালা চালু হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই তন্ত্রের নামে, সহজিয়া কায়াসাধনের নামে বিপুল অনাচার, কদর্য বিকৃতি বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট মূলক্ষয় করেছিল। সেনবংশের পতনের সময় ইসলামিক আক্রমণের ফলে ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর তার তন্ত্রচর্চার অবশিষ্টাংশ যা ছিল, তা রয়ে গেল পৌরাণিক হিন্দুধর্মের মধ্যে। অন্তত হাজার বছরের প্রতিযোগিতার ফলে উভয় পক্ষেরই একে অন্যকে চিনে নিতে আর বিশেষ বাকি ছিল না।

ফলে তন্ত্র যখন এত পথ ঘুরে শেষমেষ সেই হিন্দুধর্মের কাছেই ফিরে এল, তখন তার মধ্যে রয়ে গেল বিপুল পরিমাণে বৌদ্ধ এবং নিম্নবর্গীয় উপাদান। সঙ্গে রয়ে গেছে তার বৈদিক অন্তঃকরণটি, তৎসহ পৌরাণিক আচার ও প্রকরণের বহিরঙ্গ। এই সব মিলিয়েই গঠিত হল বর্তমান তন্ত্রের অবয়ব ও বাহ্যিক আকার।

আর বৌদ্ধতন্ত্র? তার সহজিয়া সাধনার ধারা? তা কি একেবারেই বিলীন হয়ে গেল?

না। অন্ত্যজ নিম্নবর্গের বৌদ্ধ সহজিয়ার ভাব ও ভাবনা নিয়ে নির্মিত হল বাংলায় জন্ম নেওয়া এক বিপুল সামাজিক বিপ্লবের অবয়ব। ‘বাঙালির হিয়া, অমিয় মথিয়া’ জন্ম নিল শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন। নিত্যানন্দ সহজিয়া নেড়ানেড়িদের স্থান দিলেন বৈষ্ণব ভাবান্দোলনের মাঝে।

যাই হোক, আপাতত আমরা ফিরে আসি যা নিয়ে এই প্রবন্ধ শুরু করেছিলাম সেখানে। তন্ত্র বলতেই মানুষ সচরাচর বোঝে অন্যের অনিষ্টসাধন, বিভিন্ন ভৌতিক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ। তন্ত্রের এই অংশটিকে বলে অভিচারক্রিয়া। ছ-ধরনের অভিচারক্রিয়া হয় বলে একে ষটকর্মও বলা হয়। এগুলি হল মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ এবং স্বস্ত্যয়ন। এর প্রথম পাঁচটি অন্যের ক্ষতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, শেষেরটি অনুষ্ঠিত হয় নিজের অথবা পরিবারের শান্তি ও সমৃদ্ধিকামনায়।

কী মনে হচ্ছে? যে শাস্ত্রের ছ-টি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে পাঁচটিই অন্যের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, তার প্রতি একটা বিদ্বেষভাব জন্মাচ্ছে না? একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে না?

তাহলে শুনুন, এই ছয়টি অভিচারক্রিয়াকে একত্রে বলে কৃষ্ণষটকর্ম। আপনি কি জানেন, ঠিক এইরকমই ছ-টি শুক্লষটকর্ম আছে, যা মানুষের কল্যাণের জন্য, শুভকর্মের জন্য প্রযুক্ত হয়? জানেন না, তাই তো? তাহলে জানুন, এগুলি হল যজন (পূজা বা যজ্ঞাদিকর্ম), যাজন (পৌরোহিত্য), অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান এবং প্রতিগ্রহ (যথাযোগ্য দান গ্রহণ করা)।

বিস্মিত হচ্ছেন? হওয়ারই কথা। যে শাস্ত্রকে, যে চর্চাকে আপনি চিরকালই ভৌতিক অপচ্ছায়া হিসেবে দেখে এসেছেন, তারই যদি একটি অত্যন্ত শুভ দিক থাকে যেখানে মানুষকে জ্ঞানচর্চায়, পূজা আরাধনায় উৎসাহ দেওয়া হয়, সে-কথা জেনে আপনার বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক।

এখন আপনার প্রশ্ন হতেই পারে এসব আপনি জানেননি কেন এতদিন? আপনি তাহলে কেনই-বা তন্ত্রকে অমঙ্গলের সূচক হিসেবে দেখেছেন?

এর উত্তর দেওয়ার বদলে এই অধম একটি বিনীত প্রশ্ন করতে চায়। আপনাকে যদি একটা ছুরি দেওয়া হয়, তাহলে আপনি সেই ছুরি দিয়ে ফল কেটে দেবতার প্রসাদ নিবেদন করবেন না মানুষের গলায় বসাবেন সেটা কার সিদ্ধান্ত, আপনার না ওই ছুরিটির? একই রকম ভাবে আপনার দেশজ ধর্মীয় শাস্ত্রচিন্তাকে যদি আপনি অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন তাহলে তা আপনার মনোগত কামনার চরিত্রকেই প্রকাশ করে, নাকি শাস্ত্রচিন্তাটিকে qualify করে, সেটা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। মনে রাখবেন আপনার উদ্দেশ্য, আপনার চিন্তা, আপনার ক্রিয়াই আপনার ধর্ম, কোনো বাহ্যিক আচার বা আড়ম্বর নয়। মানুষের কল্যাণ, মানুষের প্রতি বিশ্বাস, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, এর থেকে বড়ো ধর্ম আর হয় না, তন্ত্র আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়। কারণ আপনি তো জানেনই, ভালোবাসাই হল সবচেয়ে বড়ো তন্ত্র, সবচেয়ে বড়ো জাদু!

সূচিপত্র

শোধ

ফজরের নামাজ সেরেই বেরিয়ে পড়েছিলেন আহমেদ খান। ভোপালের নবাব ঘাউস মহম্মদ খানের ওয়াজির-এ-আজম মির্জা আজিজের বিশ্বস্ত সহচর আহমেদ খানের বয়েস আটচল্লিশ ও বাহান্নর মধ্যবর্তী ধূসর সীমারেখায়। ছোটো অবস্থা থেকে নিজচাতুর্যে বিলক্ষণ প্রভাবশালী হয়ে ওঠা আহমেদ খানের বিশাল দৃষ্টিনন্দন হাভেলি, ছোটো কিন্তু টাইট হারেম, অগণিত দাসী এবং কিছু অল্পবয়সি দাস, বেশুমার শরাব আর লাখনউভি বাইজি নাচের মেহফিল ভোপাল শহরের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিশেষ প্রসিদ্ধ। তার ওপর স্বয়ং ওয়াজির-এ-আজমের নৈকট্য ওনার শান-ও-শওকতে যে চার চান্দ লাগিয়ে দিয়েছিল এ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বিপুল প্রতাপে উনি ক্ষুদ্র মন্ত্রীপ্রতিনিধিসম আধিপত্যে সময় কাটাচ্ছিলেন, এমন অসময়ে এ হুজ্জোত।

খোদ নবাবের আদেশ, অন্তত এক লক্ষ টিপুশাহি মোহর নিয়ে কোম্পানির কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এবং চুপি চুপি, কাক-পক্ষীতে যেন টেরটি না পায়।

কোম্পানির গভর্নর বাহাদুর বেন্টিঙ্ক সাহেবের খাস পয়গাম নিয়ে পরশু এক ফিরঙ্গ এসেছিল বটে। নবাবের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কিছু আলোচনাও হয়, আর কারও থাকার হুকুম ছিল না, এক মির্জা আজিজ ছাড়া। তারপর গতকাল রাতে আহমেদ খানের হাভেলিতে হঠাৎ করে মির্জা আজিজের ডান হাত শওকত জঙ্গ এসে হাজির, ওয়াজির-এ-আজমের খাস এত্তেলা নিয়ে। আর তারপরেই এই হাঙ্গাম।

ঘোঁট কিছু একটা পাকছে বুঝতে পারছিলেন আহমেদ খান। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখন ভারতশাসক, দিকে দিকে আরও দৃঢ় হচ্ছে তাদের শাসন। দিল্লির মুঘল সালতানত তো না থাকারই মতন, সুলতান শাহ আলমের ছেলে আকবর শা— নামেই ভারতসম্রাট, বস্তুত লালকিলা থেকে জুম্মা মাসজিদ, ব্যাস, এই পর্যন্তই ওনার হুকুমত চলে। এই লালমুখো নাসারা ফিরঙ্গরাই এখন হিন্দুস্তানের বেতাজ সুলতান। শুধু তখত-এ-তাউস দিল্লির বদলে কলকাতায়, এই যা। তা এর মধ্যে নয় নয় করেও ভোপালের নবাবশাহি দেড়-শো বছরের হল প্রায়। তাকে আরও কয়েক-শো বছর জিন্দা রাখতে গেলে নতুন শাহেনশাহদের খুশ করাটা বাধ্যতামূলক তো বটেই। আবার কথাটা সর্দার রণজিৎ সিং-এর কানে ওঠাও চলবে না, শাহেনশাহ আকবর শাহের কানে তো নয়ই, হাজার হোক, মরা হাতিও লাখ টাকা বরাবর। আউধ আর মাইসোরের ক্ষেত্রে কোম্পানির নাক গলানো দেখে অনেক রাজা নবাবেরই রাতের নিন্দ হারাম হয়ে গেছে। ফলে নতুন সুলতান বেন্টিঙ্ক বাহাদুরকে খুশ রাখতে হলে এই লুক্কাচ্ছুপি ছাড়া উপায় যে নেই, আহমেদ খান সেটা ভালোই বোঝেন।

এখন নবাবের আদেশ, অমান্য করা আত্মহত্যার শামিল। তা ছাড়া কাজও তো তেমন আহামরি কিছু নয়। সগরে কোম্পানির অফিস আছে, সেখানে ম্যালোনি সাহেব আছেন, সেখান অবধি টাকা পৌঁছে দিয়েই ব্যাস, ঘরের ছেলে ঘরে। বাকিটা কোম্পানিই না হয় বুঝে নেবে। ভোপাল থেকে সগর বেশি দূরে নয়, পচাশ কোশ মতো। এই যে আজ ফজরের পর রওয়ানা দিলেন, পা চালিয়ে গেলে এশার নামাজ রাহতগড়ে আদায় করে ওখানেই রাত্রিবাস। আর পরের দিন জোহরের নামাজ না হয় সগরে পৌঁছেই আদায় করবেন। ওখানেই কোম্পানির কুঠিতে রাত কাটিয়ে পরের দিন ফিরতি পথ ধরা, তেমন কঠিন কিছু না।

মুশকিল একটাই, পুরো কাজটাই করতে হবে চুপি চুপি, অত্যন্ত সন্তর্পণে, কেউ যেন কিচ্ছুটি টের না পায়। এমনকী নিজের তিন বেগমের কাছেও এ বিষয়ে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করেননি আহমেদ খান। একই কারণে বেশি লোকলস্কর নেওয়াও বারণ। এক পালকিতে আহমেদ খান নিজে, আরও দুটোয় পেটির মধ্যে এক লাখ টিপুশিহি মোহর। লোকজনের মধ্যে তো আঠেরোটি পালকিবাহক কাহার আর এই মহার্ঘ উপঢৌকনের

পাহারাদার হিসেবে মাত্তর চারটি ফৌজি সিপাহি। তা সেই সিপাইদের বিরিয়ানি গোস্ত খাওয়া বিশাল ভুঁড়ি দেখে অবজ্ঞায় নাক সিঁটকোলেন উনি, ছোঃ, এই নাকি নওয়াবের দেহরক্ষী বাহিনীর খাস সিপাহি! বিপদে পড়লে সবার আগে এরাই কোতল হবে বেশক। নড়তে চড়তেই তো এদের সময় কাবার।

'জলদি চল বেটা, পা চালিয়ে। মাগরিবের আগে যদি গায়ারাসপুর পৌঁছে দিতে পারিস, মোটা ইনাম পাবি' এই বলে কাহারদের একটু তাড়না দিয়ে উনি পালকির দরওয়াজা বন্ধ করলেন। সঙ্গে দু-দুটো চান্দির সুরাহি ভরতি করে বহুমূল্য শিরাজি আর আনিস নিয়ে এসেছেন। এখন দু-পাত্তর খেয়ে একটু ঝিমোবেন।

চটকাটা ভাঙল দিওয়ানগঞ্জ পেরিয়ে সালামতপুরে ঢোকার মুখোমুখি। এক বরকন্দাজ সবিনয়ে এসে জানাল, কিছু গরিবগুরবো লোক এসেছে হুজৌরের কাছে আর্জি নিয়ে, উনি যদি একটু মেহনত করে শোনেন।

জমিতে পা দিয়েই বুঝলেন যে কোমর টাটিয়ে গেছে। খর রৌদ্র মাথার ওপর, মানে জোহরের সময়ও পেরিয়ে গেছে। নিজের ওপরেই বিরক্ত হলেন আহমেদ খান। এভাবে নামাজ আদায় ক্বাজা হলে হাশরের ময়দানে রোজ-এ-কেয়ামতে কী জবাব দেবেন উনি? চোখ কুঁচকে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখেন এক দঙ্গল গ্রাম্য পথচারী ভারি বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ধূলিধূসরিত খালি পা, শতচ্ছিন্ন পোশাক, মাথায় মলিন পাগড়িতে দারিদ্র্য অতি প্রকট। বেশ কয়েক দিনের না কামানো দাড়ি গালে, চোখে ভীরু উদাস দৃষ্টি। তা জনা তিরিশ চল্লিশেক লোক হবে। কয়েক জন তো পথশ্রমে কাহিল হয়ে মাটিতেই বসে পড়েছে গাঁঠরি পাশে রেখে। বাকিরা শঙ্কিত দৃষ্টিতে হুজৌরের সাক্ষাতে হাত জড়ো করে দন্ডায়মান। একটি দীর্ঘদেহী লোক এগিয়ে এল। মাথার টিকি দেখে বুঝলেন যে এ ব্রাহ্মণ, হয়তো বা দলের নেতাও। ফাটা ফতুয়ার ফাঁক দিয়ে নোংরা জনেয়ু উঁকি দিচ্ছে। রাগ হয়ে গেল আহমেদ খানের। এই হিন্দু বরাম্ভনের বাচ্চাটা কী চায় এখন? এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে অনেক।

'কী চাই হে', খ্যাঁক করে ওঠেন আহমেদ খান।

'হামলোগ বহোত গরিব আদমি আছি হুজৌর। কুম্ভমেলা থেকে গাঁওদেহাতে ফিরে যাচ্ছি। রাস্তাঘাট ভালো না, কখন কি পরেশানি হয় কিছু বলা যায়? হুজৌর যদি মেহেরবানি করে এই বদনসিবদের সঙ্গে থাকার ইজাজত দেন, তো বহুত শুকরগুজার থাকবে এই বান্দা।'

না, লোকটা বেতরিবত নয়। তবুও আহমেদ খান হাঁকিয়েই দিচ্ছিলেন। সঙ্গে মেলা টাকাকড়ি আছে, এই লোকজন নিয়ে ফালতু ঝামেলা বাড়াবার কোনো মানেই হয় না। যদিও টাকার ব্যাপারটা কাহাররা অবধি জানে না, তবুও আনজান খতরা ঘাড়ে নিয়ে লাভ? তা ছাড়া এইসব ঘিনঘিনে নোংরা ভিখিরির বাচ্চা গেঁয়ো লোকগুলোকে শখত নাপসন্দ আহমেদ খানের, ফলে হাতের ইশারায় সিপাহিদের সর্দার বুল্লা খাঁকে ডেকে পাঠালেন উনি।

'এদের যেতে বল বুল্লা খাঁ। বেকার ঝঞ্ঝাট বাড়ানোর শওখ নেই আমার। এখনও বিদিশা অবধি পৌঁছইনি। হারামির অওলাদ কাহারগুলো করছেটা কী? কোড়া লাগাও সালোঁকো, দওড়াও ইনকো জলদি। আর এই ভিখিরিগুলোকে নিজেদের রাস্তা দেখতে বল, যত্তসব ফালতু হুজ্জোত।'

আদেশ শুনেও বুল্লা খাঁ দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে থাকে, নড়ার কোনো লক্ষণই দেখায় না।

'কী হলটা কী? কথা কানে যাচ্ছে না?' ধমকেই ওঠেন উনি।

'মালিক, এরা গরিব ইনসান, সঙ্গে থাকলে একটু লোকবল বাড়ে। একটু গপশপ করতে করতেও যাওয়া যায়। বেসাহারা মজবুর লোগ সব...'

বুঝলেন আহমেদ খান। এই লম্বা বেহড়ের শুনশান রাস্তায় এদেরও তো দুটো কথা বলার লোক চাই। তা ছাড়া বুল্লা খাঁ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও তো এইদিককার গাঁওদেহাতেরই মানুষ। দুটো সুখ-দুঃখের কথাই না হয় বলবে দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে। থেকেই যাক তাহলে এরা, সঙ্গে চলুক। চোখের ইঙ্গিতে এদের সঙ্গে

আসার ইজাজত দিয়ে পালকিতে উঠে পড়েন উনি, যদিও প্রৌঢ় বরাম্ভনটির আভূমি সেলাম ওনার নজর এড়ায় না।

বহর ফের চলতে শুরু করে, কিন্তু আগের চেয়ে শ্লথগতিতে। স্বাভাবিক। এই উটকো জুটে যাওয়া চল্লিশ জন না কাহার না সিপাহি, গাঁওদেহাতের গরিবগুরবো লোকজন সব। যাগগে যাক। মাগরিব না হোক, আসরের নামাজের আগে গায়ারাসপুর পৌঁছলেই হল। গায়ারাসপুর ছোটো গঞ্জ মতন। ভালো অম্বুরি তামাক পাওয়া যায়। অম্বুরি তামাকের কথায় মনে পড়ল, পরের মাসে অম্বরে গিয়ে...

একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলেন উনি। বুল্লা খাঁ এসে গলা খাঁকারি দিতে ঝিমুনিটা ভাঙে। বিদিশা এসে গেছে, হুজৌরের হুকুম হলে এখানেই দস্তরখান লাগানো হোক?

খানাটা একটু গুরুপাকই হয়ে গেছিল, দেরিও হয়ে গেছে খুব। ওনাকে কাল দুপুরের মধ্যে সগরে পৌঁছতেই হবে, ফিরলেই আবার একটা মেহফিল আছে বড়ো। বেশকিছু মোহর খসিয়ে লাখনউ থেকে বেগম সমরুকে আনা হয়েছে। বেগম সমরুর ক্ষীণ কটি, উদ্ধত স্তন, আর ঝটকা ঠুমকা মনে পড়তেই আহমেদ খানের গলা শুকিয়ে উঠল। হাঁকার পাড়েন উনি—

'বুল্লা খাঁ, জলদি চলো। দের হয়ে যাচ্ছে বহুত।'

এরপর একটু জোরেই দৌড়তে থাকে বহর। খিজিরপুর পেরিয়ে গেল মুহূর্তেই। এরপর আরোনা, দোহুরা আর তারপরেই গায়ারাসপুর। আজকের মতন ডেরাডান্ডা বাঁধবেন উনি। রাত্তিরে রাহতগড় পৌঁছতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কাল সকাল সকাল বেরোলেই দুপুরে সগর পৌঁছে যাবেন। মাঝখানে দু-দু-বার বুল্লা খাঁ এসে প্রস্তাব দিয়েছে একটু জিরিয়ে নেওয়ার। যথেষ্ট প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও সে ইচ্ছে দমন করেছেন আহমেদ খান। আনিস এখনও আধা সুরাহি আছে, শিরাজি প্রায় পুরোটাই। যা মৌজ মস্তি, সেটা গায়ারাসপুর পৌঁছেই করবেন।

এমন সময়ে হঠাৎ আবার থেমে গেল বহর। টং করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল আহমেদ খানের। পালকি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেই লাল লোহুলোহান চোখে ইতিউতি তাকালেন, কোথায় সেই বেয়াদব বুল্লা খাঁ, পারলে আজই বরখাস্ত করেন এই ইবলিশের বাচ্চাকে। এত টাকা নিয়ে এতদূর যাচ্ছেন, তার মধ্যে উটপটাং ঝামেলা জড়াচ্ছে কে? এই নীচুজাতের ভিখিরি আতরাফ বুল্লা খাঁ কী ভেবেছেটা কী নিজেকে? বুল্লা খাঁ বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল যে মালিক বহোত নাখুশ হয়েছেন। সশঙ্কচিত্তে এগিয়ে এসে বলে 'গোস্তাখি মাফ হুজৌর, এদিকে একটু তশরিফ নিয়ে এলে বান্দা ব্যাপারটা বোঝাতে পারে। কসুর মাফ, লেকিন মজবুর মুসলমানকে সাহায্য করা উম্মতি সুন্নাহ বলে বহর থামাতে বাধ্য হয়েছি মালিক।'

'কী হয়েছেটা কী?' একটু রূঢ়স্বরে প্রশ্ন করেন আহমেদ খাঁ, 'মাগরিবের নমাজ গায়ারাসপুরে আদায় করতে চাও কি চাও না সেটা স্পষ্ট করে বলতো বুল্লা খাঁ।'

'মালিক, একটু মেহনত করে এদিকে দেখুন।'

ঘাড় ঘোরাতেই কারণটা বুঝতে পারলেন আহমেদ খাঁ।

একটু দূরে জনা দশেক লোক, মুসলমানি সিপাহির পোশাক পরনে। মাটিতে শোয়ানো একটা সাদা কাপড় দিয়ে মোড়া মৃতদেহ ঘিরে জবুথবু হয়ে বসে আছে। বিলাপের চিহ্ন সর্বাঙ্গে স্পষ্ট। এদেরই একজন সর্দার গোছের লোক উঠে আসে, আভূমি সেলাম ঠোকে, 'আসসালাম ওয়ালেকুম হুজুর।' 'ওয়ালেকুম আসসালাম। কী হয়েছে বিরাদর?' 'মালিক, আমরা কোম্পানির সিপাহি। আউধ যাচ্ছিলাম ফৌজে যোগ দিতে। কী নসিব দেখুন, রাস্তায় এই সাথি উলটি করতে করতে ফৌত হয়ে গেল। বাকি সবাই তো এগিয়ে গেছে। এই আমরা দু-চারটে মুসলমান এর কবর দেবার জন্যে বসে আছি। মুশকিল এই হুজুর, যে আমাদের মধ্যে তেমন লিখাপড়ি কেউ নেই যে নামাজ-এ-জানাজা আদায় করবে। হুজুর আলেম লোক মালুম হয়। মেহেরবানি করে যদি একটু নামাজটা পড়ে দিতেন তো আমাদের দোস্তকে মাটি দিতে পারতাম। হুজুর পাকসাফ লোক মালুম হয়, যদি মেহেরবানি করে একটু...' বলে লোকটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

আহমেদ খানের মন দয়ার্দ্র হয়ে ওঠে। আজলাফ হোক, আরজাল হোক, মুসলমান তো বটে। তিনি, প্রবল প্রতাপশালী আহমেদ খাঁ, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে মুসলমানের বাচ্চা গোর পাবে না, এ হতেই পারে না। উনি ঘাড় ঘুরিয়ে বুল্লা খাঁকে ওজুর জল আনতে বলেন।

ততক্ষণে কাহাররা দূরে সরে গেছে। জায়গাটা ঘন জঙ্গল মতন, লাকরাদৌনের আগের কোনো জঙ্গুলে জায়গা মালুম হয়। বড়ো রাস্তা একটু দূরে, কাছেই একটা বিল। সেদিক থেকে বাতাস বইছে ঝিরিঝিরি। বিলের পাশ দিয়ে ঘন জঙ্গল। সিপাহিরা একটু ঢিল দিয়েছে। তা দিক, এতক্ষণ ধরে দৌড়ে আসছে। বুল্লা খাঁ ওর ঘোড়াটার পা দুটো একটু দলাইমলাই করে দিচ্ছে, আহা করুক। ঘোড়া, তলোয়ার আর ভুখা পেট ছাড়া বেসাহারা সিপাহির আর আছেটাই বা কি, অ্যাঁ?

যেটা উনি এতক্ষণ খেয়াল করেননি, সেটা হচ্ছে যে কোন এক অদৃশ্য সুতোর টানে সেই বেসাহারা পথিকদের মধ্যে অনেকে উঠে এসে প্রতি সিপাহির পাশে তিন জন করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঠিক পাশে নয়, এক জন করে পেছনে, দুই জন করে দুই পাশে।

এদের মাঝখানে, সেই দীর্ঘদেহী উপবীতধারী ব্রাহ্মণ দলনেতাটি অত্যন্ত নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে এসে দাঁড়ালেন। পুরো দৃশ্যটির মাঝে আমোঘ নিয়তির মতন।

ওজুর জল এল বিল থেকে। মৃতদেহ সঙ্গী মুসলিম সিপাহিরা একটু সরে এল। তাদের মধ্যেও তিন জন করে খুবই সশ্রদ্ধভাবে আহমেদ খান আর বুল্লা খাঁ-র পিছনে এসে দাঁড়াল।

ঠিক পিছনে নয়, এক জন করে পেছনে, দুই জন করে দুই পাশে।

কাহাররা দূরে জটলা করছে, বাতাস নিঃশব্দে বয়ে চলেছে, দূরে কোথাও একটা ঘুঘু একটানা ডেকে চলেছে। আহমেদ খান নীচু হয়ে ওজু করলেন, তারপর এসে দাঁড়ালেন মৃতদেহের সামনে। ওনার দুই পাশে দুই শোকস্তব্ধ মুসলমান সিপাহি, মৃত বন্ধুর সদ্গতি কামনায়। এক জন পেছনে।

এমন সময়ে সেই প্রৌঢ় ব্রাহ্মণটি অনুচ্চ কিন্তু তীব্র স্বরে বললেন ‘পান কা রুমাল লাও।’ নামাজ-এ-জানাজা পড়ার আগে একটু ধন্ধে পড়ে গেলেন আহমেদ খান। এই বুরবক হিন্দু বরাম্ভন কি জানে না যে এখানে কারো গোর হতে চলেছে? এইটা কি তোর রুমাল হাতে পান খাবার সময়? কোম্পানির রাজত্বে এই হিন্দুগুলো বহুত বদতমিজ হয়ে উঠেছে। গোর দিয়ে উঠেই উনি এর খবর নেবেন, এই মনস্থির করে উনি তিন বার আল্লাহু আকবর বলে নামাজ পড়তে শুরু করেন। মৃতদেহের কাছে এসে একটু ঝুঁকে আহমেদ খান সবে উচ্চারণ করেছেন ‘আল্লাহুম্মাগফিরলি হায়িনা ওয়া মাইতিনা ওয়া’, এমন সময় শুনলেন সেই প্রৌঢ় দরিদ্র গ্রাম্য ব্রাহ্মণটি গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন ‘সাহেব খান, তামাকু লাও।’ তীব্র রোষে ঘাড় ঘোরাবার আগেই আহমেদ খান ক্ষণিকের ভগ্নাংশে দেখলেন যে একটা হলুদ রঙের সিল্কের রুমাল পিছন থেকে উড়ে এসে ওনার গলায় বসে দ্রুত শক্ত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে দিল। জ্ঞান হারাবার আগে স্তম্ভিত চোখে ভোপালের ওয়াজির-এ-আজমের খাস সহচর আহমেদ খান দেখলেন যে ওনার সামনে শোয়ানো মৃতদেহ কোন জাদুমন্ত্রবলে জিন্দা হয়ে লাফিয়ে উঠে ওনার ঘাড় ধরে নীচের দিকে টানছে। আতঙ্কিত চোখে এইসব দেখে উনি ‘ইয়া আল্লা’ বলতেও ভুলে গেলেন। যদিও সেসব ভাবার সময় পাবার আগেই পেছন থেকে একটা হাঁটু ওনার মেরুদণ্ড বরাবর সামনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে কড়াক আওয়াজ করে মেরুদণ্ডটি ভেঙে দেয়। সেই আলো-আঁধারিয়া সন্ধ্যায়, অজানা সড়ক ঘেঁষে, লাকরাদৌনের পাশে এক জঙ্গুলে বিলের ধারে আহমেদ খানের চোখে যে চির অন্ধকার নেমে এল তা আর ঘুচে যাবার নয়।

জব্বলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ক্যাপ্টেন ম্যালোনি যখন অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ভোপাল থেকে আগত সংবাদদাতাকে বিদায় দিলেন, তখন সগরের এই কোম্পানি কুঠিতে গ্রীষ্মের দুপুরেই অন্ধ সাঁঝ আঁধারের হিমশীতল স্তব্ধতা। বিশেষ দূত মারফত ভোপাল নবাব ওয়ান ল্যাক টিপুশাহি গোল্ড কয়েন পাঠিয়েছিলেন, অ্যাট দ্য বিহেস্ট অফ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক হিজ হাইনেস, গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। ক্যাপ্টেন

ম্যালোনির ওপর দায়িত্ব ছিল সেই ‘আর্জেন্ট কনসাইনমেন্ট’ লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে উইথ ডিউ সিকিওরিটি পাঠিয়ে দেওয়া। এই কাজের পাত্তা কারও হাতে লাগার কথা নয়। সিক্রেসি ইজ অফ অ্যাটমোস্ট ইম্পর্ট্যান্স হিয়ার। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাই আর কাউকে ভরসা করেনি। ঈটনের ছোটোবেলার বন্ধু ডিক, অর্থাৎ রিচার্ড ম্যালোনিকেই এই কনসাইনমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি দিয়েছিল। ‘অ্যান্ড আই ফেইল্ড টু কম্পলিট দিস সিম্পল গডড্যাম টাস্ক’ মনে মনে এই কথা বলে দেরাজের ওপর অন্ধ আক্ষেপে একটা সজোর ঘুসি মারলেন ক্যাপ্টেন ম্যালোনি। সেই আওয়াজ শুনে খাস অর্দালি মুহম্মদ খাঁ দৌড়ে এল, ‘কোই সেবা মেরে মালিক?’ ম্যালোনির ইচ্ছে হল জাস্ট জুতিয়ে এই লোকটার মুখ ছিঁড়ে দিতে। ব্লাডি ভিখিরি নেটিভ সব, পরনে নোংরা সব ধোতি আর পাগড়ি, সুপারস্টিশনের ডিপো, ইললিটারেট ফুল এক-একটা। এই ব্লাডি ব্রাউন নিগাররা এত ট্রাবল দেবে জানলে উনি হোম পোস্টিং ছেড়ে এই ফাকিং স্টুপিড কান্ট্রিতে আসতেনই না।

ক্যাপ্টেন ম্যালোনি স্থির সাপের চাউনিতে বলেন ‘ছোটে সাহেব কো এত্তেলা দো নিগার। আবভি।’

একটু পরেই এক ইংরেজ যুবাপুরুষ এসে সামনে দাঁড়ালেন।

‘গুড আফটারনুন ক্যাপ্টেন ম্যালোনি।’

‘গুড আফটারনুন জেন্টলম্যান। খবরটা শুনেছ?’

‘ইয়েস ক্যাপ্টেন। কালকেই একটা খবর কানে এসেছিল। আজকে ইনভেস্টিগেট করে এলাম। আপনি আর আমি বোধ হয় একই আন্দাজ করছি, এবং সেই সন্দেহটাই বোধ হয় ঠিক।’

‘এক্সপ্লেইন প্লিজ।’

‘রাহাতগড়ের বাজারে আজ এক পুওর আননোন ভিলেজার দুটো সিলভারের জার আনে। একটা ফুল, আরেকটা হাফ ফিলড।’

‘হুম। সো?’

‘দুটোতেই খুবই এক্সপেনসিভ লিকার ছিল। আনিস আর শিরাজি। এদিককার লোক এইসব চোখেও দেখেনি। রাজা বা নওয়াব ফ্যামিলি ছাড়া এসব অ্যাফোর্ড করা ইম্পসিবল।’

‘অ্যান্ড?’

‘সিলভার জার দুটো দেখার মতন। সপ্লেন্ডিড ক্র্যাফটসম্যানশিপ, উইথ বিউটিফুল ইন্ট্রিকেট ডিটেইলিং। আ পারফেক্ট ওয়ার্ক অফ আর্ট। রাস্তাঘাটে এ জিনিস পাওয়ার কথা নয় ক্যাপ্টেন।’

‘আর ইউ শিওর?’

‘অ্যাবসোলিউটলি।’

‘কুড ইউ ট্রেস দ্যাট গাই?’

‘নাহ। লোকটা দাম নিয়েই হাওয়ার মতন মিলিয়ে গেছে। দুটো জারই কনফিসকেট করে নিয়ে এসেছি। আহমেদ খানের বাড়ির লোকজন নিশ্চয়ই আইডেন্টিফাই করতে পারবে জার দুটোকে।’

‘সো, তোমার কথাই মনে হচ্ছে ঠিক। ওকে। প্লিজ প্রসিড টু ন্যাব দিজ মার্ডারার্স। ক্যাচ দেম অ্যান্ড হ্যাঙ্গ দেম। ইটস দ্য ডিউটি অফ হোয়াইট পিপল লাইক আস টু ব্রিং ল অ্যান্ড অর্ডার ইন দিস গড ফোরসেকেন প্লেস। যা সাহায্য চাইবে, পাবে। যখন চাইবে তখনই। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।’

‘থ্যাঙ্কস ক্যাপ্টেন।’

ফিরে চলে আসছিলেন যুবকটি। পিছন থেকে ডেকে ওঠেন ক্যাপ্টেন ম্যালোনি। উঠে এসে যুবাপুরুষটির কাঁধে হাত রাখেন। সস্নেহে বলেন— ‘দিজ পিপল আর ডেঞ্জারাস, ভেরি ডেঞ্জারাস। বি এক্সটিমলি কশাস ডিয়ার।’

‘ইয়েস ক্যাপ্টেন।’

‘টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেল্ফ স্লিম্যান। আই উইল ওয়েট ফর ইউ।’

বিলের থেকে ঠান্ডা হাওয়া গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে শুকনো শরীরটায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়। পাতার সরসরানি আর মাটি কাটার ঝুপ ঝুপ আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজও শোনা যায় না। নির্জন এই জঙ্গুলে যায়গায় বিন্দুমাত্র আলো নেই, তার ওপর অমাবস্যা। আজ মঙ্গলবারও বটে, মা ভবানীর পূজার প্রশস্ত দিন। বড়ো শুভদিন আজ। যুক্তকর মাথায় ঠেকালেন দীর্ঘদেহী ব্রাহ্মন। মা আজ এতগুলি বলি স্বীকার করেছেন। টাকাও যা পাওয়া গেছে, তা কেউ কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি, এক লক্ষ টিপুশাহি খোর! দূরে একটা পেঁচা ডেকে উঠল। বড়ো সুলক্ষণ, বড়ো সুলক্ষণ, অভীষ্ট সিদ্ধির পথে আজ বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবেন উনি। আজ রাতেই। তারপর আর একটি মাত্র সোপান বাকি, তারপরই...

অকস্মাৎ 'ঠাকুর' ডাক শুনে সচকিত হন উনি। খোদাবক্স খাঁ সামনে দাঁড়িয়ে। নাহ, অনেক কাজ বাকি, সেগুলি দ্রুত শেষ করতে হবে। প্রথার বাইরে এক পাও চলার উপায় নেই, তাহলেই দলের ওপরে নেমে আসবে মা ভবানীর রুদ্ররোষ। দলের সর্দার হিসেবে এই অনর্থ হতে দিতে পারেন না উনি।

মাটিতে সার বেঁধে শোয়ানো তেইশটি মৃতদেহ। প্রত্যেকের গলায় সিল্কের তৈরি পেলহুর ফাঁসের দাগ।

'বাকিরা কোথায় খোদাবক্স? বিচালি দেখেছ ঠিকঠাক জায়গায়? বেশ গভীর খুঁড়তে হবে কিন্তু। রাতও বেশি বাকি নেই আর। হাত চালাতে বল সবাইকে।'

'ধাউর জমাদার, আর মোরাদুন কুর্মি বাকিদের নিয়ে কুরওয়া খুঁড়ছে মালিক। নাসির মাদারি সাদা রুমাল নিয়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিপদ দেখলে ফুরকদেনার জন্যে।'

'বেশ বেশ। কাসসি কার কাছে ছিল?'

'আমার কাছে ছিল মালিক। মন্তর পড়া কোদাল, আর কাউকে দিতে আছে?'

'ভালো। তাড়াতাড়ি করতে বল।'

'চিন্তা না কিজিয়ে মালিক। ওরা এইকাজে দুরুস্ত। বেশক খানদান লোক ওরা এ কাজে। নাউরিয়া বয়েস থেকে এইসব দেখে দেখে আর করে করে এসব কাজে এরা ভারি মাহির।'

'ভালো হলেই ভালো।'

'এমন চিসা শিকার আর কবে মিলবে মালিক, হি হি হি। যা পেয়েছি, আধা জিন্দেগি কেটে যাবে আমাদের। মা ভবানীর কিরিয়া।'

'সুবন হারসুকাকে দুটো খোর বেশি দিও খোদাবক্স। এমন দুরুস্ত তিলহাই কমই দেখেছি। সেই ভোপাল থেকে খবর পেয়ে দৌড়ে এসে জানাল বলেই তো এত বড়ো দাঁওটা মারতে পারলাম। তাড়াতাড়ি কর, ঠিক বাইশটা কুরওয়া খুঁড়বে। বেশি না। হাত পায়ের জোড় ভেঙে দিয়েছ তো? নইলে আবার দেহ পচে ফুলে উঠে...'

'গুস্তাখি মাফ মালিক। কিন্তু লাশ তো...'

তেইশটা বলার আগেই ব্রাহ্মনের চোখে চোখ পড়ে যায় খোদাবক্সের। অন্ধকারেও ধকধক করে জ্বলে ওঠে সেই চোখ। কঠিন কণ্ঠে আদেশ ভেসে আসে, 'যা বলছি তাই কর খোদাবক্স। আর তাড়াতাড়ি কর।'

দ্রুত সন্ত্রস্তপদে ফিরে আসতে আসতে ভয়ে ত্রাসে ঘেমে ওঠে খোদাবক্স খাঁ। এই লোকটির মধ্যে কি আছে বোঝাতে পারবে না ও, কিন্তু চোখে চোখ রাখলে একটা শিরশিরে শীতল অনুভূতি হয়। একটা ভয়জড়িত অস্বস্তি। কম কথা ও দৃঢ় ব্যাক্তিত্বের এই ব্রাহ্মণটির মধ্যে একটা অদেখা শীতল নিষ্ঠুরতা আছে, যা শুধুমাত্র ষষ্ঠ ঈন্দ্রিয় ছাড়া ব্যাখা করা অসম্ভব।

তিন সন আগে হঠাৎ করে ভুকোত জমাদারের ঘরে ইনি এসে উপস্থিত। ভুকোতই তখন ছিল দলের সর্দার। যেমন সাহস ছিল ভুকোতের তেমনই ছিল বুদ্ধি। গাঁয়ের কেউ জানতে পারেনি ভুকোতের দলের আসল কাজ কি। বারিষ কা মৌসুম শেষ হল কী ভুকোত তার দলবলসমেত বেরিয়ে পড়ত। পড়ৌসিরা জানত যে এরা কাজের খোঁজে দূর গাঁও যাচ্ছে। তারপর কয়েক মাস পরে পয়সা কামাই হলে ফিরে আসবে। বিবির জন্যে আনবে নতুন শাড়ি আর কুমকুমের বিন্দি। বালবাচ্চার জন্যে আনবে নতুন কাপড় আর খেলনা।

তারপর পঞ্চায়েতের বড়ো বারগত পেড়টির নীচে বসে গাঁওবুড়োদের সঙ্গে হুঁকো খেতে খেতে গাঁওদেশের আজব সব কিস্যা শোনাবে। আর পাঁচটা বাহার গাঁওতে কাজ করতে যাওয়া মরদ যেমন হয় আর কী!

কিন্তু ভুকোতের দল দূরদেশে গিয়ে রোজগার করা আর পাঁচটা দেহাতি মরদদের দলের থেকে আলাদা ছিল।

একদম আলাদা।

শরতের শুরুতে, কোনো এক শনি বা মঙ্গলবার দেখে, যাত্রা শুরুর আগে এক এক করে খোদাবক্স, ধাউর, মোরাদুন, সুবন, ছুটনিয়া এরা ভুকোতের বাড়ি এসে জড়ো হত। দরজা বন্ধ করে শুরু হত বিশেষ উপচার। খুঁড়ে তুলে আনা হত বিশেষ মন্ত্রপূত কোদাল, কাসসি। তাকে পুজো করে, চিনির জল, ঘোল আর দেশি মদ দিয়ে ধুয়ে, সাত বার আগুনে সেঁকে, সাত সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে শুদ্ধ করে সেই মন্ত্রপূত কোদাল তুলে দেওয়া হত বিশেষ কারো হাতে। তারপর একটি বিশেষ ভাবে তৈরি রুমাল হাতে নিয়ে, যার নাম পেলহু, এরা বেরিয়ে পড়ত। হাঁটতে থাকত মাইলের পর মাইল। অপেক্ষায় থাকত শিকারের, অপেক্ষায় থাকত মা ভবানীর নির্দেশের। কোনো তিলহাই বা গুপ্তচর এনে দিত কাঙ্ক্ষিত খবর, এই পথেই সদলবলে আসছে কোনো এক ব্যবসায়ী, সঙ্গে দুটি খোনতুরি, বাচ্ছা মেয়ে। দলের মধ্যে যারা দক্ষ সোথা তারা গিয়ে আলাপ জমিয়ে, বন্ধুত্ব পাতিয়ে, ভুলিয়েভালিয়ে রাত্রে নির্জন জায়গায় থাপ, মানে তাঁবু ফেলাত। তারপর রাত্রে শুরু হত গান আর গল্প। অলক্ষিতে প্রতিটি দুর্ভাগার পেছনে তিন জন করে এসে দাঁড়াত। এক জন পেছনে। দুই পাশে দুই জন। পেছনে দাঁড়ানো ভুকোত, অর্থাৎ প্রধান খুনির কোমরে গোঁজা থাকত সেই কালান্তক পেলহু। গানে গল্পে আড্ডায় মজে যেতে যেতে কেউ এক জন হাঁক দিত, ‘পান কা রুমাল লাও।’ ঘাতকদের হাতে হিলহিলে সাপের মতন নিঃশব্দে উঠে আসত সেই রুমাল। তারপরেই উঠত ঝিরণী, কেউ এক জন চেঁচিয়ে উঠত, ‘সাহেব খান, তামাকু লাও।’

আর লোকগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে যেত।

লাশগুলোকে চৌকো কুরাওয়া কিংবা গোল গব্বায় ফেলে, মাটি চাপা দিয়ে, তার ওপর বসে মন্ত্রপূত তুপোনির গুড় খেয়ে তারপর শুরু হত পথচলা। হতভাগ্যদের দলে কোনো খোনতুরি থাকলে অবশ্য তাকে ঝিরণী দেওয়া হত না। বাঘের আশেপাশে যেমন শিয়াল ঘোরে উচ্ছিষ্ট খাবার আশায়, তেমনই এদের সঙ্গে ঘুরত ব্রিনজাররা। ওদের কাজই হচ্ছে বাচ্ছা মেয়ে বিক্রি করা। ভুকোতের দলের উপরিলাভ।

তিন বছর আগে এমনই এক যাত্রাশুরুর আগের দিনে ভুকোতের বাড়ি গিয়ে এই ব্রাহ্মণকে দেখে একটু অবাকই হয়েছিল খোদাবক্সরা। কিন্তু যাকে সবার আরও আজব লেগেছিল, সে হচ্ছে ভুকোত নিজে! কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে লোকটা, মুর্দামাফিক হাবভাব। যেন নিজের মধ্যেই নেই, হামেশা একটা ধুনকির মধ্যে রয়েছে। মাথা ঘাড় এতই নীচু করে রেখেছে যে চোখ মুখ প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। কথাবার্তাও বলছে তাজ্জব করা, জানটা যেন কলিজার মধ্যেই নেই। বিড়বিড় করে বলল, এবার থেকে দলের ভার এই ব্রাহ্মণের হাতেই থাকবে। এই দল ভুকোত ছেড়ে দিল।

তাজ্জব কী বাত! ছেড়ে দিলাম বললেই ছেড়ে দেওয়া যায় নাকি? কথা নেই বার্তা নেই, কে এই বরাম্ভন তার হিসেবপতা কিছু নেই, হঠাৎ করে সর্দার বলে মেনে নিতে হবে? রীতিমতো বিদ্রোহ করেছিল খোদাবক্স মোরাদুনরা। কিন্তু ভুকোতের ওই এক কথা। এই দল ভুকোত ছেড়ে দিল, এই বরাম্ভন এবার থেকে সর্দার, এতে যার ইচ্ছে হবে সে দলে থাকবে, না হলে বেরিয়ে যাবার দরজা খোলাই আছে!

এর ওপরে আর কথা চলে না। ভুকোতের ওউরতকেও তো সেবার দেখাই গেল না বাইরে আসতে। দুটো কথা যে জিজ্ঞেস করে নেবে, তারও রাস্তা বিলকুল বন্ধ!

আড়ালে-আবডালে ওরা চেষ্টাও করেছে ভুকোতকে বোঝাবার। অস্পষ্ট বিড়বিড় করে মাথা নাড়াতে নাড়াতে কী যে বলেছে, তা কেউই বোঝেনি। কথাও বলেছে দূরে থেকে, কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেয়নি,

এমনকী জিগরি দোস্ত খোদাবক্সকে অবধি না। শুধু এক বার, এক বারই, জোর করে ভুকোতের হাত চেপে ধরতে গেছিল খোদাবক্স, অবিশ্বাস্য রকমের অমানুষি ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে উঠে গেছিল ভুকোত।

রাতে শুতে যাবার আগে নাসির মাদারি চুপচাপ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হল ওস্তাদ, কী বুঝলে ভুকোত সর্দারকে।' 'খবর ভালো না। বহুত বড়া গড়বড় আছে। তুই আমি বুঝবো না'

'কেন ওস্তাদ? এরকম বলছ কেন? কিছু দেখলে নাকি তেমন?'

'হ্যাঁ।'

'কী দেখলে ওস্তাদ? একটু খোলসা করে বল না'

'ভুকোতের চোখটা দেখেছিলিস?'

'না ওস্তাদ। কেন? তুমি দেখেছ?'

'হুমম। যখন কাছে গেছিলাম।'

'কী দেখলে ওস্তাদ?'

'ভুকোতের চোখ বিলকুল খালি'।

'মতলব???'

'চোখের পুরোটাই সাদা, আঁখ কি পুতলিটাই নেই।'

'কি বলছ ওস্তাদ? ঝুট বলছ না তো?

'তোকে ঝুট বলে আমার লাভ?'

'ইয়া আল্লা, কীসব কথা বলছ ওস্তাদ?'

'কাউকে বলিস না। ঘুমিয়ে পড়। আরেকটা ব্যাপারও দেখেছি। যখন হাত পাকড়াতে গেছিলাম।'

'কী ওস্তাদ?'

'ভুকোতের হাত ঠান্ডা, বিলকুল ঠান্ডা। মুর্দা লাশের মতন।'

লাকরাদৌনের সেই বিলের পাশে যখন ঘোড়া থেকে নামলেন উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান, তখন দুপুরের রোদের তেজ একটু কমেছে। তবে গরমের তাতটা একটুও কমেনি। তাতে অবশ্য স্লিম্যানের বিশেষ কিছু এসে যায় না। ভারতবর্ষের প্রখর সূর্যের প্রভাবে ইতিমধ্যেই খাঁটি ইংরেজটির গাত্রবর্ণ ঘোর বাদামি। বাদামি গাত্রচর্ম ছাড়াও ভারতবর্ষের আরেকটি দান সশ্রদ্ধায় বুকে তুলে নিয়েছেন ইনি, ভাষা। উত্তর ভারতে বলা হয় অথচ ইনি জানেন না, হেন ভাষা নেই, এমনকী পুশতু অবধি!

স্লিম্যান নেমে ঘোড়াটাকে এক জন সিপাইয়ের হাতে ধরে দিলেন। লম্বা লম্বা পা ফেলে পর্যবেক্ষণ করলেন পুরোটা। বিলের প্রায় পুরোটাই ঘুরে এলেন। ঝোপঝাড়গুলো সরিয়ে সরিয়ে দেখলেন। জঙ্গলের দিকেও খানিকটা গেলেন। সঙ্গে আসা জনাবিশেক সেপাই প্রায় ঝড়ই তুলে দিল আশেপাশে। শুধু এক জন দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। সে শুধু মাটি দেখছিল। আর কিছু না। তার জহুরি চোখ শুধু একটা চেনা দাগ খুঁজছিল, শুধুমাত্র বহুদিনের অভিজ্ঞতা ছাড়া যে দাগ খুঁজে বের করা শুধু মুশকিলই নয়, বস্তুত অসম্ভব। হঠাৎ করে চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'হো সাহেব, মিল গ্যায়া। এদিকে আসুন'। দৌড়ে আসেন স্লিম্যান, 'কাঁহা? হোয়েরে? হাউ কুড ইউ...' সেই মানুষটি একটা লম্বা গাছের ডাল নিয়ে বিলের ঠিক সামনে একটা বিশাল বর্গাকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দেয়, 'আপনার ফৌজকে বলুন এখানে খুঁড়তে।'

'এখানেই পাওয়া যাবে বলছ?'

'বেশক সাহেব, নইলে আমার নামে কুত্তা পালবেন।'

সাহেবের অঙ্গুলিহেলনে কুড়ি জন দেশীয় সিপাই ঝুড়ি কোদাল নিয়ে নেমে পড়ে, একটু দূরে অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা করতে থাকেন স্লিম্যান আর তার সঙ্গী।

বাইশটি মৃতদেহ কুরওয়াতে শোওয়ানো। শুধু একটি মৃতদেহ, এক অল্পবয়সি হিন্দুস্তানি কাহারের লাশ আলাদা করে রাখা। ঝপাঝপ মাটি পড়তে থাকে কবরে। নাসির খান মাদারি একজন দক্ষ কুথাওয়া। মৃতদেহের হাতে-পায়ের জোড় ভেঙে, ভাঙা হাঁটু থুতনি অবধি তুলে কবরে শোয়াতে ওর জুড়ি নেই। ছুটনিয়া দোসাদও ওর একজন যোগ্য সহকারী। ছুটনিয়া আরও একটা কাজ সবার থেকে ভালো পারে, সে একজন দক্ষতম ফুরজানা। কবর হবার পর, সব কিছু পরিষ্কার করে, মাটি সমান করে মিলিয়ে দিয়ে, আগের চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াতে তার প্রতিভা অবিশ্বাস্য। ছুটনিয়া সেই কাজই করছিল মন দিয়ে। শেষ হলে একটা সাদা চাদর এনে পেতে দেয় কবরের ওপর। শুরু হয় প্রথামাফিক ভোজসভা। মন্ত্রপূত তুপোনির গুড় তুলে দেওয়া হয় সবার মুখে।

সাচ্চা আউলা বা সুন মাত্রেই এই গুড়কে অমৃততুল্য জ্ঞান করে। ভোজসভা শেষ হলে, এক জন সদস্যকে মাউলি বানানো হয়। তার কাজ সামান্যই। পরিবার প্রতি শিকারের ভাগ নিয়ে দলের সবার বাড়ি বাড়ি সেই ভাগ পৌঁছে দেওয়া।

সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পর সেই দীর্ঘদেহী ব্রাহ্মণ উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় আদেশ করলেন, ‘তোমরা বুরোউতের রাস্তা ধরে খিজিরপুরের দিকে যাও। কাল সকালে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।’

এই প্রৌঢ়ের আদেশে এক কর্তৃত্বব্যঞ্জক দৃঢ়তা থাকে। অচেতন পরতে কিছু ক্রূর শীতলতাও মিশে থাকে নির্ঘাত। নইলে কেউ মুখ তুলে কিছু জিজ্ঞাসা করে না কেন? কই, ভুকোতের সময় তো এমন হত না, সে তো সুখে-দুঃখে সবার সঙ্গেই থাকত। মা ভবানীর প্রতিটা প্রসাদের পর সে একটি লাশ নিয়ে দল থেকে আলাদা হয়ে গেছে কোনোদিন? কে এই ব্রাহ্মণ? প্রতিবার কী করে এক-একটা তাজা লাশ নিয়ে?

এসব ভাবনা খোদাবক্সের মাথা গুলিয়ে দেয়। অব্যক্ত একটা ক্রোধ তার শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসতে চায়। কিন্তু কোথায় যেন প্রতিবাদটা বোবা হয়ে আসে। ভয়? বিষাদ? বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনা? হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে সাজিয়ে নেয় খোদাবক্স। তা নয়। এই হাতে কম করে দু-শো-র বেশি খৌরকে কবরে পাঠিয়েছে খোদাবক্স। ডর কাকে বলে ও জানে না। আজতক আঁচড় অবধি লাগেনি। মা ভবানীর কৃপা ছাড়া আর কি হয় এসব?

কিন্তু ভুকোত? মাথার ওপর বটগাছের মতন ছায়া হয়ে থাকা ভুকোত? তিন বছর আগে সেই শেষ সাক্ষাতের পর হঠাৎ করে একদিন চিতায় ছাই হয়ে যাওয়া ভুকোত? তার ভালোবাসার ঋণ কী করে শুধবে খোদাবক্স খাঁ?

ভুকোতের সঙ্গে সুখেই ছিল সবাই। সুখ, মিলেমিশে থাকার বেরাদরি সুখ। এই ব্রাহ্মণ যবে থেকে দলের রাশ হাতে নিয়েছে, দলের হাতে টাকা এসেছে বিপুল। তিন বছরে অন্তত বিশ বার বিভিন্ন দলের ওপর খোমুসনা হয়েছে তারা। থিবাই দিয়ে, অর্থাৎ ভুলিয়েভালিয়ে বসিয়ে দিয়ে ঝিরণী দিয়েছে অসতর্ক মুহূর্তে। আশ্চর্যজনক ভাবে প্রতিবারই দেখা গেছে তারা পেয়েছে চিসা শিকার, সম্পন্ন গৃহস্থ। ফুলেফেঁপে উঠেছে দলের সবার সম্পদ। বাকি দলগুলো তো রীতিমতো ঈর্ষা করতে শুরু করেছে এদের। হবে নাই বা কেন? তাদের কপালে জুটেছে সব ফালতু ভাঙ্গি, গরিব দেহাতি লোকজন। নেহাত ভবানীর আদেশ, কোনো শিকারকে ছেড়ে দিতে নেই, তাতে মায়ের অসম্মান হয়, তাই তাদেরও কবরস্থ হতে হয়েছে। পয়সা পেয়েছে যৎসামান্যই।

ফিরে আসছিল খোদাবক্স। তার মনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। ভুকোতের শাসনে বড়ো ভাইয়ের প্যায়ার মিশে থাকত। এই ব্রাহ্মণ শুধু জানে আদেশ করতে। আর সেই আদেশে মিশে থাকে কঠিন নিষ্ঠুরতা। তাকে অমান্য করার কথা ভাবাও পাপ। লোকটা যেন সব জানে, সব বোঝে, সর্বত্র চোখ তার। ঠান্ডা চোখে যখন তাকায়, কলিজাটা জমে যায় বরফের মতো। মনে হয় লোকটা ভেতরের সব কিছু পড়ে নিচ্ছে।

আরও আশ্চর্যের কথা এত খোর, তামার ব্রুস, সেটাকের গয়নাগাটি, লোকটা এর এক পয়সাও ভাগ নেয় না! তাহলে এসেছে কেন এই দলে? কী চায় ও? কীসের লোভে পড়ে আছে ও? আর প্রত্যেক বার একটা

করে তাজা লাশ নিয়ে কী করে ও? কোথায় যায় একা একা? বার বার এই লাকরাদৌনেই ও বিয়াল খোঁজে কেন? কী আছে জঙ্গলের ভেতর? আর কোন মন্ত্রবলে সকাল হতে না হতেই দশ কোশ হোক, বিশ কোশ হোক, ঠিক পৌঁছে যায় দলের কাছে? কী কৌশলে?

নাসির চুপচাপ হাঁটছিল পিছনে, এবার একটু পা চালিয়ে ধরে খোদাবক্সকে, 'কী ভাবছ ওস্তাদ? চুপচাপ যে। এবার তো মা ভবানী ছপ্পড় ফাড়কে পয়সা দিয়েছেন। নসিবে এত পয়সা ছিল, ভেবেছিলে কোনোদিন?'

'হুমম।'

'একটা কথা বলবে ওস্তাদ?'

'বল। শুনি।'

'গুসসা করবে না তো?'

'বল। জ্যায়াদা তামাশা করিস না।'

'এই লোকটা প্রত্যেক বার একটা লাশ নিয়ে কী করে?'

'আমি কী করে জানব বুরবক? আমি কি ওর সঙ্গে থাকি?'

'আরে, গুসসা কেনো করো ওস্তাদ। বলছি তোমার কী মনে হয়? কী কী করতে পারে লোকটা লাশ নিয়ে?'

'কাঁচা কাঁচা খায়। বুঝেছিস? চুপ থাক।'

'ইয়া আল্লাহ।'

এরপর দু-জনে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে খোদাবক্স। নাসিরকে বলে, 'তুই পা চালিয়ে যা। আমি এক দোস্তের সঙ্গে দেখা করেই আসছি। এক রোজ বাদ মিলব। খিজিরপুরের কাসটম হোউসের আশেপাশে থাকিস। পৌঁছে যাব। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলে সত্যি কথাই বলিস।'

'কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ ওস্তাদ?'

'দোস্ত। বললাম তো।'

'নাম বললে না যে?'

'কী করবি তুই নাম জেনে?'

বলে ক্ষণিকের জন্যে থেমে যায়।

'কাউকে বলিস না কিন্তু। ফিরিঙ্গিয়া, ওর নাম হল ফিরিঙ্গিয়া।'

'একটা কথা খেয়াল করেছেন সাহেব?' নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্লিম্যান। কথাটা কিছু পরে ওনার কানে পৌঁছয়। ততক্ষণে সামনে কতগুলো পচে যাওয়া লাশ কবর থেকে উঁকি দিচ্ছে। লাশপচা গন্ধে বাতাস ভারী। দু-একটা শকুনও ওড়াউড়ি করতে শুরু করেছে এদিক-ওদিক।

'বল।'

'ভোপাল থেকে কী খবর পেলেন সাহেব? কতজন ছিল বহরে? সবসুদ্ধু?'

'আঠেরোটা কাহার, চারটে সিপয়, আর আহমেদ খান নিজে। তেইশ। টুয়েন্টি থ্রি।'

'কটা লাশ দেখতে পাচ্ছেন সাহেব?'

'ওয়ান-টু করে গুনতে শুরু করেন স্লিম্যান। 'টুয়েন্টি টু। স্ট্রেঞ্জ! আরেকটা বডি গেল কোথায়?'

চোখ কুঁচকে উনি সঙ্গীটির দিকে তাকান। দু-চোখে প্রশ্ন আর সংশয়।

সঙ্গীটি মাথা নীচু করে কী যেন ভাবতে থাকে। ওকে ঘাঁটান না স্লিম্যান। এই অসম লড়াইয়ে এই লোকটিই ওনার অন্ধের যষ্ঠি।

'দো সাল আগে আমার এক দোস্ত একটা আজব কথা বলেছিল আমাকে। তখনও আমি আপনার হাতে ধরা পড়িনি। অচানক নাকি তাদের সর্দার বদল হয়ে গেছে। আগের সর্দার নাকি মুর্দা লাশের মতন হয়ে

গেছিল অচানক। তখনই নাকি এক বরাম্ভন নতুন সর্দার হয়ে বসে, আর তারপর থেকেই নাকি দলের নসিব গেছে ফিরে। মা ভবানী নাকি ধনদৌলত ছপ্পড় ফাড়কে এনে দিচ্ছেন ওদের। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'সর্দারটি নাকি বড়ো আজিব কিসিমের।'

'এক্সপ্লেইন।'

'ধনদৌলত পয়সাকড়ি কিচ্ছু নেয় না। শুধু লাশ নেয়।'

'হোয়াট?' সচকিত হয়ে ওঠেন স্লিম্যান, 'লাশ নেয়? শুধু লাশ নেয়? মানে কী এর?'

'জানি না সাহেব। এসব আমাদের প্রথার বাইরে। আমাদের প্রথায় সবাইকে, সবাইকেই কবর দেওয়াটাই নিয়ম, ছোটোবেলা থেকে তাই শুনে এসেছি। কিন্তু এই বরাম্ভনের ওপর কেউ কথা বলতে পারে না সাহেব। সবার মনে এমনই খওফ বানিয়ে রেখেছে লোকটা।'

'কীসের খওফ?'

'কেউ জানে না সাহেব। লোকটার মধ্যে নাকি কী একটা ডরাওনি খুবিঁয়া আছে, কেউ এর ওপর কোনো কথাই বলতে পারে না।'

'স্ট্রেঞ্জ, এক্সট্রিমলি স্ট্রেঞ্জ। বাট, লাশ নিয়ে করে কী লোকটা?'

'কেউ জানে না সাহেব।'

'হুমম', কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে কী ভাবেন স্লিম্যান।

'নাম কী সেই ব্রাহমিন সর্দারটির?'

কিছু একটা বলতে গিয়েও আটকে গেল লোকটা। তাড়া দিলেন স্লিম্যান, 'বল ফিরিঙ্গিয়া, নাম কী ওর।'

ভয়ার্ত থমথমে মুখে নামটা উচ্চারণ করে ফিরিঙ্গিয়া, ভারতের ইতিহাসে ধূর্ততম খুনিদের মধ্যে অন্যতম খুনি,

'সাহেব, ওর নাম পণ্ডিত, ঠগিদের বেতাজ বাদশা দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত।'

রাত তখন গভীর। জঙ্গলের অনেক ভেতরে একটি ছোটো মজে যাওয়া খালের পাশে শবদেহটিকে ফেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামান্য হাঁফাচ্ছিলেন দুর্গাশঙ্কর। এই শবটিকে কাঁধে করে টেনে আনতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে ওনাকে। হাজার হোক, বয়েস তো হয়েছে। আর তার ওপর এই অল্পবয়সি কাহারটি যথেষ্ট ভারী। বয়েস, কথাটা মনে পড়তেই একটা মৃদু হাসি দেখা দিল দুর্গাশঙ্করের মুখে। সময়, আয়ু, জরতা এসব জয় করবার জন্যেই তো এত পরিশ্রম, আর পরিকল্পনা।

সময় মানে কাল, আর সে কালের অধীশ্বরী মা কালিকা। কালিকার পূজায় একাগ্র যে সাধক, তিনি লাভ করেন অনিঃশেষ দৈব সিদ্ধি, অতুল ঐশ্বর্য, অগণন সম্পদ, অপরিমিত সুখ, আর সেসব ভোগ করার জন্যে এক জরাহীন, দুঃখহীন, রোগহীন অনন্ত পরমায়ু।

আর লাভ করেন একটি অচিন্তনীয়, অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা!

অতুল ঐশ্বর্য চাই না দুর্গাশঙ্করের, এত সাধনা শুধু ওই অশ্রুতপূর্ব, অসম্ভব, অভাবনীয় ক্ষমতাটি করায়ত্ত করার জন্যেই!

বড়ো কঠিন, বড়োই কঠিন এ পথ, নিজের মনেই মাথা নাড়েন দুর্গাশঙ্কর। বিন্দুমাত্র পদস্খলনের অর্থ তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। দুর্গাশঙ্করকে কি কম কষ্ট করতে হয়েছে এতটা পথ আসতে? এ কি গ্রাম্য গৃহস্থের সাধারণ মূর্তিপূজা? এই সাধনায় লাগে নিগূঢ়তম সাধন উপচার, নিশ্ছিদ্র সাধনপ্রক্রিয়া, নিবিড় মনঃসংযোগ।

আর লাগে নির্মমতম অর্ঘ্য।

আজ তেমনই এক অর্ঘ্য নিয়ে এসেছেন দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত। চেনা জঙ্গলে, চেনা মজে যাওয়া খালের ধারে, চেনা শ্মশানে।

আজ থেকে কয়েক-শো বছর আগে এইখানেই ছিল এক ক্ষুদ্র শ্মশান। খুঁজলে তার কিছু চিহ্ন এখনও ইতিউতি চোখে পড়বে। তখন খালে আসত ছলছল জলপ্রবাহ, তার সংযোগ ছিল রেওয়া, বা নর্মদার সঙ্গে। পার্শ্ববর্তী জনপদ থেকে দেহ সৎকার করতে যাবতীয় শবদেহ নিয়ে এখানেই আসত গ্রামের লোকজন। প্রায়ই 'রামনাম সৎ হ্যায়' ধ্বনিতে মুখরিত হত এই ছোটো শ্মশানটি। দাহকার্য সমাধা করে, খালের জলে অস্থি বিসর্জন করে, হাত-পা ধুয়ে দেহাতি লোকজন ফিরে যেত চেনা সংসারবৃত্তে। কালের গতিতে ক্রমে নদীর বাঁক দিক পরিবর্তন করে। খাল মজে যায়। কমে যায় লোকজনের যাতায়াত। ধীরে ধীরে জঙ্গল এগিয়ে এসে গ্রাস করে এই এলাকা। শুধু খাল যেখানে বাঁক নিয়ে নর্মদার দিকে এগিয়ে যেত এককালে, সেখানে থেকে যায় এক বিল।

দুর্গাশঙ্কর এই শ্মশানের খোঁজ পান তার গুরুর কাছে। অমিত তন্ত্রশক্তিধারী সেই বৃদ্ধসাধক নিজের প্রিয়তম শিষ্যকে এই গহীন জঙ্গল, এই শ্মশান তার চূড়ান্ত সাধনসিদ্ধির পথ চিনিয়ে দিয়ে যান, আর বলে দিয়ে যান মহার্ঘতম উপচারটি সংগ্রহের একমাত্র উপায়টির কথা, ঠগি। মা ভবানীর অনুরক্ত, ভারতবর্ষের ইতিহাসের দুর্ধর্ষতম, নিপুণতম, নিষ্ঠুরতম খুনিদের দল, ঠগি।

গুরুদেব ত্রিকালসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তিনিও দুর্গাশঙ্করের অভীষ্ট জেনে প্রথমে কিছুতেই সম্মত হননি তন্ত্রের এই ভয়ংকরতম প্রকরণটি শেখাতে। শেষে শিষ্যের নিষ্ঠা আর একাগ্রতার কাছে ওনাকে হার মানতে হয়।

সচল হয়ে ওঠেন দুর্গাশঙ্কর। অনেক কাজ বাকি। এখনই শুরু করতে হবে বাকি প্রক্রিয়া।

শ্মশানের এক প্রান্তে একটি ছোটো কুঁড়ে ঘর। সেখান থেকে এক এক করে সমস্ত উপচার ও উপকরণ নিয়ে আসেন উনি। গাছের ডালে আবার একটি প্যাঁচা ডেকে ওঠে। বড়ো সুলক্ষণ, বড়ো সুলক্ষণ, বিড়বিড় করেন দুর্গাশঙ্কর। শবদেহটিকে কোমর ধরে পূর্ব দিকে মাথা রেখে উলটো করে শুইয়ে দেন। খুলে দেন পরনের সমস্ত কাপড়। কলসে করে জল রাখাই ছিল, এনে ধুইয়ে দেন অনাবৃত শরীর। ধীরে ধীরে চন্দনে চর্চিত করেন সমস্ত দেহ, কাঁধে, পিঠে, বাহুমূলে, করতলে এঁকে নেন বিশেষ কিছু শাস্ত্রচিহ্ন।

এরপর পূর্বে গুরু, পশ্চিমে বটুক, উত্তরে যোগিনী আর দক্ষিণে গণেশকে অর্চনা করে শুরু করেন শাস্ত্রোপচার।

প্রাথমিক পূজার্চনা শেষ হলে জয় ভবানীমন্ত্রে ভূতশুদ্ধি করে, শবের মাথার নীচে এনে দেন ঘাসের শয্যা। মুখের কাছে এনে রাখেন পোড়া মাছ, ভিজানো ছোলা, আর দেশি মদ, শব জেগে ওঠার উপক্রম করলে এগুলি মুখে দিতে হবে। এরপর শবের দশ দিকে বারো আঙুল পরিমাপ দূরে দূরে প্রোথিত করে দেন অশ্বত্থ গাছের শাখা। এতদন্তে শবের উপরে বসে শুরু করেন তন্ত্রের জটিলতম প্রক্রিয়া, শবসাধনা।

তারপর অনেক সময় পরে, সমস্ত রাতচরা পাখি ঘরে ফিরে এলে, ব্রাহ্মমুহূর্তের একটু আগে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত। আজকের সাধনাও সফল হয়েছে ওনার। পরিপূর্ণ হৃদয়ে, প্রসন্ন মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেন তিনি। আর একটি, মাত্র একটি সোপান বাকি। তারপরেই দেবাসুরেরও অনায়ত্ত সেই মহত্তম ক্ষমতাটি ওনার মুঠোর মধ্যে! স্মিত হাসি ফুটে ওঠে দুর্গাশঙ্করের শুষ্ক অধরে। সাপের মতন সরু জিভ বার করে ঠোঁটটা চেটে নেন উনি।

এক-শো সাতটি শবসাধনা সম্পূর্ণ হল। আর একটি। মাত্র একটি। শেষ সাধনা। মহাভৈরব মন্ত্রে মহাকালী আর কালভৈরবের শেষ আরাধনা, তারপরেই...

পুব আকাশে লাল আভার ক্ষীণতম আভাস পাওয়ামাত্র চঞ্চল হয়ে ওঠেন দুর্গাশঙ্কর। এই শব এখানে ফেলে রাখা যাবে না, ব্রাহ্মমুহূর্তের আগেই একে নিক্ষেপ করতে হবে উদ্দিষ্ট ক্ষেত্রে। দ্রুত মৃতদেহটির পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করেন উনি। মেঠো জঙ্গুলে পথ। দ্রুত চলন দেখে বোঝা যায় যে এ পথে ওনার আসা-যাওয়া আছে ভালোই। শ্মশানঘাট থেকে বেশি দূরও নয়, কয়েক-শো গজ গেছেন মাত্র, একটা

সুঁড়িপথ ঘুরেই থেমে যান উনি। সামনে মাটির ওপর একটা গোলাকার বড়ো জায়গা, শুকনো ঘাসপাতা, খড় আর ঝরা নারকেল গাছের শাখা দিয়ে ঢাকা।

দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত দ্রুত অভ্যস্ত হাতে সেইসব ডালপালা সরিয়ে রাখেন। সঙ্গেসঙ্গে এক বিশাল কুয়োর মুখ উন্মুক্ত হয়। আর একটা প্রাচীন মড়াপচা গন্ধ ধাক্কা মারে ওনার মুখে, ধীরে ধীরে সেই ম্লান বিষন্ন কটু গন্ধ আশেপাশের বাতাস ভারী করে দিতে শুরু করে। দুর্গাশঙ্কর দ্রুত এই মৃতদেহটিকে কুয়োর মধ্যে ঠেলে দেন। ধপ করে একটা আওয়াজ হয়। কোনো হাহাকারের আওয়াজ পাক খেতে খেতে উঠে এল নাকি? নাকি কোনো পুঞ্জীভূত নিষ্ফলা ক্রোধের আঁচ অব্যক্ত আক্রোশে মাথা কুটছে নিঃসীম পাতালের নীচে? গোঙানির মতন একটা চাপা কান্না মাটির দেওয়াল ধরে উঠে আসতে চাইছে না? ওরা সব কেমন আছে নীচে? ওরা সবাই? দুরন্ত কৌতূহল হয় দুর্গাশঙ্করের। ক্ষণেকের মানুষী দুর্বলতা গ্রাস করে নিষ্ঠুর দুর্গাশঙ্করের অন্তঃকরণকে।



জঙ্গলের মধ্যে তখনও অন্ধকার। ভালো করে কিছু দেখা যায় না। কোঁচড় থেকে চকমকি পাথর বের করে কিছু শুকনো ঘাস পাতা জ্বালান তিনি। তারপর একটি ঝাঁকরা দেখে শুষ্ক বৃক্ষশাখা জ্বালিয়ে নেন তাতে। চমৎকার মশালের মতন আলো হয়। ধীরে ধীরে সেই অন্ধগহ্বরের সামনে মশালটিকে নিয়ে যান উনি। মুহূর্তের আলোয় দেখেন অগণন মৃতদেহ শুয়ে আছে কুয়োর নীচে। আর কেউ না জানুক, দুর্গাশঙ্কর জানেন যে ওরা সংখ্যায় এক-শো সাত! ধক করে একটা হাওয়া এসে নিভিয়ে দেয় সেই মশাল। দুর্গাশঙ্কর মা ভবানীর নাম নিয়ে কুয়োর মুখ ঢেকে দিতে থাকেন অভ্যস্ত হাতে। উনি কি ঠিক দেখলেন? মুহূর্তের আলোয় মনে হল যেন প্রতিটি মৃতদেহ একেবারে অবিকৃত, যেন সবকটিকেই গতকালই নিক্ষেপ করা হয়েছে এখানে। ঠিক দেখলেন কি? নাকি এ শুধুমাত্র শ্রান্ত স্নায়ুর মতিচ্ছন্নতা, রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে? কোথাও একটা তক্ষক ডেকে উঠল। উঠে দাঁড়ালেন দুর্গাশঙ্কর, পিছন ফিরে জঙ্গলের বাইরে, লাকরাদৌনের রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে আরও একজোড়া পা সেই একই রাস্তা ধরল। চিন্তামগ্ন হওয়ার দরুন দুর্গাশঙ্কর, পিশাচসিদ্ধ দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত এই অনধিকারচর্চার খোঁজ পেলেন না!

'সাহেব।'

চিন্তার রেস কেটে যায় স্লিম্যানের। কুঠিতে নিজের অফিস ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দূরের একটা টিলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবছিলেন। এদেশে আসার আগে থেকেই অনেক কিছু শুনেছিলেন স্লিম্যান। হাতি, স্নেক চার্মার, রোপ ট্রিক, আর সাধুসন্ন্যাসীদের দেশ নাকি ভারতবর্ষ। শুনেছিলেন এদেশের অতুল ঐশ্বর্য আর অতিথিপরায়ণতার কথা। এসে দেখেছেন আরও অনেক কিছু। দেখেছেন মুষ্টিমেয় লোকের অবিশ্বাস্য পরিমাণ ঐশ্বর্য আর বাকি ভারত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বুভুক্ষু দারিদ্র্য, অন্ধ অশিক্ষা, আর আদিম কুসংস্কার। দেখেছেন ভেঙে পড়া শাসনব্যবস্থা, সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা। দেখেছেন সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে একই রাস্তায় হেঁটে চলা ঠগি, ম্যাকফানসা আর ধুতুরিয়াদের, লুঠপাট আর খুনজখম করে উদরপূর্তি করাই

যাদের কাজ। দেখেছেন আইন ও শাসনব্যবস্থার শোচনীয় দুরবস্থা, চারিদিকে কালো কুয়াশার মতন ছড়িয়ে থাকা ভয় আর অরাজকতার বাতাবরণ।

সামনের জমিতে থেবড়ে বসে আছে দুটি মানুষ। উর্ধাঙ্গে একটা নোংরা ফতুয়া পরনে, ততোধিক নোংরা একটা ধুতি নিম্নাঙ্গে, হাঁটুর ওপর অবধি গোটানো। গালে অনেকদিনের না কামানো দাড়ি, ধূলিধূসরিত পা। দু-জনেরই দু-চোখে একটা উদাস শান্ত সমাহিত দৃষ্টি, হঠাৎ করে দেখলে সাধুমহাত্মা বলে ভুল হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

এবং এই দু-জনকে বাদ দিয়ে শুধু স্লিম্যান, একমাত্র স্লিম্যানই জানেন যে এই দু-জনের শিরা ওঠা হাতগুলির ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে লেখা আছে কোনো ভয়ংকরতম ইতিহাস। সাত-শো থেকে আট-শো, স্লিম্যান নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না, তবে ওর মধ্যেই হবে, প্রায় এতগুলো মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, বিস্ফারিত চোখে, সামনের দিকে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চেয়ে ছটফট করতে করতে মরেছে, তার পর চিরঘুমে শায়িত হয়েছে কোনো-না-কোনো কবরের তলায়, বিস্তীর্ণ মধ্যভারত জুড়ে! এই দুই জোড়া হাতের দৌলতে।

তোপের মুখে বেঁধে দুটোকেই উড়িয়ে দেওয়া উচিত। ইংল্যান্ড হলে সেই হুকুমই দিতেন স্লিম্যান, মধ্যভারতে কোম্পানির প্রতিনিধি উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান। কিন্তু এই লোকগুলোকে ওনার চাই। নইলে মাকড়সার জালের মতন সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে থাকা এই অত্যন্ত গুপ্ত খুনি সংগঠনটিকে উনি টেনে তুলতে পারবেন না। ওনার একটা প্রবেশসূত্র দরকার, একটা ছোটো ছিদ্র, তারপরেই...

‘বল ফিরিঙ্গিয়া, কী বলছিলে। দোস্তকে নাস্তাপানি করিয়েছ?’

‘জি সাহেব।’

‘বল, তোমার দোস্ত কী বলতে চায়। প্রথম থেকে বলতে বল। কী নাম তোমার?’

আরেকজন নড়েচড়ে বসে, সেলাম করে, ঘরঘরে গলায় নিজের নাম বলে।

প্রথমে ঠিক করে নামটা শুনতে পাননি স্লিম্যান, ভুরু কুঁচকে একটু এগিয়ে আসেন,

‘খোদাবক্স, সাহিব’, গলাটা খাঁকার দিয়ে পরিষ্কার করে নেয় আগন্তুক, ‘বান্দার নাম খোদাবক্স। সাকিন নৈনপুরের কাছে জেওনারা গাঁও। আমি একজন ঠগি হুজুর, ভুকোত জমাদারের দলের। কামকাজ ভালোই চলছিল হুজুর, মা ভবানীর দোয়াতে। হাসিখুশি ছিলাম সবাই, ভাই বেরাদরের মতন। কিন্তু হুজুর আজ থেকে তিন সাল পেহলে...’

দুনিয়া ভুলে এই লোকটির কাছে আরও নিবিড় হয়ে ঘেঁষে বসেন স্লিম্যান। ভ্রূকুটিকুটিল, কিন্তু উজ্জ্বলচোখে।

শেষপর্যন্ত অচিন পাখির খোঁজ পাওয়া গেল!

সকালটা শুরু হয়েছিল আর পাঁচটা সকালের মতোই। দলের নাউরিয়া বাবুনিয়া দুসাদ সবাইকে ডেকে ডেকে দিচ্ছিল। দলের নতুন নাউরিয়াদের কাজই হল এইসব বেকার খিদমদ খাটা, আসল কাজ শেখাবার নামই নেই, অসন্তুষ্ট মুখে বিড়বিড় করছিল বাবুনিয়া। তবে জায়গাটা খাসা, কারও সন্দেহের কোনো কারনই থাকবে না। খিজিরপুরের কাস্টম্স হৌসের একটু দূরে একটা বড়ো আমবাগানের মধ্যেই ডেরাডান্ডা বেঁধেছিল দলের সবাই, ঠাকুর যেমনটি বলে দিয়েছিলেন! কোম্পানির ছত্রছায়ায় বসে থাকার সুবিধাও অবশ্য অনেক, বেকার হ্যাঙ্গামা হুজ্জোত এড়ানো যায় সহজেই। খোদাবক্স ফিরেছিল একটু ভোররাতের দিকেই। ঘুমও আসে না ছাই এই অসময়ে, তাই ফতুয়াটা খুলে তাকিয়া মতো করে মাথার নীচে দিয়ে একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছিল আর কী! এমন সময়ে মুখের ওপর কোন বেওকুফের ছায়া পড়ল কে জানে? খোদাবক্স আধবোজা চোখটা বিরক্তির সঙ্গে খুলেই দেখে ঠাকুর! ধড়মড় করে উঠেই বসছিল খোদাবক্স, ঠাকুর ইশারায় উঠতে বারণ করেন। নিজেই ধপ করে বসে পড়েন পাশে।

‘খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে খোদাবক্স। তবিয়ত শরিফ তো? গেছিলে কোথায়? অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে মনে হচ্ছে, বলি দোস্তের বাড়ির সব খবর ভালো তো?’

‘সতর্ক হয় খোদাবক্স। এই হ্যায়ওয়ান বরাম্ভনটার কাছে বেশি মুখ খোলা যাবে না আর। এইসব ভালো ভালো প্রশ্নের মানেই হচ্ছে পাক্কা কিছু সন্দেহ করেছে শয়তানটা। মুখৌটা পরে থাকতে হবে, হরহামেশা। যদ্দিন না...

‘হ্যাঁ ঠাকুর। অনেকটা আসতে হয়েছে হেঁটে, রাস্তা কি কম? সেই খুরাই থেকে রাত থাকতেই রওয়ানা দিয়েছি, সকাল সকাল দলের সঙ্গে মোলাকাত করতে হবে যে! আর হ্যাঁ, আপনার দোয়াতে দোস্ত আর ওর জরু ভালোই আছে। ফসল ভালোই হয়েছে এবার। নতুন বলদ কিনেছে দুটো, নানহিমুনহি একটা বেটিও হয়েছে ওদের।’

‘বেটি?’ একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান ঠাকুর, ‘বেটি বললে নাকি?’

একটু ঘাবড়ে যায় খোদাবক্স, ভুল কিছু বলল নাকি? নাকি বেটা বললেই সুবিধা হত?

‘হ্যাঁ ঠাকুর। খুব প্যায়ারি একটা বিটিয়া রানি হয়েছে ওর। বেটি খুব হাসমুখ, সবসময় খিলখিল করছে’, সতর্ক হয়ে বলে খোদাবক্স।

‘বেটি? বাহ্, খুব ভালো। খুব গোলমাটোল হয়েছে নিশ্চয়ই? খুব গোরি? খুব হাসে বলছ? খুব প্যায়ারি হয়েছে?’

খোদাবক্স একটু ঘাবড়ে যায়। এসব প্রশ্নের উত্তর মোটেই তৈরি করে আসেনি সে। সিলম্যান সাহিবও এসব বলে দেননি যে!! এই উৎকণ্ঠা থেকে ত্রান করলেন ঠাকুর নিজেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে গেলেন। খোদাবক্সকে বিমূঢ় রেখে!

সগরের কোম্পানিকুঠিতে সেদিন সকাল থেকেই সাজো সাজো রব। কলকাতা থেকে খোদ ফিরঙ্গ সেপাই এসেছে পঞ্চাশ জন মতন। কী তাগড়াই শরীর তাদের, কী ভাবলেশহীন মুখ, আর কী কুচকাওয়াজের বহর। তার ওপর বড়ো বড়ো বন্দুক এক একজনের কাঁধে। সরু চোখে এসব দেখে যাচ্ছিল ফিরিঙ্গিয়া, আর ভাবছিল এই আদব, এই আরাস্তাগি আছে বলেই না এই ফিরঙ্গরা এত বড়ো হিন্দুস্তানে থানা গেড়ে বসেছে! প্রাক্তন ঠগি, বেহরামের পর দুর্ধর্ষতম ঠগি ফিরিঙ্গিয়া একটু ম্লান হাসি হাসল। সব এদের অধিকারে যাবে। সমস্ত হিন্দুস্তান লাল হয়ে যাবে। এই ফৌজ একদিন দিল্লি থেকে কালিকট, নাগপুর থেকে কলকাত্তা দাপিয়ে বেড়াবে। দুর্বল হিন্দুস্তান চেয়ে চেয়ে দেখবে শুধু। ভালোই হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরিঙ্গিয়া। এখনই কি খুব ভালো আছে দেশ? চোর জোচ্চর বাটপাড়ে যে ভরে গেল সব। লাখনউ আর দিল্লিতে পুরানি খানদানি নওয়াব আর কলকাত্তায় নয়া বড়োলোকদের বাবুয়ানি ছাড়া বাকি দেশে কানুনি হুকুমত আছে কিছু? ফিরিঙ্গিয়ারা না হয় ঠগি, মা ভবানীর আদেশ ছাড়া মানুষ খুন করে না, শাস্ত্রের আদেশ ছাড়া কাসসিতে হাত অবধি ছোঁয়ায় না, বাকিরা? ধুতুরিয়ারা? ম্যাকফানসারা? ভাঙ্গিরা? ছোটোখাটো জমিন্দারেরা? এক এক জন তো সাক্ষাৎ নরপিশাচ। গাঁয়ের খুনে তহশিলদার ছোটে সিং তোমর ওর ঘরে আগুন লাগিয়ে সব ছারখার করে না দিলে কি আজ ফিরিঙ্গিয়া এই রাস্তায় নামত?

চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিল ফিরিঙ্গিয়া, পাশে স্লিম্যান এসে দাঁড়াতে হোঁশ ফিরে পায়।

‘কোই হুকুম মেরে লিয়ে, সাহেব?’

‘শুধু রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেই হবে। তোমার দোস্ত চিনতে পারবে তো?’

‘বেশক হুজুর, খোদবক্স খুবই হোঁশিয়ার লোক। আন্ধেরাতেও বিলকুল সাফ দেখে। বিলকুল চিন্তা না করে সাহেব।’

‘বেশ বেশ। আর আজকেই হবে তো ব্যাপারটা? তুমি নিশ্চিত?’

‘হ্যাঁ, সাহেব’, পেছন থেকে আওয়াজ আসে, ‘আমার গণনা যদি ঠিক হয়, আর পণ্ডিতজি যা করছেন বলে খবর পেয়েছি তা যদি সাচ্চা হয়, আজই সেই দিন, শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। মকরে শনি প্রবেশ করবেন আজ রাতে, কালভৈরবের পূজার জন্যে এর থেকে ভালো দিন পণ্ডিতজি আর পরের পঞ্চাশ বছরেও পাবেন না।’

ঘুরে দাঁড়ান স্লিম্যান। এতক্ষণ ধরে পাশের একটা ঘরে ওল্ড কিছু স্ক্রিপচার্স নিয়ে কীসব করছিল এই ব্রাহমিন। ফিরিঙ্গিয়া দেখেই মাটিতে শুয়ে পড়ে, ‘গোর লাগি ঠাকুর।’

অনেক খুঁজেপেতে একে নিয়ে এসেছেন স্লিম্যান। এই দেশের ব্ল্যাক ম্যাজিক আর রিচুয়ালসের কিছুই বোঝেন না তিনি। তাই দরকার ছিল এমন একজনের যে পুরো ব্যাপারটা বুঝে একটা ওয়ে আউট বলে দেবে। এই ডার্ক ব্রাউন কালারের, শর্ট হাইটের ব্রাহমিনটি বেঙ্গলের লোক, নর্মদার তীরে ফেমাস শিভা টেম্পলে পিলগ্রিমেজ সেরে ফিরে যাচ্ছিল। ফিরিঙ্গিয়াই খোঁজ আনে এই লোকটার। খুবই নাকি পাওয়ারফুল ব্রাহমিন এ, আর একটা কীসে যেন খুব ফেমাস... কী যেন যেন... ইয়েস, তান্ত্রা!!

‘তুমি ঠিক বলছ ঠাকুর?’, একটু সন্দেহই যেন প্রকাশ পায় স্লিম্যানের গলায়। মৃদু হাসেন সেই ব্রাহ্মণবটু, ‘আমার গণনা কখনো ভুল হয় না সাহেব। তোমরা যা বললে, সব শুনে মনে হচ্ছে আজই সেই দিন। আর যদি দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত এই সাধনায় সফল হন, মহা অনর্থ হয়ে যাবে সাহেব’, চোখ বুজে শিউড়ে উঠলেন তিনি।

‘কীসের অনর্থ ঠাকুর?’ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন স্লিম্যান।

‘তুমি বুঝবে না সাহেব। আমার জ্ঞানমতে গত পাঁচ-শো বছরের মধ্যে এই সাধনপথে এগোবার সাহস করেনি কেউ। শবসাধনা বোঝ সাহেব? একটি সদ্যমৃত লাশ নিয়ে সারারাত একা নির্জন শ্মশানে বসে ভয়ংকর সাধনা। অনেক তান্ত্রিকের জীবনে একবারও শবসাধনা করার সৌভাগ্য হয় না। আর ইনি একের-পর-এক শবসাধনা করে চলেছেন... এর একটাই মানে হয়...’ চিন্তিত হয়ে পড়েন সেই খর্বকায় ব্রাহ্মণ, ‘আর যদি তাই হয়, পণ্ডিতজিকে আটকানো জরুরি, খুব জরুরি। ভগবান না করুন, আজই যদি এক-শো আটতম সাধনা পূর্ণ হয়...’ বলে ফের শিউড়ে উঠলেন তিনি, হাত দুটো বুকের মধ্যে রেখে বিড়বিড় করে ইষ্টনাম স্মরণ করেন তিনি।

এক-শো আট? মুহূর্তের মধ্যে আঁতকে ওঠেন স্লিম্যান, বুকে দ্রুত ক্রুশচিহ্ন আঁকেন, ‘মাই গুডনেস। কী বলছ কী ঠাকুর?? আর যদি দুর্গাশঙ্কর সাকসেসফুল হয়ে যায়, তাহলে কী হবে ঠাকুর? বললে না যে?’

‘নিজের ইচ্ছেমতন একজন মৃত মানুষকে ফের বাঁচিয়ে পৃথিবীতে ফেরত আনতে পারবেন উনি। বুঝে দেখো সাহেব, এ কত বড়ো ক্ষমতা!!! খুবই গূঢ় তন্ত্রসাধনা এই কালভৈরবপূজা, অতি অল্পসংখ্যক লোকই জানে। কেউ প্রয়োগ করার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবে না। উনি যে শুধু ভেবেছেন তাই নয়, নির্ভুল লক্ষ্যে মাপা ছক কেটে এগিয়েছেন, সহজে লাশ পাবেন বলে ঠগিদের দলেও ভিড়েছেন। বহুদিনের পরিকল্পনা আর অলৌকিক শক্তি ছাড়া এসব হয় না সাহেব। যেভাবে ভুকোত জমাদারকে বশ করেছেন বলে শুনলাম, উচ্চকোটির পিশাচসিদ্ধ না হলে এ ক্ষমতা সম্ভব নয়।’

একটু ইতস্তত করেন স্লিম্যান, ‘যদি তোমার কথা সত্যি ধরে নিই ঠাকুর, যদি সত্যি দুর্গাশঙ্কর এক জন কাউকে বাঁচিয়ে তোলে, তাতে কী অনর্থ হতে পারে?’

‘কী বলছ সাহেব? এর মানে জানো তুমি? জন্ম-মৃত্যু হল প্রকৃতির বিধান। বিধাতাপুরুষেরও হাত নেই এর ওপর। এ নিয়ম উলটে দিলে প্রকৃতির রুদ্ররোষ আছড়ে পড়বে দুনিয়ার ওপর। হাজার হাজার লোক ফৌত হয়ে যাবে, খরা বন্যা মহামারীতে জনবসতি উজাড় হয়ে যাবে। নদীতে জলের বদলে রক্ত বইবে, ক্ষেতের ফসল, গাছপালা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাবে, পাতাল থেকে দলে দলে উঠে আসবে নরকের মূর্তিমান পাপ। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা প্রেতভোগ্যা হবে। প্রকৃতিদেবীর ক্রোধ বড়ো ভয়ানক সাহেব, কারও রেহাই মিলবে না।’

ভুরু কুঁচকে শুনছিলেন স্লিম্যান। এসব সুপারস্টিশানে ওনার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। কিন্তু দুর্গাশঙ্করকে আটকানোটা সবচেয়ে জরুরি। এই আঘাত ঠগিরা সহ্য করতে পারবে না। এরা ক্ষিপ্র, নৃশংস আর দুর্ধর্ষ বটে, কিন্তু সেই পরিমাণে কুসংস্কারগ্রস্ত। অনেকটাই ঠান্ডা করে এনেছেন এদের স্লিম্যান। একবার যদি রটে যায় যে দুর্গাশঙ্কর ধরা পড়েছে, অত বড়ো তান্ত্রিকও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি কোম্পানির হাত থেকে, ঠগিদের মনোবল বলে আর কিছু থাকবে না। এই সুযোগটাই স্লিম্যান খুঁজছিলেন অনেকদিন ধরে। চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে ওনার। এই সুযোগ ফসকে যেতে দেওয়া যাবে না, কিছুতেই না।

‘কোনো উপায় ঠাকুর? এই শয়তানটাকে আটকাবার কোনো উপায়?’

‘নেই বললেই চলে। এই পণ্ডিত এখনই অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী। সমস্ত উদ্যোগ হেলায় বানচাল করে দিতে পারে। চেষ্টা করাটাই শুধু আমাদের হাতে সাহেব। ঈশ্বর যা চান তাই হবে, চাইলে কি আমরা আটকাতে পারব?’

‘আচ্ছা? ঠিক আছে দেখা যাক কে জেতে, কোম্পানির বন্দুক না তোমাদের এইসব তান্ত্রা অ্যান্ড অল’, এই বলে চোখ মেরে মুচকি হাসেন স্লিম্যান।

হেসে ফেলেন ব্রাহ্মণটি, ‘ভালো কাজে নেমেছ সাহেব। এদেশের রাজা মহারাজারা তো আর আইনের শাসন, প্রজাদের জানপ্রাণ, ভালোমন্দ এসব নিয়ে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত নয়, খাজনা আদায় করেই কর্তব্য শেষ মনে করে। তোমরা বিদেশিরা যে নিজেদের জন্যে হলেও এইসব গুন্ডাবদমাশদের ঠান্ডা করতে নেমেছ, এই দেখে আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলাম। ভয় পেও না। মনে রাখবে মানুষকে ভালোবাসার কাছে সমস্ত অশুভ পূজামন্ত্র ব্যর্থ। ভালোবাসা হল সবচেয়ে বড়ো তন্ত্র, সবচেয়ে বড়ো জাদু।’

বেরিয়ে যাবার জন্যে পুঁথিপত্র গোটাচ্ছিলেন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণটি। স্লিম্যান কাছে গিয়ে দাঁড়ান, ‘তোমার নাম বলে গেলে না ঠাকুর?’

উঠে দাঁড়ান ব্রাহ্মণবটু, দু-চোখে কৌতুক খেলে যায়, চোখ মেরে মুচকি হাসেন ‘আমার নাম উচ্চারণ করতে গেলে তোমার দুটো জিভ লাগবে সাহেব। খুব খটোমটো নাম আমার।’

হো হো করে হেসে ওঠেন স্লিম্যান, হাসি থামলে বলেন, ‘আচ্ছা বল তো এক বার, দেখি উচ্চারণ করতে পারি কি না।’

‘আমার নাম কৃষ্ণানন্দ সাহেব, পুরো নাম কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।’

সুবন হরসুকা সত্যিই ক্ষণজন্মা তিলহাই। গতকালই খবর এনেছিল যে এক নিয়ামতে ভিটু, অর্থাৎ ধনী হিন্দু বানিয়া এদিকেই আসছে লটবহর নিয়ে। বানিয়া নিজে, দু-চারটি খিদমতগার আর একটি বছর আট দশেকের খোনতুরি, এ ছাড়া আর কেউ নেই সঙ্গে। ভালোই হল, সুবন ভাবে, দু-মাইল দূরেই ঝুরকো ডোঙ্গির ডেরা, এই এলাকার মশহুর ব্রিনজার, বাচ্চা মেয়েটাকে বিক্রি করেও ভালো টাকা পাওয়া যাবে। এক ঢিলে দুই পাখি। এও খবর আছে যে এই বানিয়া, বনোয়ারিলাল, সঙ্গে বেশ কিছু টাকাপয়সা নিয়ে নিজের শ্বশুরাল যাচ্ছে, পুরোনো কিছু উধার চুকাবার আছে বলে। এক রাতের রাস্তা ভেবে বেশি লোকজনও সঙ্গে নেয়নি বেওকুফটা। ভালোই, সুবন ভাবে। বেশি হাঙ্গামা হবে না। অল্প পরিশ্রম, বেশি লাভ।

ঠাকুর অবশ্য আজ ঝিরণী দেওয়ার সময় থাকবেন না। ওনার নাকি বিশেষ কিছু কাজ আছে। ঝিরণীর পরেই আসবেন। তাতে অসুবিধা কিছু নেই। উনি নিজের ‘প্রাপ্য’টুকু বুঝে নিয়ে যাবেন, এতে কার কি বলার আছে? প্রাপ্যটিও তো তেমন বিশেষ কিছু নয়, তবে কিনা বনোয়ারিলাল বেশ নাদুসনুদুস ইনসান বটে, ঠাকুরের বেশ কষ্টই হবে একে টেনে নিয়ে যেতে, ফিকফিক করে হাসতে হাসতে ভাবে সুবন।

‘একলা একলা এত হাসি কীসের রে সুবনা?’ পেছন থেকে মোরাদুন জিজ্ঞেস করে, ধাউড় জমাদারও সঙ্গেই ছিল, ‘আরেকটা শাদি করার খোয়াব দেখেছিস নাকি কাল রাতে?’

ফিক করে হেসে ফেলে সুবন, 'না ভাইয়া, ভাবছি যে বানিয়াটা আজ ভবানী মাঈয়ের প্রসাদ হবে, তার কথা। ঘি, দুধ খেয়ে যা বিশাল শরীর বানিয়েছে না, গর্দান তো বোঝাই যায় না, খোদাবক্স ভাইজান পেলহুটা কোথায় পড়াবে তাই ভাবছি, হি হি।'

মোরাদুন আর ধাউড়ও হেসে ফেলে। এরা দু-জনেই দক্ষ সোথা। শিকারের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ভুলিয়েভালিয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করাই এদের কাজ। এই কাজে গোটা বেহড়ে এদের থেকে নামজাদা লোক আর নেই।

তা সে নামের প্রতি সুবিচার করেই বোকা বানিয়াটির ছোটো বহরটিকে লাকরাদৌনের আশেপাশে তাঁবু ফেলাতে বেশি কসরত করতে হল না ওদের কাউকেই।

পাঁচটি পুরুষ আর একটি নিষ্পাপ বালিকাকে ঘিরে আনন্দ হাসি ঠাট্টার মৃত্যুবাসর বসালো প্রায় চল্লিশটি হিংস্র শ্বাপদ!

সকাল থেকেই ব্যস্ত ছিলেন দুর্গাশঙ্কর। জন্মের শোধের শেষ সাধনা আজ। গত হাজার বছরেও এই পূজা করার সাহস কেউ করেনি, আগামী হাজার বছরেও কেউ করবে না, স্থির নিশ্চিত উনি। গত তিরিশ বছর ধরে তিলতিল করে জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সম্বল একত্রিত করে আজকের দিনটির জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন তিনি। ন্যায় অন্যায় বোধ বিসর্জন দিয়েছেন, শাস্ত্রাজ্ঞা উপেক্ষা করেছেন অমিত তন্ত্রজ্ঞানের জোরে, দয়ামায়ার যাবতীয় বোধ পুড়িয়ে ফেলেছেন নিজেই। সমস্ত বাধাবিঘ্ন, অন্তরাত্মার নিষেধ দু-পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে গেছেন অভীষ্ট সাধনের দিকে। আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

তিরিশ বছর হারিয়ে যাওয়া একটি মুখ আবার দেখতে পাবেন বলে সর্বস্বপণ করে বিধাতাপুরুষের বিরুদ্ধে এই খেলায় নেমেছিলেন দুর্গাশঙ্কর। আজ সেই খেলার শেষ দান। দুনিয়াসুদ্ধ সব কিছু তুচ্ছজ্ঞান করে, নিজের অস্তিত্বের সব কিছু স্পর্ধাভরে বাজি রেখে জীবনের যে জুয়াখেলায় নেমেছিল দুর্গাশঙ্কর, আজ সেই বাজি জিতে নেবার দিন। অতুল তন্ত্রতেজে বলীয়ান হয়ে এই ক্রূর নির্দয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে শোধ তোলবার দিন।

আজ কোনো ভুলচুক বরদাস্ত করার প্রশ্নই ওঠে না। গত বেশ কয়েক বছর ধরে জোগাড় করা দুষ্প্রাপ্যতম পূজোপকরণগুলি একত্রিত করেছেন আজকে সকাল থেকে। সমস্ত কিছু সেই শ্মশানের পাশের কুঁড়ে ঘরটিতে গুছিয়ে রেখে, সমস্ত আয়োজন অনুপুঙ্খরূপে এক বার দেখে ইষ্টস্মরণ করলেন উনি।

সব সাজাতে সাজাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল, এইবার বেরোতে যাবেন, এমন সময়ে শ্মশানের সামনের সুঁড়িপথের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেলেন দুর্গাশঙ্কর।

এক-শো গজ দূরে বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে রাস্তা পার হচ্ছে এক বিশালদেহী সাপ, যার গায়ের খয়েরি কালো আঁশে পড়ন্ত রৌদ্রের শেষ আলো বিচ্ছুরিত হয়ে এক মায়াবী বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। এক বার থমকে দাঁড়াল সেই মহাসর্প। মাথা উঁচু করে কালো চোখ দুটি দিয়ে স্থিরভাবে দুর্গাশঙ্করকে এক বার দেখে নিয়ে দীর্ঘ চেরা লকলকে জিভটি বার দুয়েক বার করে তারপর মাথা নামিয়ে আবার ধীরেসুস্থে চলতে লাগল।

শঙ্খচূড়। বিষধর সাপেদের রাজা। রাজার মতোই চলন বটে। কী আভিজাত্য, কী দার্ঢ্য, চেয়ে দেখবার মতন। কিন্তু সে জন্যে জঙ্গলাকীর্ণ ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে চষে ফেলা দুর্গাশঙ্কর বিচলিত হলেন না। হলেন এই জন্যে যে তন্ত্রসাধনায় ব্রতী হবার আগে এটি একটি অত্যন্ত দুর্লক্ষণ। যদিও এসব ছোটখাটো বাধা নিষ্প্রভাব করা ওনার কাছে কিছুই না। তবুও মহাযজ্ঞের আগে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল।

দ্রুত চলতে লাগলেন দুর্গাশঙ্কর। কিছু তন্ত্রাভ্যাসের ফলে অস্বাভাবিক দ্রুত চলতে পারেন তিনি, একটু দূর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন কেউ উড়ে চলেছে। খবর পেয়েছেন যে এইবার থাপ বা তাঁবু কোথায় পড়েছে।

এমন সময়ে, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, স্পষ্ট শুনতে পেলেন কাছেই কোনো গাছের ডালে ঘুঘু ডাকছে।

মুহূর্তের মধ্যে গতি শ্লথ হয়ে এল। রাত্রিবেলা ঘুঘুর ডাক শাস্ত্রোক্ত দুর্লক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম। ধীরে ধীরে থেমে গেলেন। কী হচ্ছে এসব? আজই কেন? এক-শো সাতটি শবসাধনা সুসম্পন্ন করেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই ওনার তুল্য পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক এ দেশে আর নেই। বাকি আর মাত্র একটি, মাত্র একটি। জীবনের জুয়াখেলায় আজই তো শেষদানে সব কিছু একলপ্তে জিতে নেবার দিন। আর আজই এইসব দুর্লক্ষণ কেন? আজই কেন?

মনকে শক্ত করেন উনি। এইসব ছোটখাটো বিঘ্ন এড়াবার অজস্র উপায় উনি জানেন, এগুলি তন্ত্রসাধনার অতি নিম্নস্তরের শিক্ষা। কিন্তু তবুও, আজ এই শেষ বিজয়ের লগ্নে এইসব দুর্লক্ষণ ওনার মনকে অজানিতেই দুর্বল করে দিচ্ছিল। আজই কেন? এতদিন তো নির্বিঘ্নেই সব কিছু সুসম্পন্ন হয়ে এসেছে। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল দুর্গাশঙ্করের।

থামলে চলবে না। লগ্ন বয়ে যায়। শনি মকরে থাকতে থাকতে সেরে ফেলতে হবে সব কিছু, মায় শবদেহটিকে সেই প্রাচীন কুয়োটিতে বিসর্জনের কাজটি অবধি।

আর যদি, ঈশ্বর না করুন, কোনো অলৌকিক প্রকরণে আজকের এই সাধনা শেষ না করতে পারেন দুর্গাশঙ্কর? তবে?

সেই পরিণতি ভাবতেও ঘাম ছুটে গেল ওনার। শাস্ত্রানুসারে, যে শবসাধনার সংকল্প করে তান্ত্রিক ব্রতী হন, সেই শবসাধনা সম্পূর্ণ না করলে তদবদি সাধিত শবেদের অতৃপ্ত আত্মারা ভয়ংকরতম শোধ নেয় তান্ত্রিকের ওপর!!! আর সেই প্রতিশোধ আটকাবার ক্ষমতা স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবেরও নেই!!!

এই সব ভাবতে ভাবতে হাঁটার সময় খেয়াল করেননি দুর্গাশঙ্কর। একটু দূরে জঙ্গলে মধ্যে আলো দেখে হুঁশে এলেন। একদম কাছাকাছি এসে পড়েছেন। ছোট্ট তাবুটির মধ্যে আলো, হাসি গান ঠাট্টার দমক ভেসে আসছে। তাঁবুর বাইরেও কয়েক জন অন্ধকারে মিশে আছে। পিশাচসিদ্ধ দুর্গাশঙ্কর অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পান, তাই দেখলেন যে এরা ওনার নিজের দলেরই সদস্য। ঝিরণীর অপেক্ষা করছে। দু-একজন বনোয়ারিলালের ঘোড়াটার পরিচর্যা করছে। দাঁড়িয়ে গেলেন উনি। ঝিরণীর একটু পরেই ঢুকবেন না হয়। এখন অচেনা মানুষ হুট করে ঢুকে পড়ে গোল বাঁধাবার কোনো মানেই হয় না।

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন দুর্গাশঙ্কর, নিবাত নিষ্কম্প কৃষ্ণবর্ণ দীপশিখাটির মতন। স্থির, অচঞ্চল, একাগ্র, দৃঢ়সংকল্প। এই দীপশিখায় আলো নেই। শুধু স্বার্থসাধনের ক্রূর ঘনকৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষাটি আছে!

হঠাৎ কেমন যেন মনে হল ওনার, তাঁবুর ওইপারেও কতগুলি ছায়া যেন এক বার নড়েই স্থির হয়ে গেল না?

ঠিক দেখলেন? নাকি দৃষ্টিবিভ্রম?

মনটা বড়ো দুর্বল আর অশান্ত হয়ে আছে সন্ধে থেকেই। বার বার চিত্তবিক্ষেপ হচ্ছে, না হলে দৃষ্টিসীমার মধ্যে কে কোথায় কী করছে সে কথা দুর্গাশঙ্কর মুহূর্তে বলে দিতে পারেন। মনঃসংযোগ না করলে চিত্তপটে কিছুই উদ্ভাসিত হয় না। আর আজ... কিছুক্ষণ ভ্রুকুঞ্চন করে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন উনি। সব স্থির। নাঃ, বোধ হয় রেকলান বা শিয়াল টিয়াল হবে।

ক্ষণমুহূর্তের মধ্যে তাঁবু থেকে কে উঁচু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ‘সাহেব খান, তামাকু লাও।’

তাঁবুর ভিতরে আলোছায়ার মধ্যে কতগুলি প্রাণীর ছটফট দেখতে পাচ্ছিলেন দুর্গাশঙ্কর। প্রত্যেকের পেছন থেকে এক জন করে ঠগি গলায় পরিয়ে দিয়েছে কালান্তক পেলহু। প্রতিটি শিকারের পা দুটো ধরে আছে একেকজন চুমিয়া, যাতে ছটফট না করতে পারে শিকার, শিকারের হাত দুটি ধরে আছে একেকজন চুমোসিয়া, যাতে হতভাগ্য মানুষটি বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ না গড়ে তুলতে পারে!! এর সঙ্গে প্রধান ঘাতক যে পেলহুধারী ঠগি, ওদের ভাষায় ভুরকুত, সে হাঁটু দিয়ে ক্রমাগত শিরদাঁড়ায় চাপ দিতে থাকে, যাতে মেরুদণ্ড ভেঙে মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়!

এসব মৃত্যুনাটিকা অনেক দেখেছেন দুর্গাশঙ্কর। এসব ওনাকে বিচলিত করে না আর অনেক আগে থেকেই। শব পাওয়া নিয়ে কথা। সাধনা শেষ করা নিয়ে কথা। সেই চাঁদমুখটি আবার বুকের মধ্যে পিষতে পারার আনন্দ নিয়ে কথা।

আজ পৃথিবী জানবে এক বাবা তার মৃত মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্যে কী কী করতে পারে!

শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ মাথার ওপর প্রায়। অপার্থিব জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে বিশ্বচরাচর। সামনে ছায়ার মতন এক ছোটো তাঁবুতে অভিনীত হচ্ছে এক অসহায় মৃত্যুনাটিকার ইতিকথা। নির্বাক নিরাসক্ত দর্শক হয়ে দেখছেন দুর্গাশঙ্কর। দেখছে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আরও বেশ কয়েক জন মৃত্যুব্যবসায়ী ঠগিও। হাওয়াও বইছে না একটুও, প্রতিটি গাছের পাতা স্থির। তাঁবু থেকে ভেসে আসা হাঁচোরপাঁচোরের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দও নেই।

এমন সময়ে দিগবিদিক সচকিত করে ভেসে এল এক অপার্থিব আর্তনাদ, 'বাপু, কোথায় তুমি? আমার খুব কষ্ট হচ্ছে!'

এক মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কে আর দিশেহারাভাবে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন দুর্গাশঙ্কর!!!

সেই গলা, সেই ডাক, সেই আকুতি, যেন ত্রিশ বছর আগেকার এক শাপগ্রস্ত গ্রামের আগুনে পুড়ে যাওয়া সন্ধে থেকে উঠে এসে দুর্গাশঙ্করের বুকে দীর্ঘ ভল্লার মতোই বিঁধে দিলো!!!

'মুন্নিইইইই' বলে শাপগ্রস্ত পিশাচের মতন তাঁবুর দিকে উন্মাদের মতন ছুটে চললেন দুর্গাশঙ্কর।

ত্রিশ বছর আগে হেরে গেছিলেন। আজ নয়, আজ নয়, আজ কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়। এর জন্যেই, এর জন্যেই এত সব কিছু...

উন্মাদের মতো ছুটে চললেন দুর্গাশঙ্কর।

জঙ্গলের মধ্যে পঞ্চাশ জনের ব্রিটিশ আর্মি, দশ জন দেশি সিপাই, ফিরিঙ্গিয়া আর খোদাবক্সকে নিয়ে থাপ বা তাঁবুর কাছেই স্থির দাঁড়িয়ে ছিলেন স্লিম্যান। শঙ্কা আর কর্তব্যের দোলাচলে দুলছিলেন স্লিম্যান। আজ যদি দুর্গাশঙ্কর ধরা পড়ে, ঠগিদের নির্মূল করাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর যদি না ধরা পড়ে? সত্যিই যদি অকাল্ট পাওয়ার বলে কিছু থাকে? সৈনিক তিনি, নিজের জন্যে ভাবেন না। কিন্তু এমিলি?

একটু দূরেই টেন্টটা দেখা যাচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে যে হুল্লোড় চলছে খুবই। শরীরটা টানটান হয়ে উঠল স্লিম্যানের। শুনেছেন যে এটাই সেই সময়। যেকোনো মুহূর্তে ঝিরণী উঠতে পারে। শিকারি বাঘের মতন তীক্ষ্ণ স্নায়ু আর পেশি নিয়ে সতর্ক হলেন উনি। সুশিক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যদল নিঃস্পন্দ রইল। দেশি সিপাই, খোদাবক্স আর ফিরিঙ্গিয়াও এই স্তব্ধ জ্যোৎস্নার মাঝে অজানা আশঙ্কায় শ্বাস অবধি বন্ধ করে রইল। যেন এক আসন্ন মূর্তিমান অমঙ্গলের ছায়া চারিদিকে!

এমন সময়ে সেই স্তব্ধতা খানখান করে অমোঘ মৃত্যু পরোয়ানা নেমে এল শিকারি বাজের মতোই, 'সাহেব খান, তামাকু লাও।' দৌড়েই যাচ্ছিলেন স্লিম্যান, পেছন থেকে খোদাবক্স হাত টেনে ধরে। এখন নয়, মনে পড়ে যায় স্লিম্যানের, আজকে দুর্গাশঙ্কর ঝিরণী দেওয়ার পর ঢুকবেন। অতএব আরও খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায় নেই। দাঁতে দাঁত চিপে চাঁদনি রাতের শিল্যুয়েটে তাঁবুর মধ্যেকার অসহায় মানুষগুলির ছটফটানি দেখছিলেন স্লিম্যান। দুরন্ত অসহায় ক্রোধে শপথ নেন স্লিম্যান, হয় দুর্গাশঙ্কর সহ পুরো দলকে ধরে কঠিনতম শাস্তি দেবেন, অথবা নিজেকেই নিজে গুলি করে মারবেন, দেখা যাক কে জেতে আজ, অকাল্ট না হিউম্যানিটি অ্যান্ড জাস্টিস!

এমন সময় যেন করুণ নিয়তির মতোই দিগ্বিদিক শিউড়ে দিয়ে ভেসে এল সেই আর্তনাদ, 'বাপু, কোথায় তুমি? আমার খুব কষ্ট হচ্ছে!'

লাফিয়ে ওঠেন স্লিম্যান, একটা বাচ্চার গলা না? চাবুকের মতন আছড়ে দেন নির্দেশটা 'কাম অ্যালং', তারপর ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়তে থাকেন তাঁবুর দিকে।

তাঁবুর মধ্যে ঢুকেই দুর্গাশঙ্করের চোখ পড়ল মাটিতে রাখা লাশেদের স্তূপ এবং সেই লাশেদের মাঝে শোয়ানো একটি আট-দশ বছরের মেয়ের মৃত শরীরের ওপর। সেই নিষ্পাপ শিশু যেন ভয়ে, আতঙ্কে কাঠ হয়ে যাওয়া দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওপরের দিকে, অব্যক্ত আকুতিতে যেন কাকে খুঁজছে, শেষ আশ্রয় হিসেবে। গলায় তখনও খয়েরি কালো রঙের খুনি রুমালটি জড়িয়ে, যেন শেষ বিকেলে দেখা সেই শঙ্খচূড়টির মতন!

স্থির হয়ে বিস্ফারিত চোখে সেই শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন দুর্গাশঙ্কর, সারা শরীর কাঁপছে শুকনো বাঁশপাতার মতন, হাতে পায়ে বশ নেই, ঠোঁটের পাশ গড়িয়ে নামছে সাদা ফেনার মতন কষ, থরথর কাঁপছে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক দুর্গাশঙ্করের সমস্ত দেহ, সমস্ত আত্মা, সমস্ত সত্তা! বাকি ঠগিরা স্তব্ধ হয়ে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখছিল তাদের নিষ্ঠুর নির্দয় ভয়ংকর, কিন্তু এই মুহূর্তে বেপথু বে-এক্তিয়ার অচেনা ঠাকুরকে। একটি শিশুর লাশ দেখে ঠাকুর অত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন কেন সেটা ওরা কেউই বুঝতে পারছিল না। ছুটনিয়া হাতজোড় করে নিবেদন করে ‘গুসসা না করে ঠাকুর, একে তো জিন্দা রাখতেই চেয়েছিলাম, ঝুরকো মাহাতোকে বেচলে ভালো দাম পাওয়া যেত। তাই তাঁবুর বাইরেই বাবুনিয়া খেলা করছিল একে নিয়ে, কী যে হল, ঠিক ঝিরণী দেবার সময়েই দৌড়ে এসে ঢুকল, তখন কি আর বাঁচিয়ে রাখা যায় ঠাকুর? আপনিই বলুন।’

এসব কথার বিন্দুবিসর্গ দুর্গাশঙ্করের কানে ঢুকছিল না, থরথর দেহে, বিস্ফারিত চোখে তিনি চেয়েছিলেন সেই শিশুটির আতঙ্কিত চোখ দুটির দিকে, কুঁকড়ে যাওয়া আঙুলগুলির দিকে, যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটির দিকে... তিরিশ বছর, তিরিশটা বছর অপেক্ষা করেছেন দুর্গাশঙ্কর। যে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটিকে ফের ফিরে পাওয়ার জন্যে জীবনের সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়েছেন, নরকের দরজায় নিজের আত্মাকে বলি দিয়েছেন নিজের হাতে, আজ সেই মেয়ে ফের একটি লাশ হয়ে শুয়ে আছে দুর্গাশঙ্করের সামনে। হুবহু সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কোঁকড়ানো চুল, সেই গোলমটোল শরীর। যাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে দুর্গাশঙ্কর স্বর্গসুখ পেতেন, যার অভিমানে ফোলানো ঠোঁট দেখলে দুর্গাশঙ্করের বুকে শেল বিদ্ধ হত, একটা পুঁতির হারছড়া হাতে পেলে যার মুখের হাসি দেখে দুর্গাশঙ্কর নিজেকে ধন্য মনে করতেন, যে মেয়ে তিরিশ বছর আগেকার এক সর্বনাশা আগুনে সন্ধ্যায় দুর্গাশঙ্করের সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছিল, ঠিক সেই মেয়েই যেন কোনো এক অলঙ্ঘনীয় অলৌকিক শক্তির ইশারায় তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ ঠগি দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিতের তিরিশ বছরের সাধনাকে এক লহমায় মাটিতে মিশিয়ে দেবে বলে মাটিতে শুয়ে আছে!

‘মুন্নিইইইইইই, বেটি আমার, কোথায় গেলি তুই’, বলে একটা আর্তনাদ করে সেই শিশুটির লাশের ওপর আছড়ে পড়লেন দুর্গাশঙ্কর!

হতভম্ব ঠগিদের দল বুঝতেও পারল না যে তাদের ঘিরে ফেলেছে গোরা সিপাহিদের লালমুখো ফৌজ। বুঝলেও অবশ্য কিছু করার ছিল না আর!

গভীর রাতে যখন কোমরে দড়ি পরা দুর্গাশঙ্করকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন স্লিম্যান, তখনও দুর্গাশঙ্কর প্রলাপ বকে চলেছেন। রক্তজবার মতন লাল চোখ, শনের মতন উশকোখুশকো চুল উড়ছে হাওয়ায়। ইতিউতি চাইছেন, পাশে খোদাবক্সকে দেখেও চিনতে পারলেন না, মুখে শুধু ‘মুন্নি, মুন্নি মা আমার’ গোঙানি। থেকে থেকেই হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছেন, ফিরিঙ্গিয়া আর খোদাবক্স ধরে তুলে দিচ্ছে সেই অবশ থরথর দেহ, ফের টানতে শুরু করছেন স্লিম্যান। ব্রিটিশ আর দেশি সিপাইরা বাকি ঠগিদের মহড়া নিচ্ছে এখন। অবশ্য হতবাক সেই খুনিগুলোকে কবজা করতে শিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর বেশি দেরি হবার কথাও নয়। এখন স্লিম্যানের দরকার খোদাবক্সের দেখে যাওয়া কুয়োটা, যাতে এভিডেন্স সহ ওয়াটারটাইট কেস খাড়া করতে পারেন এই ডেমোনিক পণ্ডিতটির ওপর!

একে যায়গাটা বেশি দূর নয়, তার ওপর শুক্লপক্ষ চতুর্দশী, খুব দ্রুতই সেই প্রাচীন কুয়োটির কাছে পৌঁছে গেল এই ছোটো দঙ্গলটি। তার ক্ষণিক পরেই খুব দ্রুত সেই কুয়োর ওপরের ডালপালা সরিয়ে সেই প্রাচীন গহ্বরটির মুখ উন্মোচন করে খোদাবক্স আর ফিরিঙ্গিয়া। ফের সেই বিষন্ন কটু মড়াপচা গন্ধ ধাক্কা মারে সবার নাকে, নাকে হাত চাপা দেয় তিন জন, দুর্গাশঙ্কর ক্রমাগত বকতে থাকেন। কী মনে হতে বাঁ-হাতে নাক চাপা দিয়ে ডান হাত দিয়ে দুর্গাশঙ্করের হাত চেপে ধরেন স্লিম্যান, সঙ্গেসঙ্গে শিউড়ে উঠে হাত ছেড়ে দেন... উত্তপ্ত জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে দুর্গাশঙ্করের গা, দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে যেন, ছোঁয়া অবধি যায় না!

ততক্ষণে একটা মশাল জ্বালিয়ে ফেলেছে ফিরিঙ্গিয়া, সেইটা হাতে নিয়ে কুয়োর ওপরে তুলে ধরেন স্লিম্যান, পেছন থেকে উঁকি দেয় খোদাবক্স আর ফিরিঙ্গিয়া, এবং তিন জনেই শিউড়ে ওঠেন!! নীচে গাদাগাদি করে পরে আছে একগাদা লাশ। বেশিরভাগই কঙ্কাল, সাদা হাড়গুলো হা হা করে হাসছে যেন। কিছু লাশ আধপচা, মাংস গলে খসে পড়ছে, চোখের গর্ত থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে মাংসখেকো পোকার দল। একটি দুটি লাশ দেখলে বোঝা যায় যে তখনও পচন ধরেনি, সদ্য এখানে ফেলা হয়েছে। একরাশ ঘৃণা আর বিস্ময় মিশিয়ে সেই অপ্রকৃতিস্থ ব্রাহ্মণের দিকে ফিরলেন স্লিম্যান, ‘এইসব তোমার কাজ পণ্ডিত? এদের নিয়ে তুমি ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছ?’

জবাফুলের মতন লাল টকটকে চোখ মেলে চাইলেন দুর্গাশঙ্কর, সম্পূর্ণ ফাঁকা ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে আশেপাশে কী যেন দেখলেন, তারপর ফিসফিস করে বললেন ‘ওরা আমাকে ডাকছে।’

কথাটা ভালো করে শুনতে পাননি স্লিম্যান, তাই ফের জিজ্ঞেস করেন ‘কে ডাকছে পণ্ডিত?’

‘ওরা আমাকে ডাকছে, তোমরা কেউ শুনতে পাচ্ছ না? ওরা সবাই মিলে আমাকে ডাকছে যে। পাতাল থেকে ওরা উঠে আসতে চাইছে, শুনতে পাচ্ছ নে তোমরা? ডাকছে আমাকে, আমাকে যেতে হবে, ডাকছে ওরা, আমাকে যেতে হবে, যেতে হবে’, বলতে বলতে দৌড়ে গিয়ে সেই কুঁয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত!



দ্রুত হতভম্ব ভাব কাটিয়ে মশাল নিয়ে সেই কুয়োর মধ্যে উঁকি দিলেন তিন জনে, চেঁচিয়ে উঠলেন স্লিম্যান 'মাই গুডনেস, এই পাগল লোকটাকে তুলতে হবে এক্ষুনি। খোদাবক্স, ফিরিঙ্গিয়া জলদি চলো, লম্বা দড়ি লাগবে আর আরও কিছু লোক, কাম ক্যুইক।'

মশাল হাতে জঙ্গলের বাইরের দিকে দৌড়তে লাগলেন তিন জন।

লোকলশকর নিয়ে যখন ফিরে এলেন স্লিম্যান, তখন রাত্রির তৃতীয় প্রহর। মরা চাঁদের মৃত্যুশীতল জোৎস্নার বিষন্ন হিম ছড়িয়ে আছে বিশ্বচরাচরে। সেই চোরা আলো-আঁধারিতে, আধোচেনা সুঁড়িপথ বেয়ে মশালের আলো আর ধোঁয়ায় সদলবলে এসে পৌঁছলেন স্লিম্যান, তখনও অপার্থিব আশঙ্কায় মূক চারিদিক। একটি পাতাও নড়ছে না, জঙ্গল যেন ভুলে গেছে নিশ্বাস নিতেও, আর কোনো শব্দ নেই, কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই, শুধু সেই ম্লান রক্তজোৎস্নায় ধুয়ে আছে এই বনভূমি। কুয়োটির এককোণে জড়ো হয় ক্ষুদ্র দলটি। মশাল নিয়ে এক জন দেশি সিপাই প্রথমে সেই কুয়োর মুখে যায়, ধীরে ধীরে উঁচু করে তুলে ধরে সেই আলো, এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ আর্তনাদ করে মূর্ছা যায় সে, ভূলুণ্ঠিত মশাল নিভে যায় দ্রুত। সঙ্গেসঙ্গে অজানা আশঙ্কায় দলটি পিছু হটে যায়। স্লিম্যান বিরক্ত গলাখাঁকাড়ি দেন, 'ওহে খোদাবক্স, ফিরিঙ্গিয়া, এদিকে এসো তো একবার, দেখা যাক কী হাতি ঘোড়া লুকিয়ে আছে কুয়োর নীচে যে বেওকুফ লোকজন দেখেই ফেইন্ট হয়ে যাচ্ছে, কাম হিয়ার', এই বলে মশাল ফের জ্বালিয়ে হাতে নিয়ে স্লিম্যান আর বাকি দুই শাগরেদ সেই কুয়োর মধ্যে উঁকি দেন। এবং তিন জনেই সেই হাড়-হিমকরা বিভীষিকার সামনে স্তব্ধ আতঙ্কে স্থবির হয়ে যান!

তাদের সামনে, কুয়োর মধ্যে দুর্গাশঙ্করের শতচ্ছিন্ন মৃতদেহ, ঘাড়টা সম্পূর্ণ উলটো করে মুচড়ে ওপরের দিকে মুখ ফেরানো, মুখে ভয়াবহ এক অপার্থিব হিংস্র হাসি, হাত দুটো দেহবিচ্ছিন্ন হয়ে দুই কোণায় পড়ে, পা দুটো কুঁচকি থেকে মুচড়ে আধছেঁড়া, যেন কোনো এক প্রাগৈতিহাসিক যন্ত্র শরীর থেকে পা দুটো ছিঁড়ে নিতে গিয়ে এই মশালের আলো দেখে থমকে আছে, অন্ধকার হলেই শুরু করবে এই অসমাপ্ত কাজ। চোখ দুটো কে যেন খুবলে নিয়েছে, কালো গহ্বর দুটি ঠা ঠা করে হাসছে, এবং কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে খুবলে খুবলে খাওয়া হয়েছে দুর্গাশঙ্করের সারা শরীর, রক্তে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত দেহ, এবং কে বা কারা খেয়েছে তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ দুর্গাশঙ্করকে, সেটা ভাবতে বেশি কষ্ট করতে হয় না, কারণটা খুবই স্পষ্ট,

প্রতিটি খুলি আর আধাপচা শবের মুখে দাঁতে লেগে আছে তাজা রক্তের দাগ!!!

রক্তফলক

প্রবল উত্তুরে হাওয়ার রাত ছিল সেটি, আর সে বছর মধ্য মাঘ মাসে নেমেছিল বৃষ্টি। প্রত্যাশিতভাবেই সমগ্র মহাবিহার ঘুমে আচ্ছন্ন, শুধু এক জনই জেগে আছেন এই দুর্যোগের রাতে। প্রধান চৈত্যটির পাশ দিয়ে লম্বা বারান্দা, আর তারপরেই শ্রমণদের থাকার সারিসারি ঘর। ভন্তে ভিক্ষুপা তাঁর অঙ্গবস্ত্রটি দিয়ে প্রদীপটি আড়াল করে সাবধানে বাঁচিয়ে শেষ ঘরটির মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তারপর এদিক-ওদিক দেখে উত্তর-পূর্বের কোণের একটি পাথরের ওপর মৃদু চাপ দিতেই সেটি ভেতরে ঢুকে গেল। আর সঙ্গেসঙ্গে কালো দেওয়ালের একটি অংশ খুলে উন্মুক্ত হল একটি গুপ্তপথের মুখ। সন্তর্পণে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার ভেতরে ঢুকে দেয়ালের অংশটি ঠেলে গোপন রাস্তাটি বন্ধ করে দিলেন ভিক্ষুপা।

খানিকক্ষণ বাদে ঠিক সেই ঘরের বাইরে যেন ভোজবাজির মতোই আবির্ভূত হলেন তিন জন, তাদের মধ্যে এক জন দ্রুত এসে পাথর চেপে সরিয়ে সেই গুপ্তসুড়ঙ্গের পথ উন্মুক্ত করলেন, তারপর চাপা গলায় বললেন, 'আসুন স্থবিরশ্রেষ্ঠ, আসুন পণ্ডিতাচার্য, দ্রুত গেলে হয়তো কন্যা তিনটিকে বাঁচালেও বাঁচাতে পারি।'

দ্রুত সেই গুপ্তপথে প্রবেশ করলেন পালসম্রাট কুমারপালের প্রধান অমাত্য সোমেশ্বর গর্গ, মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র এবং অঙ্গ থেকে হরিকেল তথা সমগ্র পৌণ্ড্রবর্ধনের অহংকার, সোমপুর মহাবিহারের মুখ্যস্থবির, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আধ্যাত্মিক গুরুদেব শ্রীরত্নাকরশান্তি।

* * *

রক্ত দেখতে খুব ভালোবাসে টেনিয়া, ছোটোবেলা থেকেই। ওর যখন পাঁচ বছর বয়েস, তখন থেকেই আরশোলা আর ইঁদুর ধরে ব্লেড দিয়ে কেটে দেখা ওর প্রিয় শখ ছিল। নেতাজিনগরের উদ্বাস্তু কলোনির ছেলেটির এহেন শখ দেখে আত্মীয়স্বজনরা হেসে কুটিপাটি হতেন, 'অ মায়া, দেইখ্যা যাও, তুমার পোলা ডাক্তার অইব মনে লয়।' হাসিটা অবশ্য মিলিয়ে গেছিল যেদিন সাত বছর বয়েসি টেনিয়া মায়ের কাপড় কাটার কাঁচি দিয়ে একটা দু-সপ্তাহ বয়েসি বিড়াল বাচ্চার মুণ্ডু কেটে ফেলে। মা বিড়ালের করুন মিউ মিউ কান্না শুনে সেদিন মায়ারানি হালদার মুখে ভাত তুলতে পারেননি। এরপর টেনিয়াকে শোধরাবার অনেক চেষ্টা করা হয়, ফল হয় উলটো। নিজের ছেলের মধ্যে শীতল নিষ্ঠুরতা আর শিয়ালের ধূর্ততা নজর এড়ায়নি তাঁর। ডাক্তার বদ্যি মানত জলপড়া, চেষ্টা সবই হয়, বলাবাহুল্য লাভ কিছুই হয়নি।

মায়ারানি জানতেন যে হবে না।

তাঁর শ্বশুরবংশে কারো কারো এরকম উন্মাদ ও হিংস্র হয়ে ওঠার ইতিহাস আছে। তাঁর শাশুড়ির ভাসুরের বড়ো ছেলের নাকি এরকম অভ্যেস ছিল। নিজের হাতে মুরগির মাথা ছিঁড়ে ফেলা, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কুকুরছানার চোখ তুলে ফেলা, খাঁচার মধ্যে কয়েকটা হিংস্র ক্ষুধার্ত সড়ালে কুত্তার মধ্যে বাচ্চা সমেত মা বিড়াল ছেড়ে দেওয়া, এসবের মধ্যে লোকটা পৈশাচিক উল্লাস খুঁজে পেত। আর উত্তর চর মজলিশপুরের জমিদার রতিকান্ত হালদারের বড়ো ছেলের সেইসব কাজে বাধা দেবে, এমন সাহস গোটা চট্টগ্রামে কারও ছিল না। শুধু তাই নয়, মায়ারানি জানেন, শুধু হিংস্রতাই নয়। সঙ্গে করে এরা নিয়ে আসে অতলস্পর্শী কামুকতা। লঘুগুরু জ্ঞান থাকে না, সময় অসময় বিচার থাকে না, পাত্র অপাত্র ভেদ থাকে না, এমনই রাক্ষুসে সর্বগ্রাসী সেই কামস্পৃহা! রতিকান্ত হালদারের বড়ো ছেলের হাতে তিনি নিজে কতবার নিগৃহীতা হয়েছেন, বলতে বলতে কেঁদে ফেলতেন মায়ারানির শাশুড়ি। শেষে নিজের বাবারই এক মুসলমান রক্ষিতাকে

নিয়ে সে পালায়, তখন তার বয়েস ষোলো! যাবার আগে অবশ্য সে বাবার সঞ্চয়ের বেশ খানিকটা অংশ নিয়ে যেতে, আর বাবার বুকে একটা আধহাতি তলোয়ার গেঁথে দিয়ে যেতে ভোলেনি!

মায়ারানির তাই ভয় হয়। একে কলোনি এলাকা, উঠতি বয়সের মেয়ে বউদের ভিড়। আর তা ছাড়া বাঙালদের মধ্যে অন্তরালের আব্রু ব্যাপারটা কম। কবে কী কেলেঙ্কারি হয়ে যায়, ভেবে মায়ারানি কাঁটা হয়ে থাকেন।

* * *

অতসী গেছিল সাহাদের বাড়ির পেছনে কী একটা কাজে, ওর ঠিক মনেও নেই। আসার সময় হঠাৎ করেই চোরকাঁটার একটা ঝোপ ওর শাড়ি টেনে ধরে, আর সেটা ছাড়াতে গিয়েই ওর নজরে পড়ে লাল বলটা।

অতসীর ছেলের বয়েস তিন। লাল বল দেখলে চকাই খুশিই হবে, ভেবে বলটা তুলতে গিয়েই ফলকটা নজরে পড়ে ওর। নেহাত কৌতূহল বশেই ফলকটা তুলে নেয় ও, আর তখনই টের পায় যে ফলকটা বেশ ভারী। ওর ছেলের লেখার স্লেট যেরকম, প্রায় সেরকম সাইজেরই, চারিপাশে ভাঙা, কিন্তু তেলতেলে মসৃণ। মানে রীতিমতো ব্যবহার হত আর কী! সলিড পাথরের তৈরি বোঝাই যাচ্ছে, নইলে এত ভারী হয় না। কিন্তু অতসীকে যেটা আশ্চর্য করল, সেটা হচ্ছে ফলকের ওপরে খোদাই করা ছবিটা। পাথরে কুঁদে বানানো চারটে শরীর। একদম নীচে, বাঁ-দিকে এক জন মানুষ বসে আছে পদ্মাসনে, আর দুই হাত তুলে কার প্রশংসা করছে। প্রশংসা করছে অবশ্য দুই নর্তকীর, যারা ফলকের মাঝামাঝি, এবং স্পষ্টতই তারা নাচছে। যেটা বুঝতে পারল না অতসী, যে দু-জনেরই মাথা বাঁ-দিকে নাচের ভঙ্গিতে হেলানো, আর দু-জনারই ডান হাত তাদের ঘাড়ের কাছে। হাতে কি কিছু ধরা আছে? বুঝতে পারল না অতসী। যাগগে যাক। ফলকের ওপরে আবার এক জন মহিলা, আশীর্বাদ দেওয়ার ভঙ্গিতে।

ফলকটা ফেলেই দিত অতসী, কিন্তু খেয়াল করে দেখল যে সিঁদুর আর তেলের দাগ রয়েছে নীচের দিকে। মানে পুজোআচ্চা হত বা হয়। ফেলে দেবে অতসী? এমনিতেই দিন ভালো যাচ্ছে না ওর। ওর বরের সঙ্গে রোজ তার মালিকের খিটিমিটি লাগছে। অনেকদিন থেকেই ভোম্বল বলছে ওই মালিকের কাছে ও চাকরি করবে না, এবার একটা টোটো কিনবে।

মা, মা গো, দয়া করো মা, একটু দেখো।

ফলকটা প্রণাম করে নিয়েই নিল অতসী।

* * *

সুড়ঙ্গের মধ্যে আদিম অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে বেশ খানিকক্ষণ গিয়েই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তিন জন। কারও কাছেই আলোর উৎস কিছু নেই। হঠাৎ করে রত্নাকরশান্তির হাতে জ্বলে উঠল একটি প্রদীপ। শান্ত, কিন্তু ভারি উজ্জ্বল। চকিতে আলোময় হয়ে উঠল অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। প্রথমটা হকচকিয়ে গেছিলেন সোমেশ্বর আর বোধিভদ্র। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, 'এই উজ্জ্বলতম আলোকরশ্মি কোথায় পেলেন গুরুদেব? আমরা তো শুধু...' হাত ঠোঁটে তুলে শশশস করলেন রত্নাকরশান্তি। এক বার শুধু চাপা গলায় বললেন যে 'দ্রুত যেতে হবে ভদ্র, অসহায় তিনটি বালিকার কান্না আমি স্বকর্ণে শুনেছি। আর এই আলো? এর উৎস কিছু চৈনিক অগ্নিমশালা, আমার প্রিয় শিষ্য অতীশ তিব্বতেই এর সন্ধান পেয়ে কিছুমাত্র মশালাচূর্ণ আমাকে পাঠায়। তারই কিছু সাবধানে, বিশেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করলাম। চলুন সামনে এগোনো যাক। অতীশ বলে পাঠিয়েছে যে খুব সাবধানে এর নাড়াচাড়া করতে। এ দিয়ে নাকি প্রাচীন কালের ব্রহ্মাস্ত্র বা পাশুপতাস্ত্রের মতন মহাধ্বংসলীলা চালানো সম্ভব। অতীশের ধারণা মহাভারতীয় অস্ত্র, সবই নাকি স্বাভাবিক

সাংখ্য যুক্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়। তাই হোক, হে ভদ্র, আসুন, আপাতত সোমপুর মহাবিহারের অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত গুপ্ততম প্রকোষ্ঠে সযতনে প্রবেশ করি, এইবার আপনাদের চোখের সামনে উন্মুক্ত হোক...'

চোখের সামনের দৃশ্যটির জন্যে অবশ্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না।

* * *

স্নান করছিলেন মায়ারানি। তাঁর বয়েস সাতচল্লিশ। বিধবা মায়ারানির যৌবন এখনও যায় যায় করেও যায়নি, তার ওপর তিনি সুন্দরী। রাস্তায় বেরোলে এখনও লুব্ধ পুরুষের নজর তাঁর সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে যায়। শিরশির করে ওঠে মায়ারানির গা। কুপ্রস্তাব কি কম পেয়েছেন নাকি এই এক জীবনে?

স্নান করে পুজোয় বসলেন মায়ারানি। আরাধ্যদেবতার পুজো করে ঠাকুরের আসনের নীচ থেকে একটা চওড়া, বাচ্চা ছেলেদের স্লেটের আকারের একটি অ্যালুমিনিয়ামের বাক্স বার করলেন।

মায়ারানির শ্বশুর-শাশুড়ি সাতচল্লিশে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসার সময় প্রায় কিছুই আনতে পারেননি, এই বাক্সটা ছাড়া। এ নাকি তাঁদের পরিবারের অনেক প্রাচীন বিগ্রহ। এ জিনিস হালদার পরিবারের বাইরে কারও দেখার অধিকার নেই। এবং পরিবারের বউ বা মেয়ে ছাড়া কোনো পুরুষের পূজা করবার অধিকার নেই।

শাশুড়ি যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনিই এর পূজা করতেন, প্রতি অমাবস্যা তিথিতে। মারা যাওয়ার কয়েক দিন আগে আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে এইটাও সঁপে দিয়ে যান মায়ারানির হাতে, আর বলে যান কয়েকটি গুহ্য কথা,

'একখান কথা কই মায়া, কারোরে কইবা না। আমাগো পরিবারের উফর একখান অভিশাপ আসে। আমাগো কোন এক পূর্বপুরুষ কী একখান নাকি খুব নীচ পাপকাজ কইরা রাজার আদেশে দ্যাশান্তরী হন। হেই থিক্যা আমাগো ফেমেলিতে থাইক্যা থাইক্যা একখান কইরা অপদ্যাবতা জন্ম নেয় আর তার মায়ে বাপেরে অ্যাক্কেরে শ্যাষ কইরা ফালায়, এই হইলো গিয়া আমাগো শাস্তি। এইখান সাবধানে রাখবা, তাহইলে আমাগো বংশধারা থাইক্যা যাইবো অ'নে, শাস্তি ভোগ কইরাও। সাবধানে রাখবা, কারোরে দ্যাহাইবা না। মাইয়ালোগ ছাড়া এয়ার পুজা করায় নিষেধ আসে। অমাবস্যাতিথিতে পুজা দিবা।'

'পূজার বিধি কী মা?' জানতে চেয়েছিলেন মায়ারানি।

পূজাবিধি বলে দেওয়ার পর খানিকক্ষণ চুপ করেছিলেন সেই বৃদ্ধা, তারপর ফিসফিস করে বলেন, ' দি কোনোদিন এইডা নিজে নিজে হারাইয়া যায়, খোঁজবা না। জানবা হালদার বংশের শ্যাষ সময় উপস্থিত, হেইদিনই আমাগো বংশলোপ অইবো, হালদার ফেমেলির কেউই আর বাঁইচ্যা থাকবা না। এক মহাপুরুষ আইস্যা এঁয়ারে উদ্ধার কইরা লয়্যা যাবেন। হেইডাই হইলো গিয়া আমাগো ফেমিলির মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত।'

সামান্য কেঁপেই উঠেছিলেন মায়ারানি, কার কেন কীসের অভিশাপ তা কেউই লিখে রাখেননি, কেউই জানেন না, তাঁর শাশুড়িও নয়। শুধু কে জানে কবে থেকে এই অভিশপ্ত পরিবার বসে আছে পুরুষে পুরুষে অপরাধ ভোগ করার জন্যে আর বংশধারা লোপ করে শাপমুক্তির জন্যে! কত নৃশংস সেই পাপ যে হাজার বছর তার জের টেনে যেতে হয়?

'ইনি কে মা? কোন দেবতা?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মায়ারানি। শাশুড়ি বলেছিলেন দেবতা নয়, দেবী। তবে 'ইনি কে কইতে পারুম না। অনেক পুরুত মশাইরে জিগাইসি বন্ননা কইরা, কেউই কইতে পায় নাই। রক্ষা কইরো এনারে। খুবই জাগ্রত দেবী, অবহেলা কইরো না।'

এর কয়েক দিন পরেই শাশুড়ি চোখ বোজেন। তখন মায়ারানির বয়েস সাঁইত্রিশ।

আর তার একমাসের মধ্যেই ঘটে যায় সেই দুর্ঘটনা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মায়ারানি। দশ বছর হয়ে গেল, এখন তার বয়েস হওয়ার কথা ছাব্বিশ। কে জানে কোথায় আছে, কেমন আছে।

চওড়া বাক্সটা বার করে ডালাটা খোলেন মায়ারানি, আর তারপর আতঙ্কে, ভয়ে আর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। বাক্সটা খালি!

* * *

বালুরঘাটের বিবেকানন্দ পাড়ায় দত্তগুপ্ত গিন্নির সুনাম আছে ধর্মপ্রাণা মহিলা বলে। ভদ্রমহিলা ঝাড়া হাত পা, ছেলে-মেয়ে দু-জনেই বিবাহিত, বাইরে চাকরি করে। স্বামী ভদ্রলোকটি ভারি ভালোমানুষ, বহুদিন বালুরঘাট কলেজে দর্শন পড়িয়েছেন। ফলে কর্তা-গিন্নির ইহজীবনের জাগতিক দায়দায়িত্ব আপাতত শেষ। মাঝেমধ্যে ছেলের কাছে মুম্বাইতে বা মেয়ের কাছে ব্যাঙ্গালোরে ঘুরে আসা, গান শেখানো, গিন্নিদের দ্বিপ্রাহরিক আলাপ, কর্তার অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুদের নিয়ে বৈকালিক আড্ডা দেওয়া, এই নিয়েই কেটে যাচ্ছে। তবে গিন্নিমার দিনের বেলার প্রায় পুরোটাই যায় ঠাকুরসেবায়। দত্তগুপ্ত গিন্নির বিশাল ঠাকুরঘরে খুঁজলে নাকি তেত্রিশ কোটি দেবতার কম করে হলেও অন্তত অর্ধেককে পাওয়া যাবেই, পাড়ায় প্রচলিত প্রবাদ। এ ছাড়াও ভদ্রমহিলা দরিদ্র প্রতিবেশীদের প্রয়োজনে দেখেন, পাড়ার কয়েকটি শিশুর পড়াশোনার ব্যয়ভার চালান, সব মিলিয়ে বেশ জনপ্রিয়ই বলা চলে।

অতসীর এ বাড়িতে যাতায়াত ছোটোবেলা থেকেই। বস্তি বাড়ি থেকে প্রায় কুড়িয়ে এনে একে মানুষ করেছিলেন গিন্নিমাই। নইলে নেশাখোর বাপ আর বহুগামিনী মায়ের সংসারে যে এতদিনে সে ভেসে যেত, সেটা অতসী ভালো করেই জানে। লেখাপড়া বেশি হয়নি অতসীর। আঠারো বছর বয়সে খানিকটা গিন্নিমার সঙ্গে জোরাজুরি করেই সে ভোম্বলকে বিয়ে করে। সে বিয়েও গিন্নিমাই দেন। আজ ফলকটা পেয়ে সে সোজা এসে গিন্নিমার দরবারে উপস্থিতি।

গিন্নিমা আজ বেজায় ব্যস্ত ছিলেন। গ্রাম থেকে তাঁর দেওরের বড়ো মেয়ে তিতলি এসেছে, প্রায় দু-বছর পর। এই দেওরকে তিনি পুত্রসম স্নেহে মানুষ করেছেন। সে এখন তাঁদের গ্রামের দিকের পৈতৃক সম্পত্তির দেখাশোনা করে, দাদা-বউদিকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। ফলে তার মেয়ে যে ওঁদের চোখের মণি হবে সে তো বলাই বাহুল্য। আর কী দেখতে হয়েছে মেয়েকে! সবে ষোলো বছর বয়েস, আহা, সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা যেন, রূপ যেন একেবারে ফেটে পরছে। উজ্জ্বল গম রঙের ত্বক, তাতে লালচে আভা, একঢাল কোঁকড়ানো চুল, পদ্মফুলের পাপড়ির মতন চোখ আর তেমন মিষ্টি ব্যবহার। গিন্নিমা তো ঘুরে ঘুরে দেখেন, আর আশ মেটে না। থেকে থেকেই থু থু করে যাচ্ছেন, আহা যদি নজর লাগে।

পাশের মুখুজ্জে বাড়ির যমজ মেয়ে সোনাই আর রূপাই তো তিতলির খুব ন্যাওটা। তারা তো দিদিকে দু-বছর বাদে পেয়ে কি করবে বুঝেই উঠতে পারছে না। সেই সক্কাল থেকে চিলেকোঠায় গল্প জুড়েছে তিন জনে। ছাদে কাপড় মেলতে গিয়ে হা হা হি হি শুনেছেন তিনি বার দুয়েক। এই বারো বছর ষোলো বছর বয়সে এত কী তোদের গোপন গল্প রে বাপু, অ্যাঁ?

অতসী যখন আসে, দত্তগুপ্ত গিন্নি তখন খেয়েদেয়ে শোবার উদ্যোগ করছিলেন, ফলকটা দেখে বললেন, ‘তোর হাতে ওটা কিরে অতসী?’ অতসী হাত পা নাড়িয়ে বেশ বর্ণনা সহকারে তার প্রাপ্তি কাহিনিটি জানালো, ‘মনে হচ্ছে খুব বড়ো তিন দেবী, বুইলে গিন্নিমা, আমি তো ভাবলুম তোমার কাছে দিলে সেবাযত্ন পাবে, তাই নিয়ে এলুম।’

এর বেশি কিছু বলার দরকারও ছিল না গিন্নিমাকে। ঠাকুরদেবতার মূর্তিগুলোকে উনি মানুষ জ্ঞান করেই সেবাযত্ন করেন। গরমের আলাদা জামা, শীতের আলাদা জামা, তার ওপর মরসুমের নতুন ফল কি সবজি,

সবই আগে ঠাকুরসেবায় যায়। গরমকালে ঠাকুরঘরে এ সি চলে, কর্তার অনুযোগ উপেক্ষা করে। হৃষ্ট মনে গিন্নিমা ফলকটা নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'চল তাহলে, মায়ের যখন ইচ্ছে।'

অতসী ফিরে যাবার সময় দেখল ছাদে দাঁড়িয়ে চাপা লজ্জারুণ মুখে মোবাইলে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে তিতলি।

* * *

একটা দীর্ঘ গুপ্তপথ পেরিয়ে তিন জনে যখন সেই পথের শেষে এসে দাঁড়ালেন, তাঁদের সামনে একটা বিশাল গর্ভগৃহ। তার চারিপাশের দেওয়ালে মশাল গুঁজে রাখার ফলে স্থানটি ঈষৎ আলোকিত। প্রবেশপথের একদম উলটোদিকের দেওয়ালে লম্বমান একটি চিত্রিত বস্ত্রখণ্ড। তার সামনে, প্রবেশপথের দিকে পিঠ করে বসে একটি বিশাল শরীর, তার উর্ধ্বাংশ অনাবৃত, নিম্নাংশে পরিহিত গেরুয়া পট্টবস্ত্র। তাঁর পাশে বিনীতভাবে দাঁড়ানো একটি শরীর, এই সোমপুরা মহাবিহারের একজন শ্রমণ, ভিক্ষুপা।

চিত্রিত বস্ত্রখণ্ডটিতে যে চিত্রটি অঙ্কিত, চকিতে দেখলে অতিবড়ো সাহসীরও বুক কেঁপে উঠবে। চিত্রের মধ্যস্থলে এক ভয়ালদর্শন কালদংষ্ট্রাবিশিষ্ট নীলবর্ণ পুরুষের ছবি। ভয়াবহ আরক্ত চোখ দুটি যেন বাইরে বেরিয়ে এসেছে অসীম ক্ষুধায়। তাঁর মাথায় রত্নখচিত বহুমূল্য মুকুট অঙ্কিত। মুখমণ্ডল সামান্য উন্মুক্ত, তার মধ্যে দিয়ে তাঁর শ্বদন্ত দুটি প্রকট। গলায় মুণ্ডমালা, বদনমণ্ডল ক্রোধাবেশে উদ্ভাসিত এবং কেশরাজি অগ্নিশিখার ন্যায় উর্ধ্বগামী। ইনি আলীঢ় পদে, অর্থাৎ দক্ষিণ পদ অগ্রবর্তী করে, এবং বাম পদ পিছনে মুড়ে নীচে এক যুগনদ্ধ মূর্তিকে পদদলিত করছেন।

শ্রীরত্নাকরশান্তি এবং বোধিভদ্র জানেন ওই যুগনদ্ধ মূর্তি কার। ভৈরব ও কালরাত্রি!

এখানেই শেষ নয়, এক উলঙ্গিনী দেবী, যাঁর গাত্রবর্ণ রক্তের ন্যায় লাল, তিনি এই নীলবর্ণ পুরুষের বাম ঊরুর ওপর আসীনা, তাঁর মুখ সেই ভয়াল পুরুষটির মুখের কাছে, দেবীর শুধুমাত্র উন্মুক্ত পশ্চাৎদেশটি দৃশ্যমান এবং শুধুমাত্র বাম পার্শ্বের মুখমণ্ডলটি উদ্ভাসিত। আহা, কী ক্রোধোদ্দীপ্ত, কী ভয়ংকর সেই মুখমণ্ডল! তাঁরও বাম পদ সেই ভৈরব ও কালরাত্রির যুগনদ্ধ মূর্তির উপর স্থাপিত। নীলবর্ণ সেই ভয়াল পুরুষটির ঘাড় জড়িয়ে দেবীর দুটি হাত, এক হাতে উদ্যত কর্ত্রি, আরেক হাতে রক্তপূর্ণ করোটি। আর দেবীর মাথার পাশ থেকে একটি বরাহমুখ নির্গত হয়ে রয়েছে।

এর সামনে যে বিশালকায় পুরুষটি বসে ছিলেন, তিনি 'হ্রীঃ হ হ হুঁ হুঁ ফট' বলে সেই বিশাল চিত্রপটাঙ্কিত বস্ত্রখণ্ডের উপর কিছু রক্তচন্দনচর্চিত পদ্ম ছুঁড়ে দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গে পিছন থেকে মহাস্থবির রত্নাকরশান্তি গম্ভীরস্বরে বলে উঠলেন 'এই সময়ে এত গোপনে আপনি কীসের সাধনায় রত ভন্তে বজ্রকেতু, জানতে পারি?'



সেই বিশালদেহী পুরুষটি চমকে ঘাড় ঘোরালেন, চমকে উঠলেন ভিক্ষুপা। উঠে না দাঁড়িয়ে, না ঘুরেই গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন বিশাল পুরুষটি, 'চক্রসম্বর হেরুকের আরাধনা তো আপনার অজানা নয় স্থবিরশ্রেষ্ঠ, আর চক্রসম্বর হেরুক ও দেবী বজ্রবারাহীর যুগনদ্ধ মূর্তি কি আপনার মতন পণ্ডিতের অদেখা? ইনি দেব সপ্তাক্ষর, দেবী বজ্রবারাহী...'

রূঢ় কণ্ঠে তাঁকে থামিয়ে দেন সোমেশ্বর গর্গ, 'উঠে দাঁড়ান ভন্তে, ওইভাবে কারো সঙ্গে কথা বলা ভব্যতাবিরুদ্ধ, সে আপনি জানেন না?'

এইবার সম্পূর্ণ উঠে দাঁড়ালেন সেই দীর্ঘকায় বলশালী পুরুষটি। এদিকে ফিরে তাকাতে প্রকাশ পেল তাঁর পেশিবহুল চেহারা। মাথায় অবিন্যস্ত কেশরাশি জটাকারে চূড়া করে বাঁধা, শ্মশ্রুগুম্ফময় মুখ। তবে সবচেয়ে দর্শনীয় বুঝি চোখ দুটো।

মনে হয় যেন সহস্র বছরের আদিম ক্রূরতা সেই চোখের অতলে লুকিয়ে আছে, লুকিয়ে আছে আগ্নেয়গিরির মতন। বিষধর কালনাগিনী যেন ফনা তুলবে যেকোনো মুহূর্তে, কিন্তু আপাতত শীতল বিষের সঞ্চয় নিয়ে সে অপেক্ষমান।

সামান্য কৌতুক কি খেলে গেল বজ্রকেতুর মুখে? সাড়ম্বরে মাথা ঝুঁকিয়ে বললে, 'প্রণত হই মহামাত্য গর্গ। কী সৌভাগ্য, আচার্য বোধিভদ্রও উপস্থিত দেখছি। অধীনের প্রতি কী আদেশ প্রভু?'

'প্রশ্ন তো আগেই করেছি ভন্তে বজ্রকেতু। এই সময়ে এত গোপনে সপ্তাক্ষর বজ্রবারাহীর পুজোর কী প্রয়োজন? সোমপুর মহাবিহারের যেকোনো চৈত্যে বা প্রকোষ্ঠে আপনি এ পূজা করতে পারতেন ভন্তে', শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন রত্নাকরশান্তি।

'মন্ত্রযানে আসনসিদ্ধির উপায় ও প্রকরণ যে একান্ত গোপনীয়, হে মহাস্থবির।'

'কীসের এত গোপনীয়তা বজ্রকেতু?' সামান্য অস্থির গলায় প্রশ্ন করলেন বোধিভদ্র, 'সোমপুর মহাবিহার সম্পূর্ণত সদ্ধর্মের মহাযানপন্থা অবলম্বন করে। যেখানে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের পথানুসারে বহুজনসুখায় বহুজনহিতায় করুণাবিতরণ করে জগতের উদ্ধারই একমাত্র লক্ষ্য। যদি ব্যক্তিগত সম্বোধিই একমাত্র লক্ষ্য হয়, ধর্মকায়ে এবং তথতায় যদি একাই আগত হতে চান, তাহলে মহাযানপন্থা আপনার পথ নয় ভন্তে, আপনি থেরবাদী, স্বার্থপর হীনযানী। আপনি কীসের আকাঙ্ক্ষায় ব্যক্তিগত সিদ্ধির পথ বেছে নিলেন ভন্তে বজ্রকেতু? এত গোপনীয়তা কীসের? প্রভু শাক্যসিংহ তো আমাদের এই রাস্তা দেখাননি ভন্তে।'

'আহ, তত্ত্বকথা রাখুন পণ্ডিতাচার্য, আমার প্রশ্নের উত্তর চাই। ভন্তে বজ্রকেতু, আমার চরেরা খবর দিয়েছে একটু আগে পাশের গ্রাম থেকে আপনি আর আপনার এই অনুগত শ্রমণ শিবাপা মিলে তিন জন শিশুকন্যা চুরি করে এনেছে। তারা কোথায়?' সোজা প্রশ্ন সোজা ভাবে করাই মহামাত্য সোমেশ্বর গর্গের বৈশিষ্ট্য।

'পালবংশের উন্নতি হোক। সামান্য তিনটি গ্রামীণ কন্যার জন্যে স্বয়ং মহামাত্য ছুটে এসেছেন...'

'স্থানীয় মহাপ্রতিহারের সঙ্গে কয়েক জন দণ্ডপাশিকা বা দণ্ডশক্তি পাঠালেই হত। কিন্তু আশেপাশের গ্রাম থেকে এই কন্যা শিশু চুরি এবং সোমপুর মহাবিহারের ভিতর তাদের গোপনে নিয়ে আসার অভিযোগ বেশ কয়েক দিন ধরে স্থানীয় মহাসামন্তের দ্বারা আমাদের কর্ণগোচর হচ্ছিল। যেহেতু পালবংশের গৌরব সোমপুর মহাবিহারের সঙ্গে জড়িত, তাই আমাকে নিজে আসতে হয়েছে ভন্তে। এইবার জবাব দিন, কন্যা তিনটি কোথায়? আর এরকম আচরণের কারণ কী?'

মুহূর্তে মুখের ভাব বদলে যায় সেই বিশালদেহী পুরুষটির। সারা মুখে ছড়িয়ে পরে অদ্ভুত এক শান্তি, 'কন্যা নয় মহামাত্য, তারা এখন মহান হেরুক ও বজ্রবারাহীর পদতলে অতি পবিত্র তিনটি অর্ঘ্য, তিনটি স্বয়ম্ভু কুসুম।'

চোয়াল দৃঢ় হল বোধিভদ্র এবং রত্নাকরশান্তির। রজঃস্বলা বা ঋতুমতী কন্যাকে এই নবোত্থিত মন্ত্রযানমতে বলা হয় স্বয়ম্ভু কুসুম। সোমেশ্বর অতশত বুঝলেন না, শুধু গলা চড়িয়ে বললেন, 'অর্ঘ্য মানে? কী উন্মাদের প্রলাপ শুরু করেছেন ভন্তে?'

বিশাল পুরুষটি এইবার পূজার স্থল থেকে পুরোপুরিভাবে সরে দাঁড়ালেন। আর সেইক্ষণে তিন জনেই ক্রোধে, আতঙ্কে, বিবমিষায় স্থির হয়ে গেলেন।

সেই চিত্রাঙ্কিত বস্ত্রটির একদম নীচে একটি ফলক রাখা আছে। তাতে কয়েকটি শরীর উৎকীর্ণ। লাল রঙের সেই ফলকটি সিঁদুর ও চন্দনচর্চিত, সামনে কিছু ফুল পড়ে আছে। তার সামনে ভূমির ওপর জটিল একটি জ্যামিতিক ছবি আঁকা। যন্ত্র অঙ্কনে দুই পণ্ডিতপ্রবরেরই বিশেষ সিদ্ধি আছে, কিন্তু তাঁরাও বুঝতে পারলেন না, এতই জটিল সে যন্ত্র। অবশ্য তাঁরা বুঝবার মতন অবস্থাতেও ছিলেন না।

সেই যন্ত্রচিত্রটির মধ্যস্থানে একটি তাম্রপত্রের ওপর ত্রিভুজাকারে সাজিয়ে রাখা তিনটি সদ্যকর্তিত ছিন্ন শিশু বালিকামুণ্ড!!!

ক্রোধে ক্ষোভে দিশাহারা বোধিভদ্র কাঁপতে কাঁপতে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী তুলে বললেন, 'ওরে নরাধম পাষণ্ড, এ কী করেছিস? তিনটি অসহায় বালিকার বলি দিয়ে ভাবছিস অর্হৎ হবি? বোধি লাভ করবি? হায় শাক্যসিংহ, হায় অবলোকিতেশ্বর, দেখে যাও, তোমাদের প্রচলিত সদ্ধর্মের নামে কী মহাপাপ করেছে এই বর্বর। ওরে পাপিষ্ঠ, নিরীহ প্রাণীহত্যায় ভেবেছিস পুণ্য হবে তোর? নরকভোগ হবে তোর, অক্ষয় নরকভোগী হবি তুই', মহাপণ্ডিতাচার্যের হাহাকার সারা গর্ভগৃহে ছড়িয়ে পড়ল।

অবাকই হলেন বজ্রকেতু, 'সে কি পণ্ডিতপ্রবর? নরবলি তো মহাবলি, মন্ত্রযানে এর থেকে বেশি পুণ্যকর্মের রাস্তা আর কিই বা আছে? আপনারা কি সিদ্ধাচার্য কাহ্নপাকে নিয়ে সদ্যঘটিত কাহিনিটি শোনেননি? মেখলা আর কনখলা নামের দুটি মেয়ে...'

'ওরে পাপমতি মূঢ়, ও কাহিনি সত্য নয়, রূপক মাত্র। জ্ঞানখড়্গে নিজের অহংকার বলি দেওয়ার রূপক', আর্তনাদ করে উঠলেন রত্নাকরশান্তি, 'আর তুই তাকে সত্যি ভেবে তিনটি নিরীহ শিশু বধ করলি? হায় প্রভু শাক্যসিংহ, হায় পঞ্চবিংশতি বোধিসত্ত্ব, হায় প্রভু অবোকিতেশ্বর, দেখো, তোমাদের সদ্ধর্মের কী নিদারুণ অধঃপতন।'

নিজের অসি কোষমুক্ত করলেন সোমেশ্বর গর্গ, ক্রোধে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, 'এক বার শুধু অনুমতি দিন স্থবিরশ্রেষ্ঠ, এই নরপশুটির বোধিলাভের ইচ্ছেটা জন্মের মতন ঘুচিয়ে দিই।'

হাত তুলে মহামাত্যকে নিরস্ত করলেন মহাস্থবির, কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে অস্ফুটে কিছু উচ্চারণ করলেন, তারপর দক্ষিণহস্ত সামনে প্রসারিত করে, তর্জনী এবং কনিষ্ঠা দুটি উত্তোলিত অবস্থায় রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলিটি দিয়ে অন্যান্য অঙ্গুলিগুলি বদ্ধ করে করণমুদ্রা ধারণান্তে গম্ভীর গলায় বললেন, 'শোন রে পাপমতি ক্রূরাত্মা, এই পবিত্র মহাবিহারে আমি আর নরহত্যা হতে দেব না, তাই তোকে মহামাত্যের হাতে সমর্পণ করলাম না। এইদণ্ডে তুই দূর হয়ে যা, তোকে পাল সাম্রাজ্যের বাইরে নির্বাসিত করা হল। হরিকেল থেকে অঙ্গ, তাম্রলিপ্ত থেকে প্রাগজ্যোতিষপুর, সমগ্র সমতট বা পৌণ্ড্রবর্ধন, কোথাও কোনো ভূমিতে যেন তোর অপবিত্র ছায়া অবধি না পড়ে, হরিকেলের এদিকে যেন তোর ওই পাপিষ্ঠ মুখ কেউ না দেখে। আরও শুনে রাখ। আজ থেকে তোর বংশকে আমি দেবী একজটার নামে অভিশপ্ত ঘোষণা করলাম। তোর বংশে প্রতি পুরুষে একটি করে বদ্ধ উন্মাদ শিশু জন্মাবে যার জন্যে তোর বংশাবতংসদের অশেষ দুঃখ ও ক্লেশ স্বীকার করতে হবে। এইভাবে এক হাজার বছর ধরে এই জ্বালা ভোগ করার পর তোর পুনর্জন্ম হবে, আর সেই জন্মে দেবী বজ্রবারাহী নিজহস্তে তোর পাপ নাশ করবেন। যে পাপিষ্ঠ ফলকটির সামনে এই ঘৃণ্য পাপকর্মটি করেছিস, তাকেও অভিশাপ দিলাম। এক হাজার বছর ধরে এই অভিশপ্ত ফলক তোদের বংশে পূজিত হতে থাকবে আর তোদের এই অভিশাপের কথা মনে করিয়ে দিতে থাকবে। যেদিন এই ফলক স্ব-ইচ্ছায় আমার বংশের কারও কাছে ফিরে আসবে, সেদিন জানবি তোদের পাপভোগের শেষ। সেইদিন তোর বংশধারা লোপ পাবে, এবং তোর যাবতীয় পাপের বিনাশ হবে। ততদিন পর্যন্ত তোর মুক্তি নেই, নেই, নেই।'

* * *

মায়ারানি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন ফাঁকা বাক্সটার দিকে। কেউ নিয়ে গেছে এই বাক্স তা হতেই পারে না, কারণ এই পরিবারের বাইরে কেউ এর অস্তিত্বই জানে না। আগেরবার নিজে পূজা করে নিজের হাতে তুলে রেখেছিলেন, স্পষ্ট মনে আছে। নীচু হয়ে এদিক-ওদিক দেখলেন। না নেই, কোথাও তার চিহ্ন নেই। হঠাৎ করে অজানা আশঙ্কায় বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আর অমঙ্গল আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন মায়ারানি, শাশুড়ির বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল।

বংশলোপ।

জানেন না মায়ারানি সে কোথায়, কীরকম আছে। দশ বছর হয়ে গেল, তার মুখদর্শন করেননি তিনি।

দশ বছর আগেকার এক অভিশপ্ত দুপুর যেন উত্তপ্ত আগুনের ঝলকের মতন মায়ারানির স্মৃতিসত্তা নাড়িয়ে দিয়ে গেল। পুজো করছিলেন মায়ারানি, সেদিন নীলষষ্ঠীর ব্রত ছিল। যতই কুপুত্র হোক, মা সবসময়ই সন্তানের ভালো চান, তাই সেইদিনও করজোড়ে প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময়ে উঠোনে বিপুল হট্টগোল, চিৎকার চেঁচামেচি আর কান্নার আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে আসেন। এসে দেখেন তাঁর উঠোনে প্রায় সারা পাড়া ভেঙে পড়েছে। তার সামনে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে হরেন গোঁসাইয়ের বউ, তার হাতে ধরা হরেন গোঁসাইয়ের বড়ো মেয়ে, তেরো বছরের মাম্পি। মাম্পি বোধ হয় স্নান করছিল, ক্রুদ্ধা গোঁসাইগিন্নি সেই অবস্থাতেই ভিজে টেপজামার ওপর একটা গামছা জড়িয়ে টেনে এনেছেন মেয়েটাকে। ঘটনার অভিঘাতে, লজ্জায় আর ভয়ে থরহর করে কাঁপছে মেয়েটা। গোঁসাইগিন্নির অবশ্য তাতে হুঁশ নেই, তিনি চিল চিৎকারে পাড়া মাথায় তুলেছেন, 'ছি ছি ছি, পাড়ার মধ্যে বাস করা দায় হয়ে উঠল দেখছি। বেআদব বদমাশ ছেলে, ছি ছি ছি। এত দিন মেয়েদের স্নান করার সময় উঁকিঝুঁকি দিতিস, সাহস বাড়তে বাড়তে কোথায় উঠে ঠেকেছে দ্যাখো... ঘরে ঢুকে সোমত্ত মেয়েকে... বলি এমন ছেলেকে আঁতুড়েই নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারোনি মেজো বউ... ছি ছি...'

মায়ারানি প্রথমে হকচকিয়ে গেছিলেন, তারপর সামান্য সামলে নিয়ে বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে দিদি?'

'আর দিদি বলে ডেকো না ভাই। দেখো তোমার গুনধর সুপুত্তুরের কাণ্ড। মাম্পি চান করতে বাথরুমে ঢুকেছে, সেই সুযোগে তোমার ছেলে বাইরে থেকে কাঠি দিয়ে ছিটকিনি খুলে ভেতরে ঢুকে... ছি ছি ছি... তোকে দাদা দাদা বলে ডাকত, হ্যাঁ, সেদিনও মাসিমা মাসিমা করে ডেকে লুচি আর পায়েস খেয়ে গেলি... ছি ছি ছি... দুধ দিয়ে কী কালসাপই না পুষেছ ভাই... কী শিক্ষাই না দিয়েছ... এ পাড়ায় বাস করা কিন্তু ঘুচিয়ে দোবো, আমাকে চেনো না...'

পাথরের মতন স্থবির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মায়ারানি, আর তাঁর ভেতরটা পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছিল। আজ অবধি না তাঁর মা-বাবা, না শ্বশুর-শাশুড়ি, না স্বামী, কেউ তাঁকে একটা কটু কথা বলতে পারেননি, এমনই শান্ত অথচ দৃঢ় স্বভাব মায়ারানির। সত্য ব্যবহার ও স্পষ্ট উচ্চারণের জন্যে পাড়ায় লোকে তাঁকে ভয়ও করে ভালোও বাসে। আজ সারাজীবন ধরে তিল তিল করে জমানো মান-ইজ্জত সব যেন তাসের ঘরের মতন তাঁর চারিপাশে ভেঙে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল যেন গোঁসাইগিন্নি সর্বসমক্ষে তাঁর শাড়ি টেনে খুলে উলঙ্গ করে দিচ্ছে।

'সে কোথায়?'

অবিশ্বাস্য শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন মায়ারানি। সারা উঠোন মুহূর্তে চুপ করে গেল। শুধু গোঁসাইগিন্নি থুতু ফেলে মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'যাবে কোথায়, দ্যাখো গে, আবার কোথায় মুখ মারতে গেছে। কুকুরের লেজ কি আর...'

'যদি তাকে দেখতে পাও কেউ, বলে দিও যদি বেঁচে থাকতে চায়, এ বাড়িতে যেন আর না ফেরে, এইদণ্ডে আমি ওকে ত্যাজ্য করলাম, আমি ওকে আমার ছেলে বলে আর মানি না, এই ফ্যামিলির সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই ওর। আর তুমি ঘরে যাও দিদি। মাম্পির কাছে আমি গিয়ে পা ধরে ক্ষমা চেয়ে আসব না

হয়, এখন আর শাপমন্যি না করে বাড়ি যাও। কেউ যদি কখনো জানতে পার ও মরে গেছে, আমাকে জানাবে না, আর যদি আমি মরে যাই, ওকে খবর দেবে না, আজ থেকে ও হালদার বাড়ির কেউ নয়', এই বলে ধীরপায়ে ঘরে ঢুকে খিল দিলেন মায়ারানি।

পাড়ার সবাই যে-যার নিজের ঘরে ফিরে গেল। এবং সেইদিন থেকে টেনিয়া আর বাড়ি ফেরেনি। আর কোনোদিনই তার মুখ দেখেননি মায়ারানি।

বংশলোপ।

মায়ারানি জানেন যে একমাত্র তিনি আর তাঁর ছেলে ছাড়া হালদার বাড়ির আর কেউ বেঁচে নেই। হালদার পরিবারের যারা চট্টগ্রামে থেকে গেছিল, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁদের আক্ষরিক অর্থেই কুচিকুচি করে কেটে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে রেখে সারা গ্রামকে ডেকে দেখানো হয়েছিল যে নাপাক হিন্দুদের কী শাস্তি হওয়া উচিত, দেড় বছরের শিশুও রেহাই পায়নি। তারপর সারা বাড়িতে পেট্রোল লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাঝেমধ্যে মনে হত মায়ারানির হয়তো একদিন সে ফিরবে, ভালো হয়ে ফিরবে। কোনো এক অলৌকিক মধ্যরাতে এসে চুপিচুপি মা-কে ডেকে বলবে, 'মা, আমি ভালো হয়ে গেছি, চলো অন্য কোথাও গিয়ে থাকি', সেরকম কখনো হলে মায়ারানি হয়তো একবস্ত্রেই চলে যেতেন। কতদিন স্তব্ধ দুপুরে খেতে বসে বাইরে কারো আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠতেন, সে এল নাকি ফিরে?

কী করতেন মায়ারানি সত্যি সে যদি ফিরে আসত? কী করতেন? কে জিতত? মাতৃহৃদয় নাকি ন্যায়বিচার?

আজ যখন জানলেন মায়ারানি হয়তো আজই তার শেষ দিন, তখন কেমন জানি মনে হচ্ছে মাতৃহৃদয় জিতলেও জিতে যেতে পারত। অন্তত মরে যাবার আগে একটি বার দেখতে পেতেন। বাপের বাড়ি বলে অনেকদিনই কিছু নেই তাঁর। শ্বশুর গেলেন, স্বামীও। তারপর শাশুড়িও। এখন ছেলেকে হারিয়ে কী নিয়ে বাঁচবেন মায়ারানি? কীসের আশায়?

অনেক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন মায়ারানি। দুপুর গড়িয়ে মায়ারানির উঠোনে মিঠে বিকেল নেমে এল। মায়ারানি তাও ঠায় বসে রইলেন। তারপর পাশের বাড়িতে সন্ধেবেলায় তীক্ষ্ণ শাঁখ বেজে উঠতে সংবিৎ ফিরে পেলেন তিনি। ধীরপায়ে উঠে আলমারি খুললেন, সবচেয়ে ওপরের কুঠুরির একদম পেছনে হাত চালিয়ে বার করে আনলেন একটা ছোটো চামড়ার ব্যাগ, মৃত সেলস অফিসার স্বামীর শেভিং কিট। তার মধ্যে হাত চালিয়ে তুলে আনলেন ভারী পুরোনো রেজরটা। তারপর টলতে টলতে গেলেন তাঁর ভাঁড়ার ঘরে। খুঁজেপেতে একটা নতুন ব্লেড বার করে আধাআধি ভাঙলেন। রেজরে ভরলেন। তারপর একটা বালতি টেনে এনে বিছানার বাঁ-দিকে রাখলেন। তারপর ঠাকুরঘরের সামনে নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। সবশেষে বিছানায় শুয়ে এক বার সামান্য অভিমানভরেই হয়তো বললেন, 'এ জন্মে বিনা দোষে বড়ো কষ্ট দিলে ঠাকুর। আমার কিন্তু কোনো অপরাধ ছিল না। দেখো ঠাকুর, পারলে পরের জন্মে ভালো মা বানিয়ে পাঠিও', বলে বাঁ-হাতটা বালতির মধ্যে রেখে, কবজির উলটোদিকে রেজরটা প্রায় গেঁথে দিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে টেনে দিলেন মায়ারানি হালদার।

* * *

ঘোরের মধ্যে ছিল তিতলি। এমনও হয়? রূপকথা আজও ঘটে? এভাবেও প্রেমে পড়া যায়? গত বছরেই ভালো রেজাল্ট করে বাবাকে বলে একটা দামি স্মার্টফোন পেয়েছে তিতলি। আর ফোন পাওয়া মাত্রই সিম কার্ড, ডেটা প্ল্যান ইত্যাদি হাবিজাবি সেট করে ফেসবুক! আর মুহূর্তের মধ্যে তিতলির সামনে যেন পুরো দুনিয়াটা দরজা কপাট খুলে তার গ্রামের বাড়ির উঠোনে চলে এল। লখনউয়ের মনামাসি, বম্বের বুলুকাকা, কলকাতার রত্নাপিসিমা আরও অনেকে, তারপর ওর স্কুলের সিনিয়র শবনমদিদি, যে জয়েন্ট পেয়ে

কলকাতায় যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেছে সে, সব্বাইকার সঙ্গে রোজ রোজ কথাবার্তা হা হা হি হি। কে বলে পৃথিবীটা এত বড়ো? এই তো সেদিন ব্যাঙ্গালোরের অনিদা প্যারিস গেল, তারপর কত্ত কত্ত ছবি আপলোড করল, দেখে দেখে তো তিতলির আর আশ মেটে না। শুধু কি আত্মীয় আর বন্ধুবান্ধব? তা ছাড়াও তাদের বন্ধু, কত গায়ক, নায়ক, লেখক, সব্বাই যেন কত হাতের কাছে চলে এসেছে জাদুকাঠির ছোঁয়ায়।

এই করতে করতে একদিন তিতলি দেখে অচেনা একটি ছেলের থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট, নাম স্যাম। প্রোফাইল পিকচারটা দেখে থমকে গেল তিতলি, আইব্বাস, পুরুষ মানুষ এত সুন্দরও হয়? দারুণরকম দেখতে তো ছেলেটাকে। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করেই ফেলল তিতলি।

* * *

সেইদিন বিকেলে লেকের আড্ডায় গিয়ে এক ছোটোখাটো টাকমাথা সৌম্যদর্শন প্রৌঢ়কে দেখে একটু আশ্চর্যই হলেন বালুরঘাট কলেজের দর্শনের প্রাক্তন অধ্যাপক তথাগত দত্তগুপ্ত। দেখা হতেই তাঁর বন্ধুরা হইহই করে ডেকে নিলেন, আলাপটা অবশ্য অবসরপ্রাপ্ত আমলা সমীরমোহনই করালেন, ‘আসুন গুপ্তদা, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিস্টার মৈত্র, আর ইনি প্রফেসর দত্তগুপ্ত। প্রফেসর সাহেব কিন্তু বিখ্যাত লোক মিস্টার মৈত্র, অনেকদিন ফিলোজফি পড়িয়েছেন কলেজে। এঁর কাছে কিন্তু বিশেষ জারিজুরি খাটবে না আপনার, এই বলে দিলুম।’

মৃদু হেসে যুক্তকরে নমস্কার করলেন তথাগতবাবু। মাথা সামান্য নীচু করে প্রতিনমস্কার করলেন নবাগত প্রৌঢ়টি। সাদা ট্রাউজার্স, কমলা রঙের হাফ শার্ট আর সাধারণ একটি বাটার জুতো পরে আছেন ভদ্রলোক। সম্পূর্ণ ন্যাড়া মাথায় সামান্য একটি টিকির আভাস, যা আজকালকার বাঙালিদের মধ্যে দেখাই যায় না। তবে সমস্ত শরীরে যেটা নজর কাড়ে, খেয়াল করলেন তথাগত, সেটা হচ্ছে চোখ দুটি। আশ্চর্য শান্ত মায়াময় অথচ উজ্জ্বল চোখ দুটি, দেখেই মনে হয় বুদ্ধিমান ভালো লোক। ভদ্রলোককে মনে মনে বেশ পছন্দই হয়ে গেল তাঁর।

‘নতুন এলেন নাকি এখানে’, স্মিত হেসে প্রশ্ন করলেন প্রফেসর দত্তগুপ্ত।

‘আরে না না, গেসলাম বীরভূমের মল্লারপুর’, মাঝখানে প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়লেন অকৃতদার, সম্পন্ন ব্যবসায়ী মাধব আচার্য, ‘ভাইয়ের ওখানে, বুইলেন। একটা তেলকল সস্তায় পাচ্ছিলাম কিনা, ভাবলাম কিনে রাখি। তা একদিন সকালে উঠে দাঁত মাজতে মাজতে রাস্তায় হাঁটছি, দেখি ইনি পাশের বাড়ির বাগানে একটা বেদিতে বসে ধ্যানট্যান করছেন। আমি তো মশাই, আপনারা জানেন, সারা জীবন টাকাপয়সা ছাড়া অন্য ব্যাপারে কিছু ভাবিনি। তা পাপীতাপী মানুষ, ভাবলুম দেখে নিই ধ্যানট্যান কী করে করতে হয়, রাত্তিরে হিসেবটিসেব করে খেয়েদেয়ে মশারি টশারি ফেলে প্র্যাকটিস করব না হয়। ওমা, খানিকক্ষণ পর ইনি হঠাৎ চোখটোখ খুলে বলেন, ‘‘তেলকলটা কিনবেন না, ওতে অভিশাপ আছে।’’ আমার তো মশাই ঠকাস করে হাত থেকে টুথব্রাশটা পড়ে নর্দমায় ভেসে চলে গেল। আমি তেলকল কিনব ইনি কী করে জানলেন? পাশের বাড়ির সঙ্গে আমার ভাইয়ের তো বাক্যালাপই নেই, ওদের জানার প্রশ্নই ওঠে না। তারপর ভাবলুম বাজারে তো কথা উড়ছেই, ইনি হয়তো সেখান থেকে জানবেন। যাই হোক, পনেরো টাকার টুথব্রাশটা গচ্চা দিয়ে বাড়িতে এসে চানটান করে খেতে বসিচি কি বসিনি, ওম্মা, খবর পেলুম সেই তেলকলে নাকি পুলিশ এসেছে। কী ব্যাপার? আমি তো মশাই থ! তারপর ছুটে গিয়ে দেখি তেলকলের মেঝে খুঁড়ে পুলিশ একটা মেয়ের লাশ তুলছে। সে কী ওয়াক তোলা গন্ধ মশাই! জানা গেল মালিক নাকি তার ছেলের বউকে মেরে পুঁতে দিয়ে তেলকলটা আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টায় ছিল, বিয়ের দেনা-পাওনা নিয়ে কারবার... আমি তো মশাই ছুট্টে গিয়ে এঁয়াকে বল্লুম, আপনাকে ছাড়ছি না দাদা...’

এততটা একদমে বলে হাঁপাতে লাগলেন মাধব আচায্যি। এতক্ষণ তথাগত হাঁ হয়ে শুনছিলেন, এইবার সমীরবাবু বললেন, 'তারপর আচায্যিবাবু শোনেন ইনি ভাইয়ের সেই প্রতিবেশীদের গুরুভাই, কী এক প্রাচীন তান্ত্রিক পুঁথির খোঁজে এসেছেন মল্লারপুর। আর আচায্যিমশাইকে তো আপনি চেনেনই, যেটা ধরেন, তার একেবারে শেষতক বুঝে থাকেন। ইনিও মৈত্রমশাইকে বগলদাবা করে বালুরঘাটে এনে হাজির।'

এতক্ষণে মৈত্রমশাই কথা বললেন, 'আমারও অবশ্য ইচ্ছে কম ছিল না, এদিকে আসার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের।'

তথাগতবাবু প্রশ্ন করেন, 'কেন বলুন তো? এদিকেও কি তান্ত্রিক পুঁথি খুঁজছেন নাকি? সেসব বীরভূমের বাইরে কী করে পাবেন? সব তান্ত্রিক পীঠ মহাশ্মশান, এসবই তো দক্ষিণবঙ্গে। এদিকে তো...'

মৃদু হাসলেন মৈত্রমশাই, 'তান্ত্রিক পুঁথি খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে তন্ত্রপীঠের যোগ সামান্যই। আর তন্ত্র তো শুধু হিন্দুদের নয়...'

'মানে? তন্ত্র হিন্দুদের নয় মানে? ক্রিশ্চানদের বা মুসলিমদের আবার তন্ত্র আছে নাকি?' সংশয় প্রকাশ করেন লাইব্রেরিয়ান অনিন্দ্য ভুক্ত।

'না না, সে-কথা বলছি না। যদিও সুলেইমানি তন্ত্র বলে একটি ইসলামিক তন্ত্র প্রচলিত, তবে তার সঙ্গে ইসলামের যোগাযোগ নেই বললেই চলে।'

'মশাই কি তান্ত্রিক নাকি? তন্ত্র সম্পর্কে এত জ্ঞান, এত তান্ত্রিক পুঁথি খুঁজে বেড়াচ্ছেন... চট করে আচায্যি মশাইকে বলে দিচ্ছেন তেলকল না কিনতে, এদিকে দেখে তো কাপালিক বলে মনে হচ্ছে না মশাই। না লাল পট্টবস্ত্র, না হাতে খাঁড়া। কেসটা কী দাদা?' জিজ্ঞেস করলেন অপেক্ষাকৃত তরুণ অতীশ মণ্ডল।

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন, তারপর হাসিটাসি থামলে বললেন 'আরে না না দাদা, আমি তান্ত্রিক নই। তন্ত্র নিয়ে উৎসাহী পাঠক বলতে পারেন। আসলে আমরা বৈষ্ণব, যে সে বৈষ্ণব নয় দাদা, খাস নবদ্বীপের বৈষ্ণব। যদিও আমি নিজে শাক্ত। আমার গুরুর আদেশে তন্ত্র নিয়ে একটু রিসার্চ করছি এই আর কী। ওই গুরুর দেখানো পথেই অল্প সামান্য কিছু তন্ত্রাভ্যাস করা আছে, তাই তেলকলের ব্যাপারটা বলতে পেরেছিলাম।'

সবাই হইহই করে উঠল, 'ওই হল, মানে আপনি আধা তান্ত্রিক। তা দু-একটা নমুনা দেখান না দাদা।'

আবার হেসে ফেললেন ভদ্রলোক, 'এ কি ম্যাজিক দাদা? যে বললেই দেখানো যায়? একমাত্র মানুষের মঙ্গল করার উদ্দেশ্য ছাড়া গুরুর বারণ আছে এমনি এমনি ক্ষমতা প্রয়োগের। ওতে ক্ষমতা কমে যায়।'

তথাগত ঠান্ডা মাথার মানুষ। তিনি ধীর স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'তন্ত্র জিনিসটা হিন্দুদের নয় বলেছেন মৈত্রমশাই, কিন্তু ব্যাখ্যা দেননি। একটু খুলে বলুন না মশাই। নতুন কিছু শিখলেও তো শিখতে পারি।'

মৈত্রমশাই খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'তন্ত্র জিনিসটা অনেক পুরোনো জানেন। সভ্যতার আদিমে যখন মানুষ প্রকৃতির হাতে অসহায় ছিল, খাদ্য আর জীবনের তাগিদ তাকে তাড়িয়ে বেড়াত, তখন হয়তো যেন সে বেঁচে থাকে, যেন তার খাবার জোটে, তার জন্যেই বিভিন্নভাবে কোনো সর্বশক্তিমানের কাছে নিজেদের প্রার্থনা নিবেদন করা শিখল। এই নিবেদনের প্রকৃতিটাই তন্ত্র।

ইংরেজিতে এই সব পুরোনো প্রাকৃতিক পূজা পদ্ধতির একটা নাম আছে, পেগানিজম, তন্ত্রের সঙ্গে তার তফাত সামান্যই। সত্যি কথা বলতে কী, সমস্ত প্রাচীন ধর্মগুলিই আসলে ছিল বিভিন্ন প্রাচীন তান্ত্রিক প্রথা, শুধু দেখনদারি বাড়ানোর জন্যে আরও জটিল করে মানুষের সামনে পেশ করা। তন্ত্রের আসল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য ভগবানের কাছে নিবেদন পেশ করার বিভিন্ন আচার-আচরণ বা পূজা পদ্ধতি মানুষকে বলে দেওয়া, সে ফসল ফলানোর আগে সমবেত নাচও হতে পারে, বা মদ তৈরি করার গোপন পদ্ধতিও হতে পারে। অথবা হতে পারে গ্রামরক্ষক দেবীর নামে উৎসর্গ করা ষাঁড়টিকে বলি দেওয়া, অথবা অন্য পশু বলি দিয়ে তার শরীরের প্রজনন অঙ্গগুলিকে চাষের মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া।

আমাদের দেশেও হরপ্পা মহেঞ্জোদারোতে তন্ত্র সাধনার অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। তাই এও বলা যায় যে বৈদিক আর্য সভ্যতা আর এদেশীয় তন্ত্রসভ্যতার মধ্যে তন্ত্রসভ্যতাই বেশি প্রাচীন।'

এতটা বলে একটু দম নিলেন মৈত্রমশাই। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিলেন তাঁর কথা। সন্ধ্যা হয়ে আসা সত্ত্বেও কারও সে-কথা খেয়াল ছিল না।

* * *

স্যামের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করার পর কয়েক দিন সব চুপচাপই ছিল। সেই ক-দিনে স্যাম আর তার বন্ধুদের প্রোফাইল তন্নতন্ন করে খুঁজেছে তিতলি, ভূতগ্রস্তের মতন। ছেলেটাকে জানার জন্যে, চেনার জন্যে। যত জানছিল, তত মুগ্ধ হচ্ছিল তিতলি। যাদবপুরের ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার, ফাইনাল ইয়ার। চাকরিও পেয়ে গেছে এরই মধ্যে, বন্ধুদের সঙ্গে তার পার্টির ছবিও আপলোড করা আছে। সঙ্গে কতগুলো ডাইনি টাইপের গা ঢলানি মেয়ের ছবিও আছে অবশ্য, স্যামের গায়ে গা ঠেকিয়ে, হা হা হি হি না করে যেন চলছেই না। কলকাতার মেয়েগুলো বেহায়া একদম, ওইরকমই ছেলেধরা টাইপের, রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ভাবে তিতলি।

স্যামের নামও জানতে পেরেছে তিতলি, স্যমন্তক সেনগুপ্ত। নাম শুনেই তিতলি আর ভালো লাগা নয়, প্রেমেই পড়েছে ছেলেটার। যেমন করে সাজু পড়েছিল রূপাইয়ের প্রেমে, রোমিও জুলিয়েটের, দিলওয়ালেতে কাজল শাহরুখের, তেমনই তিতলি প্রেমে পড়ল স্যামের। কথা হয়নি তো কি? দেখা হয়নি তো কি? তিতলির ষোলো বছর বয়সের প্রেম কি ফ্যালনা নাকি? গ্রামের মেয়ে বলে হেলাফেলার বস্তু নাকি তিতলির ভালোবাসা?

শেষে যেদিন তিতলির 'হাই' এর উত্তরে স্যামের 'হ্যাল্লো বিউটিফুল' মেসেজটা তিতলির মোবাইলের স্ক্রিনে সদ্যফোটা পদ্মফুলের মতোই ভেসে এল, সেদিন তিতলির পুজো দেওয়ার ঘটা দেখে বাড়ির লোকজন তো অবাক!

তারপর মেসেজ, চ্যাট, হোয়াটসঅ্যাপ। তিতলি আর স্যামের কথার ঝিরিঝিরি কিশোরী ঝরনাটি কবে বেগবতী নদী হয়েছে, সে তিতলি নিজেই জানে না। ফোনে কথা বলা, হোয়াটসঅ্যাপে সেলফি পাঠানো, কিছুতেই পিছিয়ে থাকেনি তিতলি। এমনকী যেদিন স্যাম ওর স্নান করার ভিডিয়ো পাঠাতে বলল সেদিনও নয়।

বলতেই হবে স্যামের দাবিটা শুনে লজ্জায় কুঁকড়েই গেছিল তিতলি। ছি ছি ছি, ম্যাগো, কী লজ্জা লজ্জা। কী বেহায়া এই স্যামটা। ভাবলে এখনও ফর্সা মুখটা গোলাপি হয়ে আসে তিতলির। বিয়ের আগেই এসব কী, অ্যাঁ? ছিঃ!

শেষে অবশ্য লজ্জা ঘেন্নার মাথা খেয়ে একটা দশ মিনিটের ভিডিয়ো তুলে পাঠিয়েছিল তিতলি। নইলে যদি কলকাতার নিলাজ বেহায়া ডাইনিগুলো তার আগেই এসব দেখিয়ে তার স্যামকে কবজা করে ফেলে? হতেই পারে না। চোয়াল শক্ত করে, মনকে বেঁধে যতটা সম্ভব ব্রীড়া ও কামকলা মিশিয়ে সে একটা ভিডিয়ো পাঠিয়েছে স্যামকে। গ্রামের মেয়ে বলে সে কলকাতার মেয়েদের থেকে কম মডার্ন নাকি? ছোঃ!

মাঝে অবশ্য শবনমদিকে একবার হালকা আভাস দিয়েছিল তিতলি। সবদিক জেনেশুনে শবনমদি সেদিন অনেক রাতে কল করেছিল তিতলিকে। বলেছিল যে এই নামে যাদবপুরে প্রেজেন্ট চার বছরে কেউ পড়ে না, আগের দুই ব্যাচেরও খবর নিয়েছিল, সে ব্যাচেও কেউ পড়েনি। যদিও তিতলি তার একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। কারণ সব শোনার পর স্যাম তাকে বুঝিয়েছিল যে শবনম স্যামকে প্রপোজ করে, এবং তিতলির প্রেমে অন্ধ স্যাম তা রিফিউজ করে। তাই শবনম যে মিথ্যে কথা বলে তিতলির মন বিষিয়ে দেবেই এ তো দিনের আলোর মতন পরিষ্কার!

দত্তগুপ্ত বাড়ির ছাদে এসব কথাবার্তা নিয়ে আলোচনা করতে করতে সেদিন হাসি ঠাট্টায় ভেসে যাচ্ছিল বিশ্বচরাচর। তিনটি অবোধ বালিকার ওপর হালকা মিহি চাদরের মতন নেমে আসছিল শীতের হিমেল পরশ। কেউ দেখেনি সেদিন, খুব মিহি মখমলের মতন, গুঁড়ো অন্ধকারের মতন নেমে আসছিল তিনটি নৃত্যরতা রমণীর এক অবিশ্বাস্য ভয়াবহ নাচের সিল্যুয়েট। ধীরে ধীরে সেই তিনটি অন্ধকারের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি সিল্যুয়েট চাদরের মতোই তিনটি অপাপবিদ্ধ কন্যার গায়ে জড়িয়ে গেল, অমোঘ নিয়তির মতোই!

* * *

'তাহলে তন্ত্র বলতেই সবাই ভয়ংকর কিছু কেন বোঝে?' অতীশ মণ্ডলের কথাটা ফেলে দেওয়ার মতন না।

স্মিত হাসলেন মৈত্রমশাই, 'কারণ যে তন্ত্রকে আমরা আজ চিনি, তা আসলে ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া আর কিছু নয়, ওটা তন্ত্রের এক বিকৃত রূপ। তন্ত্র বলতেই লোকে মারণ উচাটন, অর্থাৎ খারাপ কিছু বোঝে। এই মারণ, উচাটন, বিদ্বেষন এসবকে বলা হয় কৃষ্ণ ষটকর্ম। এসব তন্ত্রের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ। এই কৃষ্ণ ষটকর্মের মতোই আছে শুক্ল ষটকর্মও, যেমন যজন, যাজন, অধ্যয়ন...'

'ইয়ে, যজন আর যাজন একই জিনিস না?' সংশয়কারী অনিন্দ্য ভুক্তের প্রশ্ন।

'না। যজন মানে নিজের জন্যে পূজা ও যাগযজ্ঞ, যাজন মানে অন্য কারো জন্যে পূজা ও যাগযজ্ঞ, যেখান থেকে যজমান শব্দটা এসেছে', মৈত্রমশাইয়ের হাসিটা কিন্তু অমলিন।

'সে কি? যজমান শব্দটা তান্ত্রিক নাকি?' চিন্তিত দেখায় অনিন্দ্য ভুক্তকে।

'শুধু যজমান কেন? বাঙালি জীবনের প্রতিটি ধর্মকেন্দ্রিক আচরণই আসলে তান্ত্রিক। ইষ্টদেবতা, যজমান, গুরুবাদ, মন্ত্রদান, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, সবই তান্ত্রিক অভ্যেস। আমরা বাঙালিরা এতই তান্ত্রিক বা তন্ত্রসভ্য জাতি যে আমরা নিজেরাই বুঝি না। আমরা ''সব কাজ পারি'' বোঝাতে গিয়ে কোন বাক্যবন্ধ ব্যবহার করি? বলি যে ''জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।'' খেয়াল করে দেখবেন, কখনো কিন্তু বেদপাঠের কথা বলি না।'

এতটা বলে একটু সময় নিলেন মৈত্রমশাই, তারপরে অমলিন হাসিমুখে শেষ অস্ত্রটি ছাড়েন, 'এমনকী যে সমস্ত দেব-দেবীর মূর্তি দেখেন, সবই তন্ত্রমতে কল্পিত, পৌরাণিক হিন্দুধর্মেই এর উৎপত্তি। সনাতন বৈদিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে এখনকার হিন্দুধর্মের মিল বড়ো অল্প। আমাদের সমস্ত পূজা ও সাধনপদ্ধতি, অর্ঘ্য অর্পণাদি, পূজামন্ত্র, সব কিছু তান্ত্রিকমতে হয়। ঘটস্থাপন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, চক্ষুদান, মূর্তির সামনে মেঝেতে যন্ত্র অঙ্কন, চারকাঠি বা ধ্বজস্তম্ভ স্থাপন, সবই তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি। এমনকী সরস্বতী পূজার ''জয় জয় দেবী চরাচরসারে'' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন ''পিনাকেতে লাগে টঙ্কার'', সেসবই আসলে তন্ত্রসংগীত।'

শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। শুধু সন্ধের অন্ধকারে ধরা গলায় প্রশ্ন করেন সমীরমোহন, 'এত যেসব বললেন, এ সবই মনগড়া নাকি ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কিছু।'

'অবশ্যই আছে', সন্ধ্যার অন্ধকারে চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠল মৈত্রমশাইয়ের, 'কিন্তু তার আগে আমার একটি মিনতি আছে দত্তগুপ্ত মশাইয়ের কাছে। আজ রাতটা কি আপনার বাড়িতে কাটাতে পারি?'

প্রস্তাবটা এতই আকস্মিক, যে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে গেলেন। নিজে যেচে নিমন্ত্রণ নেওয়ার মতন লোক তো মৈত্রমশাইকে মনে হচ্ছিল না।

তবে সামলে নিলেন প্রফেসর দত্তগুপ্ত, 'সে তো পরম সৌভাগ্য মৈত্রবাবু। মাধবের অতিথি মানে আপনি আমাদেরও অতিথি... আর আমাদের তো শাস্ত্রেই আছে...'

'সেজন্য নয়, আজ রাত থেকে কাল দুপুর পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে থাকা প্রয়োজন, আশু প্রয়োজন। আপনার পরিবারের ওপর ঘোর অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। ভয় পাবেন না, আমি বদ লোক নই।'

কথাটার মধ্যে কিছু একটা ছিল, এমন করে বললেন মৈত্রমশাই, যে কেউ আর দ্বিরুক্তি করতে পারল না। প্রফেসর দত্তগুপ্ত হেসে বললেন, 'আরে চলুন চলুন, অত কিন্তু কিন্তু করতে হবে না আমি লোক চিনি। অমঙ্গল হোক না হোক, একদিন অতিথিসেবা তো করতে পারব? তার ওপর আমার গিন্নি আবার লোক খাওয়াতে ভারি ভালোবাসেন। ওহে মাধব, মৈত্রমশাইয়ের টুকিটাকি যা লাগে একটু পরে দিয়ে যেও তো। চলুন মৈত্রমশাই, এই দিকে, আসুন...'

* * *

স্বর্ণালি আর রূপালি অনেক্ষণ হল বাড়ি চলে গেছে। ভারি ভালো মেয়ে, দিদিকে সাহায্য করবে বলে একপায়ে খাড়া, হাজার হোক একদিনের জন্যে একটা অ্যাডভেঞ্চার তো হবে ওদের। ওদিকে স্যামের সঙ্গেও কথা হয়ে গেছে। কাল দুপুর নাগাদ স্যাম আর ওর বন্ধুরা স্টেশনেই ওয়েট করবে, সেখান থেকে কালীঘাট। মা-বাবার কথা ভেবে একটু খারাপই লাগছিল তিতলির, কিন্তু সত্যিই স্যামকে ছাড়া ও আর থাকতে পারছে না। মা-বাবা বুঝবে নিশ্চয়ই... আর পড়াশোনা তো চালিয়ে যাবেই, সেটা তো আর ও ছাড়ছে না। স্যাম তো বললোই ওর মা স্কুল টিচার, এতে কী তিতলির মাধ্যমিক দিতে সুবিধাই কি হবে না? উফ্, আর একটামাত্র রাত। তিতলি প্রায় উড়েই বেড়াতে লাগল...

* * *

মৈত্রমশাই ঘুরে ঘুরে বইয়ের সংগ্রহ দেখছিলেন। এমন সময় তথাগত ঘরে ঢুকতে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন 'আপনার তো ঈর্ষণীয় বইয়ের সংগ্রহ মশাই।' একটু লজ্জাই পেলেন তথাগত, 'মাস্টারের বাড়ি তো। আসলে আমরা, মানে আমাদের পরিবারের কেউ কোনোদিন গুরুগিরি ছাড়া, বা শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কিছু করেননি। শিক্ষকতা আমাদের জাত ব্যবসা বলতে পারেন।'

সামান্য ভ্রুকুটি করলেন মৈত্রমশাই, 'সেক্ষেত্রে তো আপনাদের উপাধি আচার্য বা উপাধ্যায় হওয়া উচিত, মানে ভট্টাচার্য বা বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। অথচ আপনাদের উপাধি দত্তগুপ্ত। এর একটাই মানে হয় কিন্তু।'

'কী বলুন তো', কৌতূহলী হলেন তথাগত।

'আপনারা কোনো এক পর্যায়ে বৌদ্ধ ছিলেন।'

'কীরকম?'

'বাংলাদেশ তো সম্পূর্ণ বৌদ্ধদের ঘাঁটি ছিল। শঙ্করাচার্য যখন অদ্বৈতবাদ প্রচার করে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটালেন, তখন নবম কি দশম শতাব্দী। সেই সময়টা বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের সময়ও বটে। তারপর থেকে প্রচুর বৌদ্ধরা হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে থাকে। কিন্তু বর্ণাশ্রম প্রথা চিরকালই হিন্দুধর্মে প্রবল ছিল, তাই যেসব ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধ হয়ে গেছিলেন, তাঁদের ফের ব্রাহ্মণ করিয়ে ফেরত নেওয়া হল না, গুপ্ত ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য করিয়ে ফেরত নেওয়া হল।'

'অনেকটা ঠিকই ধরেছেন' সহাস্যে বলেন তথাগত, 'আমরা বৌদ্ধই ছিলাম। আমাদের এক পূর্বপুরুষ নাকি বিক্রমশীলা না নালন্দা কোথাকার অধ্যক্ষ ছিলেন, আমরা তাঁরই বংশধর' তারপর থেমে যোগ করেন, 'সেই থেকে আমাদের জাত ব্যবসা হল শিক্ষাদান আর বাড়ির ছেলেদের নাম সব ওইরকম। আমার ছেলের নাম শাক্য, আমার বাবার নাম ছিল সিদ্ধার্থ, ঠাকুরদার নাম ছিল বৈরোচন... আমাদের বাড়িতে তো একটা প্রাচীন পুঁথি আছে, তাতে আমাদের ফ্যামিলি লাইনের প্রায় গত এক হাজার বছরের সমস্ত পূর্বপুরুষদের নাম আছে, দাঁড়ান, এক্ষুনি আনছি' বলে সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে মেঝেতে বসলেন মৈত্রমশাই। তারপর পদ্মাসনে বসে ধ্যানস্থ হলেন। তিনি নিশ্চিত, যে একটি অপঘাত বা অমঙ্গলের কালো ছায়া এই পরিবারের ওপর নেমে এসেছে। এবং নেমে এসেছে সদ্য, এঁদের

অজান্তে। বিকেলে প্রফেসর দত্তগুপ্তকে দেখা মাত্র সেই আশঙ্কার কালোমেঘ নজরে পড়েছিল তাঁর। কোনো এক অতিশক্তিশালী তন্ত্রবিষ আশ্রয় নিয়েছে এখানে। বিনা রক্তপাতে সে বিদায় নেবে না, এবং সে কালনাগিনীর ছোবল নেমে আসতে দেরি নেই বিশেষ।

গুরু খুব সম্ভবত এর কথাই বলেছিলেন মৈত্রমশাইকে।

খানিকক্ষণ বাদে খুক খুক কাশির শব্দ শুনে চোখ খুললেন মৈত্রমশাই। বুঝতে অসুবিধা হল না, ভদ্রমহিলা এই বাড়ির গিন্নি, শ্রীমতী দত্তগুপ্ত। ভদ্রমহিলা গলবস্ত্র হয়ে ধরা গলায় ভয়ার্ত মুখে বললেন, 'নমস্কার ঠাকুরমশাই, আমি ঊর্মিমালা, এ বাড়ির বউ। আপনি যেন কী সব অমঙ্গলের কথা বলছিলেন? আমার উনি এসে বললেন। আমার তো শুনে থেকে ভয়ে বুক কাঁপছে।'

'ভয়েরই কথা বউদি। তবে চিন্তা করবেন না। অসম্ভব শক্তিশালী একটি তান্ত্রিক আধার আপনাদের অজানিতে এ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। রক্তপাত বা অপঘাত ছাড়া সে বিদায় নেবে না। তবে চিন্তা করবেন না, কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। একটা কথা মন দিয়ে বলুন তো, সদ্য নতুন কিছু কিনেছেন? নতুনও হতে পারে, পুরোনোও। অথবা কিছু পেয়েছেন, বা কিছু এসেছে আপনাদের বাড়িতে?'

'নতুন কিছু কেনা তো হয়নি', চিন্তায় ডুবে গেলেন দত্তগুপ্তগিন্নি, 'তবে কয়েক দিন আগে আমার চেনা একটি মেয়ে একটি ফলক দিয়ে যায় আমাকে, কোথাও একটা কুড়িয়ে পেয়েছিল। অদ্ভুত কিছু মূর্তি আঁকা, আর আলতা সিঁদুর দিয়ে লেপা। আমি তো কোনো দেবী ভেবে ঠাকুরঘরে রাখলাম...'

তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়ালেন মৈত্রমশাই, 'এক্ষুনি দেখান আমাকে সেই ফলক।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে এসে ঢোকেন তথাগত, উত্তেজিত গলায় বলেন, 'পেয়েছি মিস্টার মৈত্র, এই দেখুন। নামটা ভুলে গেছিলাম ওনার। নালন্দা নয়, আজ থেকে হাজার বছর আগে আমাদের এক পূর্বপুরুষ সোমপুরা মহাবিহারের অধ্যক্ষ বা স্থবির ছিলেন। আমরা তাঁরই বংশধর।'

'সোমপুরা মহাবিহারের মহাস্থবির? কি বলছেন প্রফেসর সাহেব? আপনাদের তো পুন্যবান বংশ তাহলে! নালন্দার পর সোমপুরা, ওদন্তপুরী, জগদ্দল, এই তিনটিই তো ছিল বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন ও প্রচারের পীঠস্থান। আর বালুরঘাট থেকে বেশি দূরেও নয় সে জায়গা।'

'জানি মিস্টার মৈত্র', তথাগত বলে ওঠেন 'জায়গাটা এখন বাংলাদেশে, নওগাঁওতে। এখন নাম পাহাড়পুর। এই বাড়ি থেকে পাহাড়পুর অবধি সোজা রাস্তা থাকলে দেড় থেকে দু-ঘন্টার বেশি লাগার কথা না। খুব সম্ভবত তাই আমাদের সেই পূর্বপুরুষের কয়েক জেনারেশন বাদে কেউ এসে বালুরঘাটে বসতি স্থাপন করেন। আমরা বালুরঘাটে আছি কম সে কম পাঁচ-শো বছর, বেশি বই কম নয়। তবে একটা কথা বলতেই হবে, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস নিয়ে আপনার পড়াশোনা কিন্তু ঈর্ষনীয়।'

মৃদু হাসলেন মৈত্রমশাই, 'তন্ত্র জানতে গেলে তো বৌদ্ধধর্ম জানতেই হবে প্রফেসর সাহেব। তন্ত্রের যে বর্তমান চেহারা আমরা বুঝি বা জানি, তার উদ্ভবই তো বৌদ্ধধর্ম তথা বৌদ্ধতন্ত্র থেকে। আচ্ছা, এখন চলুন দেখি বউদি কী সব ফলক পেয়েছেন। আমার মনে হয় একটি অসামান্য দৈবশক্তিসম্পন্ন কোনো তান্ত্রিক আধার আপনাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। সাধারণভাবে তাকে নাড়াচাড়ার অর্থ সাক্ষাৎ মৃত্যুকে আহ্বান করা। যদি আমার আশঙ্কা ঠিক হয়, কয়েকটা জিনিস কিন্তু আমাকে আনিয়ে দিতেই হবে প্রফেসর সাহেব, যত রাতই হোক, যেখান থেকে খুশি হোক।'

'আচ্ছা কী কী লাগবে বলে দেবেন একটু। একেবারে অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হয়ে যাবে', প্রফেসর সাহেবের গলায় উদ্বেগটা নজর এড়ায় না কারোরই।

'আর আপনার সেই পূর্বপুরুষের নাম কী? যিনি সোমপুরা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন?'

'মহাস্থবির রত্নাকরশান্তি।'

* * *

ফলকটা হাতে নিয়ে আরক্তমুখে বসে ছিলেন মৈত্রমশাই। তাঁর মুখের ওপর একই সঙ্গে খেলা করে যাচ্ছিল ভয় এবং উদ্বেগ। তাঁর পাশে চুপ করে বসেছিলেন তথাগত এবং ঊর্মিমালা।

ফলকটা দেখেই চমকে উঠেছিলেন তিনি। ঊর্মিমালার মনে হয়েছিল যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন এক বার কেঁপে উঠলেন মৈত্রমশাই, একদম সিধে হয়ে গেলেন। তারপর খুব সাবধানে, যেন বিষাক্ত কিছু নাড়াচাড়া করছেন এমনভাবে লাল চেলিতে ফলকটি হাতে নিয়ে বৈঠকখানায় এসে অনেক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বিড়বিড় করতে করতে সারা ফলকটাকে ছুঁয়ে দেখলেন। কিছুক্ষণ পর দৃঢ়স্বরে বললেন, 'কতগুলো জিনিস একটু আনিয়ে দিতে হবে প্রফেসর সাহেব, বেশি সময় নেই। খুব সম্ভবত পরের বারো ঘন্টার মধ্যেই আপনাদের ওপর একটা বিশাল ফাঁড়া আসতে চলেছে। দেখি কতদূর কী করা যায়।' এই বলে একটি কাগজে কিছু লিখে দিলেন। প্রফেসর সাহেব তৈরিই ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে দিয়ে এসে মৈত্রমশাইয়ের পাশে গিন্নিকে নিয়ে উদ্বিগ্নমুখে বসলেন, 'এইবার যে সব কিছু খুলে বলতে হচ্ছে মিস্টার মৈত্র। এ কীসের ফলক, কীসের ভয়, কোন অমঙ্গল আশঙ্কা। আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কারো কোনো ক্ষতি করিনি, আমরা যখন পেরেছি লোকের সাহায্য করেছি। আমাদের তো এসব ঝামেলার মধ্যে পড়ার কথাও নয়।'

খানিকক্ষণ চোখ বুজে থাকার পর মৈত্রমশাই শুরু করলেন,

'প্রারব্ধ বোঝেন প্রফেসরসাহেব? খুব সম্ভবত প্রাচীন কোনো ঘটনাচক্রের ফলে এই প্রচণ্ড শক্তিশালী তন্ত্রফলকটি আপনাদের কাছে ফিরে এসেছে। তবে আজ রাতটাই। আজ রাতেই আমি এঁর যথাবিহিত পূজা সংস্কার করব, কাল সকালে বা দুপুরে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আসব। এ জিনিস লোকারণ্যে থাকা ঠিক না।'

'কিন্তু এটা কীসের ফলক ঠাকুরমশাই। মূর্তিগুলো কার?'

খানিক্ষণের নৈঃশব্দ্য, তারপর ধীরস্বরে বলতে লাগলেন তিনি, 'বলতে গেলে তো অনেক কথাই বলতে হয় প্রফেসরসাহেব, তবে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বলছি। ভগবান গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের এক-শো বছরের মধ্যে বৌদ্ধসংঘে বিবাদ শুরু হয়। পরের চার-শো বছরের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম দুই ভাগ হয়ে যায়, স্থবিরবাদ বা থেরবাদ বা হীনযান এবং মহাসাংঘিক বা মহাযান।

হীনযান ও মহাযানের মধ্যে দর্শনের পার্থক্য বলতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে, অত সময় আমাদের নেই। হীনযানীরা বুদ্ধের আসল মতবাদ আঁকড়ে রইল। মহাযানীরা বুদ্ধকে লোকোত্তর বলে তাঁকে পূজা করা শুরু করল, নিয়ে এল স্বর্গ নরক, পূজা অর্চনা, ক্রিয়া কাণ্ড ইত্যাদি। এবং তারা শুরু করল আরও একটা জিনিস, মূর্তিপূজা। ভারতবর্ষে মূর্তিপূজার উদ্ভব বৌদ্ধদের হাত ধরেই।'

'কথাটা অবশ্য ঠিক বৈদিক হিন্দুধর্মে যাগযজ্ঞ ছাড়া আর কোনো পূজাবিধির উল্লেখ নেই। মূর্তিপূজার তো নেই-ই', তথাগত সমর্থন করেন।

'ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম যখন তিব্বতে ঢুকল পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ, তখন সেখানকার স্থানীয় বন উপজাতিদের সঙ্গে অনেক লড়াই ও আপোষের পর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম এক সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিল, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বা বজ্রযান। তাতে মূর্তিপূজা আর মন্ত্রতন্ত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় শুরু হল, তার জায়গা নিল মন্ত্রযান। বৌদ্ধধর্মের সমস্ত উচ্চ আদর্শ ও ভাব নীতি, যেমন চারটি আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পঞ্চশীল বা অষ্টশীল পালন এসব জলাঞ্জলি দিয়ে প্রধান হয়ে উঠল গুরুবাদ, ভূতপ্রেতাদির পূজা, যন্ত্রমন্ত্র মণ্ডল ইত্যাদি। এবং জেনে আশ্চর্য হবেন যে এই মহাযানের বাড়বাড়ন্ত থেকে মন্ত্রযান বা বজ্রযানে অবনতি, পুরো ঘটনাটা ঘটার মধ্যে বাঙালিদের খুব বড়ো ভূমিকা ছিল। পালরাজাদের সময়েই মহাযানপন্থার বাড়বাড়ন্ত, এই সোমপুরা মহাবিহারও সম্রাট দেবপালের তৈরি। পূর্ব বিহার অর্থাৎ অঙ্গ থেকে চট্টগ্রাম অর্থাৎ হরিকেল অবধি, প্রাগজ্যোতিষপুর মানে আসাম থেকে তাম্রলিপ্ত, মানে তমলুক সমস্ত এলাকাটাই তখন বৌদ্ধ, তখন অবশ্য এই মধ্যবর্তী এলাকাটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল, যেমন পৌণ্ড্রবর্ধন,

সুহ্ম, সমতট বা বঙ্গ ইত্যাদি। তা সব মিলিয়ে সমস্ত বাংলাদেশে তখন বজ্রযান তথা মন্ত্রযানের রাজরাজত্ব। তারপর কালের নিয়মে আদি শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটালেন, পালবংশ সরিয়ে শাসন ক্ষমতায় এলেন ‘‘কর্ণাটকদেশাগত ব্রহ্মক্ষত্রিয়’’ সেনরাজবংশ। বৌদ্ধধর্মের গৌরবসূর্য ভাগীরথীর তীরে অস্তমিত হল।’

‘কেন? সেনরাজবংশ কী করল?’ সংশয় ঊর্মিমালার গলায়।

‘সেনরাজবংশ ছিল কট্টর হিন্দু। তারা সমস্ত বৌদ্ধ বিহারকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিল। উচ্চপদে বৌদ্ধদের নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেল। একে আদর্শের অবক্ষয়, তার ওপর রাজা যদি বিরূপ হন, কোন ধর্মই বা টিকে থাকতে পারে বলুন? যাই হোক, এই পালরাজাদের শাসনের একদম শেষ দিকে, দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বজ্রযান থেকে আরও একটি নতুন ধারার উদ্ভব ঘটে, সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম। এদের প্রচারক ছিলেন সিদ্ধাচার্যরা। এঁরা মানুষের মধ্যে থেকে সহজ ভাষায় জনসাধারণকে উপদেশ দিতেন। চর্যাপদের নিশ্চয়ই নাম জানেন, মানে বাংলা ভাষার প্রথম বই, সেইটিও এঁদেরই লেখা। বাংলাভাষার উদ্ভবও এই সময়েই। বৌদ্ধ ইতিহাস মতে, এই সিদ্ধাচার্যরা সংখ্যায় ছিলেন চুরাশি।’

এতটা বলে একটু জল খেলেন মৈত্রমশাই। ততক্ষণে তথাগতর পাঠানো ছেলেরা লিখে দেওয়া যাবতীয় উপচার নিয়ে ফিরে এসেছে। সেইগুলো রেখে ফিরে এলেন গিন্নিমা, ‘তারপর?’

‘এই চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য বড়ো আশ্চর্যজনক লোক ছিলেন। এঁরা থাকতেন খুব সাদাসিদেভাবে এবং কিছুক্ষেত্রে ভারি বিচিত্র জীবিকা পালন করতেন, যেমন দ্বারিকপা বলে একজন ছিলেন, তিনি বেশ্যার দারোয়ান ছিলেন, শবরিপা ছিলেন ব্যাধ বা শিকারি। মজার কথা এই যে, এঁরা প্রত্যকেই কিন্তু অসামান্য এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এই চুরাশি জনের মধ্যে চার জন ছিলেন মহিলা। তাঁদের নাম মণিভদ্রা, লক্ষ্মীঙ্করা এবং মেখলা ও কনখলা নামের দুই বোন। এই চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের সবার নামেই চমৎকার সব গল্প প্রচলিত আছে, তবে সবচেয়ে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য বোধ হয় মেখলা ও কনখলা নামে দুই বোনের নামে প্রচলিত ঘটনাটি।’

এতটা বলে থামলেন মৈত্রমশাই। তারপর বললেন ‘হয়তো একটু জটিল বা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনাদের জানা দরকার বলেই বলছি। আমাদের হিন্দুদের অনেক দেব-দেবী বৌদ্ধদের থেকে সরাসরি নেওয়া। বৌদ্ধ দেবতাদের উৎপত্তির কিন্তু সুন্দর সূত্র বা প্রথা আছে, হিন্দুদের মতন এলোমেলো ভাবে কোনো দেবতার উৎপত্তি ঘটেনি বৌদ্ধধর্মে। বৌদ্ধমতে আদিবুদ্ধ থেকে পাঁচ জন ধ্যানীবুদ্ধের উদ্ভব। এই পাঁচ জনের প্রত্যেকের সঙ্গে আবার এক জন করে শক্তি এবং বোধিসত্ত্ব আছেন। এইভাবে সমস্ত বৌদ্ধ দেব-দেবীদের কোনো-না-কোনো ধ্যানীবুদ্ধকুলের অন্তর্গত করা যায়।

আরেকটা কথা, বেশিরভাগ বৌদ্ধ দেব-দেবীই বড়ো ভয়ংকর এবং উগ্রচণ্ডা, শান্তশিষ্ট দেব-দেবী হিন্দুধর্মেই বেশি। একেকজন বৌদ্ধ দেব বা দেবীর রূপবর্ণনা শুনলে অবধি ভয় করে, সামনে উপস্থিত হলে কি হবে জানা নেই। সেই থেকে তান্ত্রিক দেব-দেবী মাত্রেই তার রূপ ভয়ংকর।’

একটু জল খেলেন মৈত্রমশাই, খানিকক্ষণ থেমে তারপর ফের শুরু করলেন,

‘এইরকম এক ধ্যানীবুদ্ধ হলেন অক্ষোভ্য। ইনি পূর্ব দিকের অধিপতি এবং সমস্ত কটু মানে কষাটে স্বাদ এঁর থেকে উৎপন্ন হয়। এঁর এবং এঁর কুলের সমস্ত দেব-দেবীদের রং হল নীল এবং এঁর শক্তির নাম মামকী। এই অক্ষোভ্যকুলেই আছেন বৌদ্ধতন্ত্রের সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় দেবতা হেরুক, একইসঙ্গে সবচেয়ে সাংঘাতিক দেবতাও বটে। হেরুকের চার জন শক্তি, এবং চার জনের সঙ্গে যুগনদ্ধ অবস্থায় এঁর চার রূপ, এবং চার নাম। এই চার শক্তির মধ্যে সবাই উগ্রস্বভাবা এবং প্রাণহন্তারক বটে, তবে ভয়ংকরতমা হলেন যিনি তাঁর নাম দেবী বজ্রযোগিনী। ইনি বৌদ্ধতান্ত্রিকদের সর্বোচ্চ আরাধ্যা দেবী, ইনি ডাকিনীদের অধিষ্ঠাত্রী, প্রজ্ঞা ও ধ্বংসের দেবী, সাক্ষাৎ উগ্রকালস্বরূপিনী। এই দেবী বজ্রযোগিনীরই আরও একটি উগ্রতর রূপ আছে, বজ্রবারাহী। এঁদের পূজা ভয়ানক কঠিন, এবং বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিতে সাধকের প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়।’

এতটা বলে একটু দম নিলেন মৈত্রমশাই। ঊর্মিমালার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন পূজার আয়োজন করতে, অতসীকে বলেছেন আজ রাতে থেকে ওঁকে সাহায্য করে যেতে। একটু পরে ফিরে এলেন, 'তারপর ঠাকুরমশাই?'

কী যেন ভাবছিলেন মৈত্রমশাই। আস্তে আস্তে তাঁর সমস্ত স্নায়ু সজাগ হয়ে আসছিল, তিনি বুঝতে পারছিলেন উল্কার মতন খুব দ্রুত এক অভিশাপ বিষ নেমে আসছে। সমস্ত রোম খাড়া হয়ে উঠছে তাঁর। যুদ্ধ আসন্ন, এবং এ বড়ো সহজ যুদ্ধ নয়। তিনি জানেন, গুরু তাইই বলেছিলেন তাঁকে। গুরুর গোপন আদেশেই তাঁর এদিকে আসা। এতদিন ধরে খুঁজে খুঁজে অবশেষে বোধ হয় দৈবাৎ তিনি সেই জিনিসটির খোঁজ পেলেন!

ঊর্মিমালার স্বরে সংবিৎ ফিরে পান তিনি, তারপর সমস্ত ইন্দ্রিয়কোষগুলিকে সজাগ করে বলতে থাকেন, 'মেখলা ও কনখলার কাহিনিটি বড়ো চিত্তাকর্ষক। দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে দেবীপট্ট নামক এক জায়গায় এক গৃহস্থের মেখলা ও কনখলা নামের দুটি মেয়ে ছিল, মেখলা বয়সে ছিল বড়ো, দু-বছরের। বিয়ের বয়েস হলে তাদের বাবা এক সম্পন্ন ব্যবসায়ীর দুই ছেলের সঙ্গে তাদের বিয়ে তো দিলেন। কিন্তু তাদের বিবাহিত জীবন ছিল খুবই অভিশপ্ত, বড়ো ছেলেটি ছিল বিকৃতকামী এবং ছোটো ছেলেটি ছিল বিবাহিত জীবনে উদাসীন। ফলে যা হয়, দুই বোনের বিবাহিত জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। এরপর যা হয়, এসব কথা পল্লবিত হয়ে পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে পৌঁছয় এবং তাদের নিয়ে গুজব ছড়াতে থাকে। ফলে ঘরে-বাইরে তাদের বেঁচে থাকা দুষ্কর হয়ে ওঠে। একদিন দুই বোন তাদের বাড়িতে বসে নিজেদের দুঃখের কথা বলাবলি করছে, এমন সময় সিদ্ধাচার্য কাহ্নপা বা কৃষ্ণাচার্য সেখান দিয়ে নিজের সাত-শো ডাক ও ডাকিনী নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে দুই বোনের বড়ো ভক্তি হল, তারা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে গুরু কাহ্নপার শরণ নিয়ে তাদের সংসারে বীতরাগের কথা জানাল। কাহ্নপা তখন দুইজনকে বজ্রবারাহী মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন এবং নির্জনে গিয়ে সেই মন্ত্রের সাধনা করতে বললেন।'

'ওদের বাড়ির লোক কেউ খুঁজল না?' ঊর্মিমালার গলায় স্পষ্টতই উৎকণ্ঠা।

'বউদি, বাড়ির বউ বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে উধাও হয়ে গেলে এখনও, এই আধুনিক কালেও কি আমরা সেই হতভাগীকে ত্যাজ্য করে দিই না? আর এ তো প্রাচীনকালের ঘটনা', মৃদু হাসেন মৈত্রমশাই।

দুই বোন জঙ্গলে গিয়ে দীর্ঘ বারো বছর ধরে বজ্রবারাহী মন্ত্রে সাধনা করে প্রচুর অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হয়। তারপর একদিন তাদের ইচ্ছা হয় গুরুর সঙ্গে দেখা করার। খুঁজতে খুঁজতে তারা বাংলাদেশে হেমদল নামের এক জায়গায় এসে গুরুর দেখা পায়। কিন্তু তখন তারা আর সেই যুবতী বউ দুটি নেই, মধ্যবয়সি রুক্ষমূর্তি শুষ্কপ্রায় দুই সাধিকা, কাহ্নপা তাদের চিনতে অস্বীকার করেন।

তখন দুই বোন গুরুকে নিজেদের পুরোনো কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহনের কথা বলেন। তখন কাহ্নপা বলেন, যদি শিষ্যত্বই তারা নিয়ে থাকে, তবে গুরুদক্ষিণা কই? বনচারী কপর্দকহীন দুই বোন জানায় গুরু কী দক্ষিণা চান? কাহ্নপা বলেন, তাঁর দুই বোনের মুণ্ডু চাই!'

'এ তো সেই শকুন্তলা আর একলব্যের গল্পের মিশেল, মিস্টার মৈত্র', আশ্চর্য শোনায় দর্শনের অধ্যাপকটির গলা।

একটু থামেন মৈত্রমশাই, তারপর বলেন, 'তা বটে, তবে এর পরের কাহিনিটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের এবং এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি, মন দিয়ে শুনবেন। এই কথা শোনামাত্র দুই বোন নিজেদের মুখের মধ্যে থেকে তীব্র আলোকময় তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা খড়্গ বার করে নিজেদের মুণ্ড কেটে ফেলে এবং গুরুকে ভেট দেয়। এবং তারপরেই তাদের ধড় দুটি শুরু করে এক অপার্থিব, অলৌকিক নাচ, সেই নাচ বিশ্বচরাচরে আর কেউ কোনোদিন দেখেনি। নাচতে নাচতে তাদের দেহ এক মায়াবী নীল আলোর মধ্যে উঠে যায় উর্ধ্বাকাশে, ডাকিনীদের মধ্যে। ডাকিনীরাও তাদের দেখে উত্তেজিত হয়ে নিজেদের মুণ্ডচ্ছেদন শুরু করে দেয়, তারাও শুরু করে সেই স্বর্গ মর্ত্য পাতাল মথিত করা নাচ। সৃষ্টি রসাতলে যায় যায় প্রায়।'

বলে থেমে যান মৈত্রমশাই, এই শীতেও ঘাম জমেছে ওঁর মুখে, স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন আরেকজনও। ঈষৎ কাঁপা গলায় ঊর্মিমালা জিজ্ঞেস করেন, 'তারপর? তারপর কী হল?'

'তারপর, অবশেষে দেবী বজ্রবারাহী স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ডাকিনীদের নিরস্ত করেন, এবং নিজের হাতে নিজের মুণ্ডচ্ছেদ করে নাচ শুরু করেন। তাঁর সেই কাটা গর্দান থেকে রক্তধারা উপচে পড়ে দুই ডাকিনীর মুখে, বজ্রবৈরোণি এবং বজ্রবর্ণিনী। এরপর গুরু কাহ্নপা নিজের হাত বাড়িয়ে দুই শিষ্যার মাথায় তাদের কাটামুণ্ড জুড়ে দেন এবং তাঁদের সিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। এর পর বেশ কিছু বছর অশেষ লোকহিত করে দুই বোন খেচরে, অর্থাৎ ডাকিনীদের স্বর্গে যান।'

এতটা বলে ফলকটা দু-জনের চোখের সামনে তুলে ধরেন মৈত্রমশাই, উত্তেজনায় তাঁর গলা তখন থরথর করে কাঁপছে 'ভালো করে দেখুন আপনারা, দুই নাচতে থাকা বোনকে দেখতে পাচ্ছেন? নিজেদের মাথা কাটতে উদ্যত! নীচে পদ্মাসনে বসে আছেন গুরু কাহ্নপা বা কৃষ্ণাচার্য। ওপর থেকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন দেবী বজ্রবারাহী।'

'তার মানে...' কথার খেই হারিয়ে যায় ঊর্মিমালার...

'এ কোনো অর্বাচীন জিনিস নয় বউদি, এটি একটি কম করে হাজার বছরের পুরোনো বৌদ্ধতন্ত্রফলক। দেবী বজ্রবারাহীর আরাধনার জন্যে, তাঁকে আহ্বান করার জন্যে এর সৃষ্টি। কোনো অতিলৌকিক প্রতিভার অধিকারী সাধক এর সৃষ্টিকর্তা। এর ইতিহাস অদ্ভুত, ক্ষমতা অসামান্য। এবং এরই মধ্যে এক সুপ্ত অভিশাপ লুকিয়ে আছে। খুব সম্ভবত কোনো শক্তিশালী পুরুষ এই ফলককে অভিশাপ দেন।'

ভয়ে ঊর্মিমালার মুখ বিবর্ণ হয়ে আসে, 'তাহলে? কী উপায় ঠাকুরমশাই?'

'আমি আজ সারারাত তন্ত্রমতে দেবীর আরাধনা করব, তাঁকে প্রসন্ন করে সেই প্রাচীন অভিশাপটিকে প্রশমিত করব। যতক্ষণ পূজা চলবে, কারও বাইরে থাকার দরকার নেই। পূজা শেষ হলে, যত রাতই হোক আমি একে নিয়ে চলে যাব, আমার গুরুর আদেশ আছে। আমার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না, জগন্মাতার আদেশ হলে আমাদের আবার দেখা হবে।'

'কিন্তু ইনি তো বৌদ্ধ দেবী বললেন। আপনি হিন্দু ব্রাহ্মণ, আপনি কী করে...' তথাগতর কথাটা মাঝপথেই থেমে যায়।

শান্তস্বরে বললেন মৈত্রমশাই, 'আপনি বোধ হয় কাহিনির পুরোটা শোনেননি, তাই না? শেষ দিকটা মনে আছে? ''অবশেষে দেবী বজ্রবারাহী নিজে আবির্ভূত হয়ে ডাকিনীদের নিরস্ত করেন, এবং নিজের হাতে নিজের মুণ্ডচ্ছেদ করে নাচ শুরু করেন। তাঁর সেই কাটা গর্দান থেকে রক্তধারা উপচে পড়ে দুই ডাকিনীর মুখে, বজ্রবৈরোণি এবং বজ্রবর্ণিনী।'' বজ্রবারাহীর এই রূপের নাম হল ছিন্নমুণ্ডা। বুঝলেন কিছু?'

তথাগতর ঠোঁট দুটো নড়তে গিয়েও থেমে যায়।

গাঢ়স্বরে মৈত্রমশাই বলেন, 'দেবী বজ্রবারাবীর ছিন্নমুণ্ডা রূপের সঙ্গে মিলিয়ে কোনো হিন্দু দেবীর কথা মনে পড়ে প্রফেসরসাহেব?'

তথাগত নয়, ফিসফিস করে উত্তর দেন ঊর্মিমালা, 'দেবী ছিন্নমস্তা!'

'হ্যাঁ বউদি', ধীর এবং শান্ত স্বরে বলেন মৈত্রমশাই, 'বৌদ্ধদের দেবী বজ্রবারাহীই আসলে হিন্দুধর্মের দেবী ছিন্নমস্তা।'

নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অতসী এসে তামার থালায় করে পূজার যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে এল। সেইসব বাড়ির পেছনে বাগানে নিয়ে যেতে বললেন মৈত্রমশাই। সেখানে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে রাখা আছে আগে থেকেই। সেদিকে যাবার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময়ে ঊর্মিমালা বললেন, 'ভালো করে পুজো করবেন ঠাকুরমশাই, আপনার যেন কোনো অমঙ্গল না হয়।'

যেতে যেতে কথাটা শুনে থেমে গেলেন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, তারপর ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়ালেন। ঊর্মিমালার চোখে চোখ রেখে শান্তস্বরে বললেন, ‘যদি বলতেন যেন আপনাদের কোনো অমঙ্গল না হয় সেটা দেখতে, তো বুঝতাম। হঠাৎ আমার অমঙ্গল নিয়ে আপনি চিন্তিত হলেন কেন? আমাকে তো কেউ ডেকে আনেনি বউদি, আমি তো নিজেই এসেছি। বিপদ তো আপনাদের, আপনি আমার জন্যে উতলা হলেন কেন? পুরোহিতের দায়িত্ব যজমানের ভালো মন্দ ভাবার কথা, উলটো হওয়ার তো কথা নয়। এখানে যজমান পুরোহিতের কথা ভাবছে কেন?’

‘বিপদ বুঝে নিজে এগিয়ে এসেছেন, আপনি আমাদের কেউ নন তা জানি। তা অন্যের বিপদের কথা শুনে আজকের দিনে ক-জনই বা সাহায্য করতে আসে বলুন? আর আপনারও তো ঘর আছে, সংসার আছে। আর আমাদের সাহায্য করতে গিয়ে আপনার খারাপ কিছু হলে তাদের কী হবে?’

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মৈত্রমশাই, তারপর মৃদু হেসে বললেন, ‘এইখানেই, এই মুহূর্তেই আপনি জিতে গেলেন বউদি। যার মনে সবার জন্য এত দয়া, এত করুণা, কোনো অভিশাপ তার কী করবে? চিন্তা করবেন না বউদি। আমি, নবদ্বীপের মহেশ্বর মৈত্রের জ্যেষ্ঠ সন্তান কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, কথা দিচ্ছি এ অভিশাপ আপনাদের ছুঁতে পারবে না। উদ্বেগে ফেলবে, কিন্তু কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর এই সর্বভূতে দয়ার ভাবটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন বউদি, মনে রাখবেন ভালোবাসাই হল সবচেয়ে বড়ো তন্ত্র, সবচেয়ে বড়ো জাদু।’

* * *

এক গভীর ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছিল তিতলি। যেন এক মহাশূন্যে সে ভেসে বেড়াচ্ছে, কোনো অবলম্বন নেই, কোনো দিশা নেই, কোনো গভীরতার বোধ নেই। সেই দিকহীন, প্রাণহীন, শব্দহীন, আলোহীন অন্ধকারে সে একলা ভেসে চলেছে। তার নিজের কোনো বোধ নেই, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর কোনো দখল নেই, শুধু তার জাগ্রত চৈতন্য যেন অনুভব করছে যে সে বেঁচে আছে। এমন সময় সেই মহতী অন্ধকারই যেন জমাট বাঁধতে শুরু করল, প্রথমে ধীরে এবং তারপর দ্রুত। শেষে তিনটি জায়গায় তিনটি জমাট অন্ধকার যেন তিনটি মানুষের আকৃতি নিল।

না, মানুষের নয়, মানুষীর। এবং তাদের মাথা নেই, শুধু ধড় তিনটি আছে। আস্তে আস্তে সেই তিনটি প্রাণহীন ধড়ে প্রাণের সঞ্চার হল। তারপর তারা শুরু করল এক অলৌকিক অপার্থিব যৌথনৃত্য। সমগ্র অন্ধকারের সমুদ্র যেন শিউড়ে উঠল সেই নাচ দেখে। রাত্রির প্রতিটি গ্রন্থিতে যেন ভেসে উঠল কান্না, তিনটি অবোধ শিশুর কান্না। তিতলির বুকটা যেন কোন এক অব্যক্ত ব্যথায় মুচড়ে উঠতে লাগল, যেন কোনো এক প্রাচীন অসহায় ফোঁপানির শব্দ আস্তে আস্তে কুরে কুরে খেতে লাগল তার চৈতন্য। মনে হল সেই কান্না, সেই ফোঁপানি, সেই অসহায় আর্তি যেন খেয়ে ফেলতে চাইছে তার সমগ্র সত্তা। কারা যেন কেঁদে কেঁদে বলছে ‘ফিরিয়ে দাও, আমাদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দাও। ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাদের মায়ের কাছে নিয়ে চল।’ সেই কান্নায়, আর্তিতে আস্তে আস্তে যেন দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগল তিতলির। মনে হল যেন সেই অন্ধকার হাহাকার সমুদ্রে যেন ডুবে যাচ্ছে তিতলি। সে চেষ্টা করছে হাত-পা ছুঁড়ে উদ্ধার পাওয়ার, কিন্তু কিছুই সে নাড়াতে পারছে না। তার বোধবুদ্ধি চৈতন্য সমস্তটার ওপর শ্বাসরোধী এক পর্দা নেমে আসছে যেন, তিতলি চাইছে চিৎকার করে উঠতে, হাহাকার করে উঠতে, চেঁচিয়ে উঠতে, কিন্তু তার কোনো ইন্দ্রিয়ই আজ আর তার বশে নেই। চোখের সামনে নেমে আসছে এক কালো পর্দা, নেমে আসছে অমোঘ মৃত্যু, নেমে আসছে, নেমে আসছে, নেমে আসছে...

সেই চূড়ান্ত মৃত্যুর মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই যেন সব কিছু থমকে দাঁড়াল এক বার। কোনো এক অনির্দেশ্য বিন্দু থেকে উদাত্ত এবং গম্ভীর কণ্ঠে ভেসে আসছে এক পুরুষের গলা,

‘ওঁ প্রত্যালীঢ় পদাম সদেব ধরিতীম ছিন্নম শিরা কর্তুকাম। দীঘবস্ত্রাম্ স্বকবন্ধ শোণিতসুধা ধরম পিবতীন মুদা। নাগবদ্ধ শিরোমণি ত্রিনয়ণাম্ হৃদ্যু তপালাম কৃতম্। রত্যাসক্ত মনোভব পরিদ্রধান ধ্যায়েৎ।’

ধীরে ধীরে তিতলির চেতনায় সাড় ফিরে আসতে লাগল। স্তিমিত হয়ে এল অন্ধকারের সেই আর্তনাদ। তিতলির মনে হল যেন এক পাতালপুরীর আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়ে সে দ্রুত উঠে আসছে ওপরে, আলোর দিকে। আস্তে আস্তে সমস্ত অন্ধকার কেটে যাচ্ছিল। আলোয়, আশায়, আনন্দে ভরে উঠছিল তিতলির চৈতন্যের প্রতিটি কোণ। আলোর সেই উৎসে পৌঁছোনোর আগে সেই গম্ভীর পুরুষকণ্ঠটি শেষ বারের মতন শুনল তিতলি ‘শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা’... আর তার পরেই আলো আলো আলো...

হাঁপাতে হাঁপাতে বিছানার ওপর উঠে বসল তিতলি। কী সর্বনাশা ভয়ংকর স্বপ্ন, বাপরে! আর ও ঘুমিয়ে পড়েছিল কোন আক্কেলে? ভাগ্যিস ঘুমটা ভাঙল, নইলে সমস্ত প্ল্যান চৌপট হয়ে যাচ্ছিল আর কী! কাল রাতে কোনো এক পুরুতমশাই নাকি এসেছিলেন কীসব পুজো টুজো করতে, সেই দেখে তো তিতলি আর বেশি কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি দোতলাতে ওর ঘরে চলে এল। ঝিমোতে ঝিমোতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে! কী ভাগ্যিস ঘুমটা ভেঙে গেল।

মোবাইল স্ক্রিন অন করল তিতলি, ভোর পাঁচটা। যাক একদম ঠিক সময়ে উঠেছে ও। চটপট রেডি হয়ে নিল। শীতের সকাল, গরম জামাকাপড় গায়ে চড়াল কিছু। ব্যাগ তো তৈরিই ছিল, সেসব নিয়ে সাবধানে, অতি ধীরে নীচে নেমে এল তিতলি। যাক, সব্বাই মড়ার মতন ঘুমোচ্ছে। অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে এসেই দ্রুত হাঁটা শুরু করল ও। মোড়ের মাথায় আসতেই আরও দুই মূর্তি। কোনো কথা না বলে দ্রুত রিকশা স্ট্যান্ডের দিকে হাঁটা মারল তারা। সকালের প্রথম ট্রেন ভোর ছ-টায়।

* * *

ঘুম থেকে উঠতে দেরিই হয়েছিল তথাগতর। যত রাত গড়িয়েছে আরও গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেছিলেন তিনি। এমন অথই ঘুম বহুদিন হয়নি ওঁর। ঘুম ভাঙল ঊর্মিমালার ধাক্কাধাক্কিতে। উঠেই চোখ কুঁচকে ফেললেন তিনি, ইস, এত বেলা হয়ে গেছে...

‘কী হয়েছে? ধাক্কাচ্ছ কেন?’

‘ঠাকুরমশাই নেই, ফলকটাও নেই’, হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন ঊর্মিমালা।

‘তো তাতে হাঁপাচ্ছ কেন? উনি তো বলেইছিলেন যে ফলকটা নিয়ে যাবেন গঙ্গায় ফেলে আসতে, সে যত রাতই হোক। একেবারে সেখানেই গেছেন হয়তো, আমাদের ডাকবেন না, সে তো বলেই গেছিলেন। আমি বরং একবার মাধবদের বাড়িতে খোঁজ করে দেখছি।’

আর্তনাদ করে ওঠেন ঊর্মিমালা, ‘ওগো সর্বনাশ হয়ে গেছে। সকাল থেকে তিতলিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ও বাড়ির সোনাই রূপাইও নেই। তোমার ভাইকে ফোন করলাম, সেখানেও নেই। তিতলি একটা চিঠি লিখে গেছে দেখ’ বলে একটা চিঠি ফেলে দিলেন তথাগতর কোলে।

চিঠিটা পড়তে পড়তে ভয়, উদ্বেগ আর আশঙ্কায় তথাগতর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। দ্রুত উঠে পড়েন তিনি। এই মুহূর্তেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

সর্বনাশ আসবে বলে তৈরিই ছিলেন প্রফেসর তথাগত দত্তগুপ্ত। কিন্তু একচক্ষু হরিণের মতন বিপদটা এল সম্পূর্ণ অন্যদিক দিয়ে, এলও বড়োই দ্রুত। এবং এ বিপদ মহাবিপদ, ঘোর বিপদ।

বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দেওয়ার সময় বুঝলেন তথাগত, আশঙ্কায় তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছে। থরথর করে।

* * *

শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে যেদিকটা পায়খানা পেচ্ছাপে, বৈঠকখানা বাজারের নোংরায়, মরা বিড়ালের ছানা, ভাঙা মাটির ভাঁড়, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আর চোলাইয়ের বোতলে ছাকনাচুর হয়ে থাকে, সেদিকে একটা ভাঙা ঝোপড়ির মধ্যে বসে ইঞ্জেকশনে মিক্সচার টেনে নিচ্ছিল টেনিয়া।

শীতকালের বিকেল, ঠান্ডা লাগছে হেবি। একটু আগেও টেনিয়ার হাড় অবধি জমে যাচ্ছিল ঠান্ডাতে। দুটো শট নিয়ে এসেছে টেনিয়া, তাই বডিটা সামান্য ওম মারছে। আহ, নাসিরভাই উমদা জিনিস ছাড়া দেয় না, মালটাও খিঁচে নেয় তেমনি। শালা চারটে পুরিয়া চার হাজার, হারামিটা এক পয়সা কম নেয় না।

মাথায় দুটো কিক পড়তেই ইন্দ্রিয়গুলো সটাসট চোখা হয়ে ওঠে টেনিয়ার। সেবার তো বৈজনাথের মাথায় দানা ভরে দেবার আগে দুটো ছিলিম গাঁজা উড়িয়ে তারপর একটা নাসিরের দেওয়া শট নিয়ে গেছিল টেনিয়া। আহা, প্রথম দানাটাই সোজা কপালে, আওয়াজ করার সময় অবধি পায়নি হারামিটা। ভাবতেই টেনিয়ার মুখে একটা হাসি খেলে যায়।

পুলিশ অবশ্য ভালো ভাবে নেয়নি ব্যাপারটা। হাড়কাটার একটা বেশ্যার জন্যে টেনিয়া হিট খেয়ে কাউকে উড়িয়ে দিল এটা ওদের বিশ্বাস হয়নি, ভেবেছে গ্যাং ওয়র। তুলে নিয়ে গিয়ে লক-আপে ঢুকিয়ে উলটো করে ঝুলিয়ে কী মার কী মার! সেই থেকে বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটা নাড়াতে পারে না ও। তবে অফিসারটার নাম মনে রেখেছে টেনিয়া, সুবীর সামন্ত। শুয়োরের বাচ্চাটা এখন যাদবপুর থানায় আছে। দুনিয়াটা শালা গোল, মওকা আসবেই, সেদিন হারামজাদাটার খোমা বিলা করে দেবে টেনিয়া।

মিক্সচারটা সিরিঞ্জে প্রায় ডাক্তারের নিষ্ঠায় ভরতে থাকে ও। এদিকে কেউ বিশেষ আসে না। স্টেশনের বাইরে নিজের ভাড়ার ট্যাক্সিটা রেখে এদিকে এসে একটা শট নিয়ে যায়, নইলে ওর চলে না। তামার পয়সা ঘষে দারু, বা হেরোইন চরস ছাড়া ওর নেশা হওয়া মুশকিল, তবে তাতে হেব্বি খরচ। দুয়েকবার চুমকুড়ি, মানে জিভে সাপের ছোবল নিয়ে অবশ্য দেখেছে ও, আহ, নেশার রাজা। কিন্তু ওই যে, কুত্তি পয়সা। শালি কারও শোনে না।

পয়সার জন্যেই তো ও মেয়ে পাচারের ব্যবসাটা শুরু করতে বাধ্য হল।

মেয়ে পাচারের হ্যাপা অনেক, কিন্তু হেভি মাল্লু। গাঁ গঞ্জে মালিকের আড়কাঠি ছড়ানোই আছে। কেউ শালা প্রেম মহব্বতের নাম করে বাচ্চা মেয়েগুলোকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসে, কেউ আবার চাকরি দেবার নাম করে। দু-দিন এদিক-ওদিক থাকে, সংসার করে কি কলকাতা দেখে, তারপর একদিন হাত-পা বেঁধে মালিকের লরিতে তুলে দিলেই হল। ইউ পি, দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বাঙালি মেয়েদের হেবি ডিমান্ড। নরমসরম বডি, পাঁইয়াগুলো বিছানায় হেবি সুখ পায় নিশ্চয়ই? তার ওপর ভীতু বাঙালি, দুটো থাপ্পড় কষালেই চুপ থাকে। সাধে কী শ্লা সেই বাংলাদেশ থেকে বাঁকুড়া অবধি হাজার হাজার বাঙালি মেয়ে বাঁধাকপিগুলোর বিছানা গরম করছে? খুক খুক করে একটু হেসেই নেয় টেনিয়া।

পার মেয়ে দশ মতন পায় ও। মাগি একটু ফর্সা হলে আর মাইফাইয়ের সাইজ ভালো থাকলে তিরিশ অবধিও কামিয়েছে টেনিয়া। তবে এ লাইনের সবচেয়ে সুখ হচ্ছে, মেয়েগুলোকে তৈরি করার দায়িত্বটা টেনিয়াদের ওপরেই পড়ে। আহা, কচি মাল সব, আজকাল তো দশ বারো থেকে মেয়ে তুলতে বলছে মালিক। পনের ষোলোর বেশি হলেই নাকি কাস্টমার নাক সিঁটকোচ্ছে। সেই ভয়ে কাঁটা হয়ে যাওয়া, পেচ্ছাপ করে ফেলা বাচ্চা মেয়েগুলোকে ধরে বিছানায় তুলে আশ মিটিয়ে খাওয়ার মধ্যে যে কী অপার সুখ, সে টেনিয়া বলে বোঝাতে পারবে না।

চাদরের খরচাটা অবশ্য টেনিয়াই দেয়। সাদা চাদর ছাড়া টেনিয়া অন্য চাদর পছন্দ করে না, আর একবারের রক্তমাখা চাদর টেনিয়া দু-বার ব্যবহার করে না। সেইজন্য মালিক তো ওর নামই দিয়েছে চাদ্দরচোদ!

তবে যাতে টেনিয়ার সবচেয়ে বেশি লাভ, সেটা হল ফেসবুক!

ফেসবুকে শালা কিলবিল করছে বাঙালি মেয়ে। খানিকটা ওরই মতন দেখতে একটা ছেলের ছবি দিয়ে ঘ্যামা প্রোফাইল বানিয়েছে ও। বেশ কিছু কচি মাল এসে ঠুকরে যায়। সেক্সি থোবড়া দেখলে বাঙালি মেয়েগুলোরই প্রেম প্রেম বাই উথলে ওঠে বেশি, দেখেছে টেনিয়া। বাকি ওড়িয়া কি বিহারি কি পাঞ্জাবি মেয়েগুলো পাত্তা অবধি দেয় না, শেয়ানা জাতের মাল শালি, মনেমনে খিস্তি করে টেনিয়া। ফেসবুক থেকে মেয়ে তোলার সবচেয়ে ভালো দিক হল নো কাটমানি, শ্লা পুরো মাল্লু নিজের ইয়েতে। আজও একটা শিকার দুপুর তিনটে নাগাদ এসে পৌঁছবে, সঙ্গে দুটো ল্যাংবোট নিয়ে। শাল্লা, এক ছিপে তিন মছলি, আজ তো খুনখারাপির দিন টেনিয়ার!

শট নিয়ে একটা জাম্বোসাইজ বিড়ির মধ্যে তামাক আর টিকটিকির লেজপোড়া ছাই মিশিয়ে ভরে বানাতে বানাতেই পিছনে একটা খ্যাঁক খ্যাঁক আওয়াজ শুনতে পেয়ে হিংস্র কেউটের মতোই ঘুরে বসে ও।

ভিখু, টেনিয়ার এক নম্বর শাগরেদ। পকেটমার ছিল আগে, পরে কয়েক বছরের জন্য একটা গব্বাবাজদের দলে ভিড়ে যায়। ভালো বোম বাঁধতে পারে, যদিও ওই করতে গিয়েই বাঁ-হাতের কয়েকটা আঙুল মায়ের ভোগে যায়। 'গুরু, এখানে বসে নেশা চোদাচ্ছ, ওদিকে তিনটে ফানটুস মিছরি টেসনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্চে যে! বাড়ি থেকে পালিয়েচে বোদায়। সাঁটিস মাল গুরু, পুরো চাম্পি। বুকে এত্ত বড়ো মাদার ডেয়ারি নিয়ে ঘুরচে গুরু, টাইট জিন্স পরে আচে তো, ওহ, কী থাপা, কী পাচছল...'

চোখ দুটো সরু করে ভিখুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বিড়িটা ধরায় টেনিয়া। সেই সাপের চাউনির সামনে ভিখু একটু চুপ করে যায়। প্রথম টানটাই টং করে মাথায় গিয়ে লাগে টেনিয়ার, মালগুলো তাহলে এসে গেছে? ফোনটা তাহলে এরোপ্লেন মোড থেকে নর্মাল মোডে আনতে হবে তো!

'ঠিক দেখেছিস? বিলকুল ফাঁকা? সঙ্গে কোনো আনছান চ্যাংড়া মাসুক নেই তো?' সাবধান হওয়া ভালো, ভাবে টেনিয়া।

'না গুরু, ভিখুর মতন আংলিদার আর পাবে না। সোব ছানবিন করে এসেচি। একটা বড়ো, প্পুরো হরিণঘাটা ডেয়ারি, পঁয়েরো ষোলো হবে, বাকি দুটো টুননি, দশ বারো মতন, বড়টা একটা ব্যাগে ভরে কাপড়চোপড় এনেচে, বোদায় বড়োটা বাড়ি থেকে কাল্টি মেরেচে। গরম ছাম মাইরি, বেচতে পারলে ম্যালা সেরকড়ি গুরু, দেড় পেটির কম হবে না। তাড়াতাড়ি করো মাইরি, পুলিশ ঢুকে গেলে কিন্তু এক পয়সা পাবে না শ্লা।'

দেড় পেটি! কথাটা গিয়ে টেনিয়ার মস্তিষ্কে আঘাত করে। এতটা ও নিজেও ভাবেনি। আরেকটা টান মেরে ধীরেসুস্থে ওঠে ও, তারপর ভিখুর ঘাড়টা খপ করে ধরে, 'ঠিকঠাক ছানবিন করেছিস তো? আর কেউ নেই তো? আনসান খবর হলে কিন্তু তোমার গিনি বাজিয়ে ফাঁট করে দোবো হারামজাদা, খেয়াল থাকে যেন।'

ভিখু প্রায় নুইয়েই পড়ে, 'মাক্কালির দিব্যি গুরু। এলাকার মেয়ে নয়, তিনটেই আলগা ছাবকি, আর গরম মাল মাইরি, হেব্বি খাম খাম। বড়োটার বোধায় আশিকের সঙ্গে পালিয়ে যাবার ছিল, সে শ্লা চোখ উলটে কেটে পড়েছে! মালটা ফোন কচ্চে আর তারপরেই নামিয়ে রাকচে। মালগুলোর তো শ্লা কেস কিচাইন, সেই এক কোণায় বসে হুসুরফুসুর করচে। গুরু তুমি তো ইংলিস ফিংলিস বলতে পার, গিয়ে ছাম তিনটের সঙ্গে ভাব জমাও না, আজ রাতটা রাজারহাটের ডেরায় তুলে তিনটেকেই ঝিললি পেলে নিই, কাল পরশু আসলামের লরিতে করে...'

'শালা চামড়াচোর, কমলি দেখলেই চুদুরবুদুর না? আমাকে কাজ শেখাচ্ছিস শালা? চ্যল, চাবিটা নে, গাড়িটা রেডি রাখ। মোবাইল রেডি থাকে যেন, টুং করলেই সোজা পেছনের গেটে, মনে থাকবে?'

চাবিটা ছুঁড়ে দিয়ে ভাঙা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে স্টেশনের দিকে রওনা দেয় টেনিয়া। না, টেনিয়াকে দেখিয়ে দেওয়ার দরকার নেই মেয়ে তিনটে কোথায় বসে আছে। মোবাইলটার মোড চেঞ্জ করে টেনিয়া। ইসস, অনেকগুলো মিসড কল অ্যালার্ট এসে পড়ে আছে। নিজের ফেসবুকটা অন করে একবার

মেসেঞ্জারটা দেখে নিয়েই বন্ধ করে টেনিয়া। স্ক্রিনে ফুটে উঠেছিল প্রায় ওরই মতন আরেকটা ছেলের ফটো, প্রোফাইলে লেখা ছিল একটা ছোট্ট নাম, স্যাম!

* * *

ট্যাক্সির স্টিয়ারিঙে টানটান হয়ে বসেছিল ভিখু। গুরু কখনো ফেল হয় না, একটু পরেই পাক্কা ছবকি তিনটেকে ম্যানেজ করে গুরু সিগন্যাল দেবে। একবার ভুলিয়েভালিয়ে রাজারহাটের ফাঁকা ফ্ল্যাটটায় তুলতে পারলেই,ওহ। শরীরে কিছু চাঞ্চল্য অনুভব করল ভিখু। দুটো দিন তো গুরু রাখবেই। ও আছে, গুরু নিজে আছে, আসলাম আছে, বনোয়ারি আছে, সামন্ত আছে, লোক কম নাকি? দিয়ে থুয়ে খেতে হয়, গুরুর সাফ কথা।

সময় নিচ্ছে গুরু। ভালো, বড়ো মছলি, কিছু সুতো তো খাবেই। তিনটের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড়ো, সেটাকে আগে চেয়ে নেবে ভিখু, ভেবে রেখেছে। উহ, বাতাবির কী সাইজ মাইরি। ভাবতে ভাবতেই ড্যাশবোর্ড খুলে একটা কালো চেপটা বোতল বার করে আনে। বোতলের ছিপিটা খুলতেই একটা উগ্র কটু ঝাঁঝালো গন্ধ ট্যাক্সির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পাঁইটটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে ভিখু, তারপর সোজা গলায় উপুড় করে দেয়।

গলাটা জ্বলে যায় ভিখুর, মালটা গিলে নিয়ে খানিকক্ষণ চোখ-মুখ কুঁচকে বসে থাকে। আহ, কী ধক মাইরি, শালা পলকে ধরে নেয়। নিউ ব্যারাকপুরের পদ্মবউদির ভাঁটিতে বানানো আসলি চিজ। চুল্লুর সঙ্গে চুন, আরও কী কী কেমিক্যাল মেশানো হয়, তারপর খদ্দের বুঝে ব্যাটারির জল। পদ্মবউদির চুল্লু তেজে পদ্মগোখরোর বিষের থেকে কম কিছু না, লোকে নামই দিয়েছে পদ্মকাঁটা। আগে বলত ফুটুশ। ফুটুশই বটে, বেশিদিন এই জিনিস চালালে পাবলিক ফুটেই যায়, কম লোক তো ভিখু দেখেনি এ লাইনে। ভিখুও ফুটবে, বেশি দিন নেই আর।

ভাবতেই ভাবতেই খি খি খি করে ছোপ ধরা দাঁতগুলো বার করে হেসে ওঠে ভিখু, আর ঠিক সেইসময়ে মোবাইলটা কর্কশ স্বরে বেজে ওঠে। ঝটপট বোতলটা ড্যাশবোর্ডে চালান করে দিয়ে মোবাইলটা তুলে কল অ্যাকসেপ্ট করে কানে দেয় ও, 'বল গুরু।'

ওপার থেকে টেনিয়ার শান্ত কেউটের মতন গলাটা হিসহিসিয়ে ভেসে আসে 'বলি দাসদা স্টেশন চত্বরে আছেন নাকি? আপনাকে তো আমার আর তিতলির ব্যাপারে বলেইছিলাম। ও এসে গেছে, বুঝলেন? সঙ্গে আমার দুই শালিও আছে। তা আজকে ঠাকুরমশাই বললেন ভালো লগ্ন নেই, তাই আজ বাদ দিয়ে বিয়েটা আমরা কাল করছি। আজকের রাতটা একটু রাজারহাটে আমার পিসিমার ডেরায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দিন দাদা, প্লিজ। কালকেও কিন্তু সকালে আসতে হবে সক্কাল সক্কাল, মনে আছে তো? কালীঘাটে পৌঁছে দিতে হবে কিন্তু, হেঁ হেঁ...'

ফোনটা কেটে ইঞ্জিন অন করে ভিখু। শাল্লা, আগে থেকে চিনতো তার মানে? অন্য সোর্স থেকে তুলেছে? কী অ্যাকটিং মাইরি, সাধে এই হারামিটাকে গুরু বলে মেনেছে ভিখু? আহ, দুটো দিন। ভদ্র বাঙালি বাড়ির তিনটে নরমসরম বাচ্চা, টাইট নরম থাপকি দুটো, তেমন ছুনমুন গাব্বা ডাব্বা, আহহ, ভাবতে ভাবতেই গিয়ার বদলায় ভিখু।

* * *

ট্যাক্সিটা প্রায় উড়েই চলেছিল সল্টলেকের রাস্তা ধরে। শীতকালের রাত দ্রুত নামে। পিছলে যাওয়া রাস্তার আলোতে ছায়ারা খেলা করে যাচ্ছে পিছনের সিটে বসে থাকা মেয়েগুলোর মুখে। সে মুখে নতুন অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনা, বিয়ের চিন্তা, লোকলজ্জার ভয়, নাকি অজানা অচেনা শহরে হারিয়ে যাওয়ার

উদ্বেগ, কোনটা বেশি সেটা বলতে পারবে না ভিখু। পাশে টেনিয়া বসে, ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। ওদের যে ঘাঁটি, তার কেয়ারটেকার সামন্তকে বলাই আছে রেডি থাকতে। আধা তৈরি হয়ে পড়ে থাকা বিল্ডিংটায় কেউ থাকে না, তারই একটা ঘর ওরা নিয়ে রেখেছে। একটেরে বিল্ডিং, দূর দূর অবধি কেউ নেই, চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ শুনতে পাবে না।

টেনিয়ার উদ্বেগ অন্য জায়গায়। মালিককে তিনটেরই ফোটো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছে টেনিয়া, মালিক বলছে কালই তুলে দিতে আসলামের লরিতে। কিছু না ভেবেই দু-লাখ চেয়েছিল টেনিয়া, মালিক শোনা মাত্র রাজি হয়ে যায়। এখন আফশোস হচ্ছে টেনিয়ার, আরও কিছু চাইলেই হত। যাকগে যাক। আজ রাতটাই যা...

অনেক্ষণ পর বড়ো মেয়েটা কথা বলে উঠল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি স্যাম', গলার মধ্যে উদ্বেগ আর উত্তেজনাটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। টেনিয়া একটু খুক করে হেসে নিয়ে বলল, 'এই তো, আমার পিসির বাড়ি, সামনেই। বড়ো ফ্ল্যাট, পিসি একাই থাকে। আমি বলেই রেখেছি তোমাদের কথা, তোমাদের কোনো অসুবিধাই হবে না, হে হে।'

'তোমাদের বাড়িতে গিয়ে উঠলে হত না?'

যেন লজ্জাতেই জিভ কাটে টেনিয়া, 'আরে ছি ছি, বিয়ের আগেই মা তোমাকে দেখবেন নাকি? আজ তো কালরাত্রি না কি একটা বলে না? একেবারে কাল বিয়ে করেই না হয় উঠবে। মা তো বরণডালা সাজিয়েই রেখেছে, হে হে।'

'এত রাত্রে তিন জন গিয়ে উঠব, পিসিমণি কিছু মাইন্ড করবেন না তো?' মেয়েগুলোর সারল্য দেখে অবাকই হচ্ছিল ভিখু। তবে আরও অবাক করল টেনিয়া, 'আরে না না, আমাদের ব্যাপার পিসিমা সওওব জানে। আসলে এখান থেকে কালীঘাট যেতে সুবিধা, আর কালই শুভদিন। এক রাত থাকবে, গল্পগুজব করবে, এ আর এমনকী। আমার পিসি তোমাকে দেখার জন্যে মুখিয়ে আছে বুঝলে! হাজার হোক, বাড়ির বড়ো বউমা বলে কথা!' ভিখুর তো ইচ্ছে করছিল স্টিয়ারিং ছেড়ে হাততালি দিয়ে ওঠে। শাল্লা, কোথায় লাগে শারুক্ষান, কোথায় লাগে সালমান। সাধে মালিক এত ভালোবাসে গুরুকে?

রাজারহাটের মেইন রাস্তা দিয়ে চলার সময় রিয়ার ভিউ মিররে আরেক বার মেয়ে তিনটের মুখ দেখল ভিখু। উত্তেজনা আর আশঙ্কায় সিটের সঙ্গে প্রায় লেপটে আছে ওরা। ওদিকে টেনিয়া ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে, সেটা ওর আঙুল মটকানো আর ঘন ঘন ঘড়ি দেখা নিয়েই বোঝা যাচ্ছে।

প্রথম বড়ো সিগন্যাল থেকে গাড়িটা মসৃন সড়ক ছেড়ে ডান দিকের অন্ধকারে খোয়া বিছানো রাস্তা ধরতেই গাড়ির সঙ্গে মেয়ে তিনটেও দুলে উঠল, বড়ো মেয়েটা বলে উঠল, 'এত অন্ধকার কেন রাস্তায়? আমরা কোথায় যাচ্ছি?' বোঝাই যাচ্ছে বিস্তর ভয় পেয়েছে। বাকি বাচ্চা মেয়ে দুটো আঁকড়ে ধরেছে বড়োটার হাত। আধো অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে যে এদের মুখ ভয়ে আতঙ্কে সাদা বিবর্ণ হয়ে গেছে। টেনিয়া একটু কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'আহ, সামনেই বিল্ডিং, ওখানেই পিসিমার ফ্ল্যাট। এত চেঁচামেচি করার কি আছে, অ্যাঁ?'

মেয়েগুলো ধমক খেয়ে থতমত খেয়ে চুপ করে যায়, একটা হালকা ভয়ার্ত ফোঁপানির শব্দ শুনতে পায় ভিখু। এরপর শক্তমুখে বাঁ-দিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে অন্ধকার বিল্ডিংটার সামনে দাঁড় করায় গাড়িটা।

এরপর একটা আর্ত চিৎকার।

সামন্তকে রাখাই হয়েছে ওই জন্যে অবশ্য। লোকটা আগে পার্টির জন্যে বোম বানাত। একবার ভোটের আগে অপোজিশনের ছেলেরা ধরে মুখের অর্ধেকটা অ্যাসিড আর আগুনে পুড়িয়ে দেয়। দিনের বেলাতে দেখলেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, রাত্তিরে তো কথাই নেই! রাত্তিরে অন্ধকারে দাঁড়ানো ট্যাক্সির জানালার পাশে এসে এইরকম আধপোড়া মুখ নিয়ে কেউ যদি হাতে আবছা হলুদ এমারজেন্সি লাইট ঝুলিয়ে বলে, 'নেমে আসুন', তাতে চমকে যাওয়া স্বাভাবিক। ওখানেই বাচ্চা মেয়েগুলোর নার্ভ ফেল করতে শুরু করে।

এরা অবশ্য যখন থরথর পায়ে নেমে আসে, বাচ্চা মেয়ে দুটো অলরেডি কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। বড়ো মেয়েটাকে দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে ওর পা কাঁপছে, যেকোনো মুহূর্তে পড়ে যাবে। বাচ্চা দুটো গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে পুরো। বড়ো মেয়েটা নেমেই বলল, 'আমরা এখানে থাকব না স্যাম, আমাদের স্টেশনে ফিরিয়ে দিয়ে এসো প্লিজ, দোহাই তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে তো তুমি ভালোবাসো, তাই না স্যাম? প্লিজ স্যাম, লক্ষ্মীটি। আমরা কাল সকালে ঠিক কালীঘাট পৌঁছে যাব, প্রমিশ করছি। আমরা এর ভেতরে যাব না...'

টেনিয়ার থাপ্পড়টা সাপের ছোবলের মতোই নেমে এল মেয়েটার গালে। কোঁক করে একটা আওয়াজ তুলে মেয়েটা মাটিতে পড়ে গেল। বাচ্চা মেয়ে দুটোর যেটা আছে, সেটা ভয় আর আতঙ্ক ছড়িয়েও অনেক বেশি কিছু, মনে হচ্ছে ওদের পাগুলো যেন মাটিতে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, এক্ষুনি পেচ্ছাপ করে ফেলবে। ধীরেসুস্থে নীচু হয়ে বড়ো মেয়েটার চুলের গোড়াটা খপ করে ধরল টেনিয়া, 'শুনে রাখ কুত্তি, টেনিয়ার ডেরায় ঢুকেছিস, তোদের সব নোটঙ্কি এখন থেকে বন্ধ, বুঝলি? আজ রাতটা মস্তি, কাল শ্বশুরবাড়ি, বুঝেছিস? বেচাল যদি দেখেছি, টুকরো করে কেটে পুঁতে দেব। চেঁচালেও আশেপাশে শোনার কেউ নেই, দেখে নে চারিদিকে। ভালো মেয়ের মতো ঘরে বন্ধ থাক। কয়েক ঘন্টা পর কিছু দোস্ত নিয়ে আসছি, কিছু ফুর্তিফার্তা হবে, ন্যাকড়াবাজি একদম নয়, ওক্কে বেব্বি? এখন চ্যল বে, 'বলে চুলের মুঠি ধরে মেয়েটাকে দাঁড় করায় টেনিয়া। তারপর সিঁড়ি ধরে ছেঁচড়ে তুলতে থাকে। মেয়েটাও বোধ হয় চরম আতঙ্কে বোবা পাথর হয়ে গেছে। রেলিং ধরে ধরে উঠতে লাগল। ভিখু আর সামন্ত বাচ্চা দুটোর ঘাড় ধরে টানতে শুরু করায় ওরাও এগোতে থাকে, বধ্যভূমির দিকে টেনে নেওয়া বলির পশুর মতন।

দোতলায় উঠে ফ্ল্যাটের দরজা খোলে সামন্ত। তিনটে মেয়েকেই ঠেলে দেওয়া হয় ভেতরে। টেনিয়া হিসহিসে গলায় বলে, 'এখানেই থাকো মামনিরা, ঘণ্টা তিনেক বাদে তোমাদের কিছু আশিক জুটিয়ে আনছি, কেমন? আওয়াজ করলে কিচাইন হয়ে যাবে কিন্তু। এই সামন্তের বাচ্চা, খাবারদাবার যা দেওয়ার এদের দিয়ে দিও। আর তুমি কিন্তু শালা ময়দান ফাঁকা দেখে গোল করতে যেও না, ঝিটনি দুটো খুলে হাতে ধরিয়ে দোবো, মনে থাকে যেন। চ্যল বে ভিখু', বলে টেনিয়া দ্রুত নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে। রাস্তার ধারে লাগানো এক শীর্ণ ল্যাম্পপোস্ট থেকে ঘরে ঢুকে আসা ঘোলাটে মৃত আলোর মধ্যে ভূতগ্রস্ত মেয়ে তিনটেকে রেখে দরজা বন্ধ করে সামন্ত।

* * *

রাত দেড়টা নাগাদ যখন বালুরঘাটের বিবেকানন্দ কলোনির দত্তগুপ্ত বাড়ির সামনে পুলিশের জিপটা এসে থামল, তখন শুধু দত্তগুপ্ত বাড়ি কেন, পুরো পাড়াটাই উত্তেজনা আর অমঙ্গল আশঙ্কায় জ্বরো রুগির মতন কাঁপছে। জিপের আওয়াজ শুনে তাই দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে সময় নেননি তথাগত আর ঊর্মিমালা, আর তিতলির বাবা-মা, অতসীও সঙ্গেই ছিল। আশেপাশের বাড়ি থেকেও সটাসট দরজা খুলে উদ্বিগ্ন প্রতিবেশীরা নেমে আসেন। দৌড়ে আসেন স্বর্ণালি আর রূপালির মা-বাবা।

জিপের সামনের সিট থেকে নেমে দাঁড়ান মধ্য চল্লিশের, পেটানো স্বাস্থ্যের দুই পুলিশ অফিসার। আর পেছনের সিট থেকে নেমে আসেন দুই মহিলা পুলিশকর্মী। আর তারপর ধীর পদক্ষেপে, মাথা নীচু করে, বাড়ি থেকে পালানো তিন কন্যে।

'আপনাদের মেয়ে নাকি?' চওড়া হেসে বলেন প্রথম জন, 'আমি প্রবীর ব্যানার্জি, ওসি, সিআইডি স্পেশাল ব্রাঞ্চ। এই তিন মক্কেল শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে ফালতু ঘোরাঘুরি করছিল। এই আমার কলিগ ওয়াসিম, ও গেছিল একটা পার্সোনাল কাজে, সন্দেহ হওয়াতে জিআরপিকে বলে তিন জনকে আটকায়। তারপর আর কী। আমাদের বস আবার এইদিককার লোক, আপনার ছাত্র ছিলেন। আপনার নাম শুনেই তিনি আর কোনো

রিপোর্টের হাঙ্গামা না বাড়িয়ে, জিআরপিকে বলে কয়ে আমাকে বললেন নিজে থেকে পৌঁছে দিতে। সেই ট্রেন ধরে এসে লোকাল থানা থেকে জিপ নিয়ে... একটু রাত হয়ে গেল বলে সরি...'

ওদিকে কান্না ফোঁপানি হাউমাউ বকাবকি বিবিধ আওয়াজের মধ্যে তথাগত এগিয়ে ওসে ওসির হাত ধরে ফেলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁর গলা থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। শুধু ধরা গলায় বললেন, 'কি বলে ধন্যবাদ দেব ভাই? এ উপকার জীবনে ভুলব না। আপনার বসের নামটা যদি বলেন। আর বলছি কী, এত রাতে এলেন, অন্তত রাতের খাবারটা খেয়ে যাবেন না?'

'আরে আমাদের কি সেই কপাল আছে স্যার?' ফের জিপে বসতে বসতে দুঃখপ্রকাশ করেন ওসি, 'আমরা হলাম গিয়ে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ, সর্বঘটে কাঁঠালিকলা। এই তো ট্রেন থেকে নেমেছি কি নামিনি, খবর পেলাম রাজারহাটে কোন এক আন্ডার কন্সট্রাকশন বিল্ডিঙে নাকি দু-পিস বডি পাওয়া গেছে', বলে তর্জনীটা তুলে গলার এদিক থেকে ওদিক নিয়ে যান, 'বডি আছে, মুণ্ডু হাপিস। সে নাকি এমন কেটেছে সারা বিল্ডিঙের একতলা রক্তে থইথই। বড়ো সাহেব অত রাতেই ফোন করে বললেন কেসটা যেন আমি আর ওয়াসিম হ্যান্ডেল করি... কী আর বলি, নাওয়া-খাওয়া নেই, দাদা। এত্ত এত্ত ক্রাইম, আর এই কটা মাত্র পুলিশ... এই নিন, কার্ডটা ধরুন, এতে আমার উপরওয়ালার নাম আর মোবাইল নাম্বার, কথা বলে নেবেন। চলি তাহলে? কী রে ওয়াসিম, চল বাপ, স্টিয়ারিং ধর। আজ তোরও উপোস, আমারও...' বলতে বলতে জিপটা স্টার্ট করে বেরিয়ে যায় পাড়ার মোড়ের দিকে।

* * *

রাত বারোটা নাগাদ ট্যাক্সিটা নিঃশব্দ ঘাতকের মতোই এসে দাঁড়াল রাজারহাটের অভিশপ্ত ফ্ল্যাটটার সামনে। ফটাফট গেট খুলে নেমে এল টেনিয়া, আসলাম আর বনোয়ারি। ভিখু জড়ানো গলায় বলল, 'গাইটা গ্যাএজ কয়ে আসচি গুউ, শ্লা আগেই সুউ কএ দিও না।' ওরা তিন জনেই টলছিল। চাঁদের আলো আর শীর্ণ ল্যাম্পপোস্টের মরা আলো মিশিয়ে ভূতুড়ে দেখাচ্ছিল ওদের। যেন নরকের আগুনের আলোছায়ায় দুলছে তিনটে মূর্তিমান পাপ।

আজকে নেশা করেছে ওরা, প্রচুর নেশা। প্রথমে ভিআইপির পাশে এক ডান্স বারে, তারপর আসলামের কৈখালির আড্ডায়। আহা, নম্বরি মাল এনেছিল আজ আসলাম, মালানা ক্রিম! গেটে সামন্ত বসেছিল, টেনিয়া জিজ্ঞেস করে, 'কি রে হারামি, মালগুলোকে খেতে দিয়েছিলিস?'

'গেছিলাম দিতে, দরজা খোলেনি।'

'মানে, কুত্তিগুলো দরজা বন্ধ করে ভাবছে পার পাবে? আব্বে এ ভিখু, জলদি আ বে। চ্যল, ওপরে চ্যল। আগে আমি, ভিখু আর আসলাম, তারপর বাকিরা, কেমন? বেশি আনসান মজাকি করবে না, কোথাও যেন দাগফাগ না পড়ে, হাড়কাটার মাল নয়...'

'গুউ, বওটা আমাকে দেবে? হেবি ইচ্চে করচে।'

সাপের মতই একটা হিসহিস আওয়াজ করে ভিখুর টুঁটিটা আঁকড়ে ধরে টেনিয়া 'শালা, ঢ্যামনার শখ দ্যাখ বে! চ্যল, একটা টুননিকে নিয়ে সাইডে ফুটে যাবি। আব্বে এ সামন্তের বাচ্চা, গন্দা রেডি আছে তো? আর সাদা চাদর?'

বলতে বলতে ওরা একতলায় উঠে আসে নিয়তির অমোঘ অভিশাপের মতো। টেনিয়া ভিখুকে বলে, 'খট খট কর, দরজা খুলতে বল।' ভিখু খট খট করতে করতে সুরে বলতে থাকে, 'রাত হল দোর খোলো খুকুমণি সোনারে, মাসুক এসেচে কত চোক খুলে দেকো রে।' কোনো সাড়া আসে না, ধমকে ওঠে টেনিয়া, 'সর বে, ছড়া কেটে শ্লা বাপের বিয়ে দিচ্ছে। চল বে কান্ধা লাগা...'

বলতে বলতে টেনিয়া এগিয়ে এসে ভিখুকে নড়া ধরে তোলে। তারপর দুইজনে এগিয়ে ধাক্কা দিতেই দরজাটা যেন অলৌকিকভাবে হাট হয়ে খুলে যায় এবং তার ফলে হুড়মুড়িয়ে ওরা দু-জনেই ভেতরে হুমড়ি খেয়ে চলে আসে। আর ঠিক তক্ষুনি যেন অলঙ্ঘনীয় ভবিতব্যের মতোই দরজাটা ওদের পিছনে সজোরে বন্ধ হয়ে যায়। যদিও সেটা খেয়াল করার আগে ওরা সামনের দিকে তাকায় এবং চরম অবিশ্বাসে, সর্বগ্রাসী আতঙ্কে আর হাড়হিম করা ভয়ে স্থাণু হয়ে যায়।



সেই অর্ধেক আঁধার ঘরের মধ্যে, আধো চাঁদের আলো আর ল্যাম্পপোস্টের মৃত বিবর্ণ হলুদ আলো মিশিয়ে যেন প্রাগৈতিহাসিক এক সিল্যুয়েট তৈরি করেছে। আর তার মধ্যে ওরা দেখল তিনটি নগ্ন শরীর ঘরের মধ্যে বিচিত্র ভাবে দাঁড়িয়ে! বড়ো মেয়েটির ডান হাতে একটি ভয়ালদর্শন রক্তাক্ত খড়্গ, আর তার মাথার জায়গাটা ফাঁকা! সেটা ধরা আছে তার নিজেরই বাঁ-হাতে! তার সেই কাটা গলা থেকে ঝরনার মতন ছিটকে উঠেছে তিনটি রক্তধারা। তার দুটি ধারা গিয়ে পড়ছে তার দু-পাশে দাঁড়ানো বাচ্চা মেয়েদুটির মুখে, আর তৃতীয়টি নিজেরই কাটা মুণ্ডুটির মুখে। বড়ো মেয়েটির গলায় দুলছে নরকরোটির মালা আর উদ্ধত দুই স্তনের মাঝে পৈতের মতন জড়িয়ে আছে একটি কুচকুচে কালো কেউটে! ঘরের মধ্যে উঠেছে এক চাপা ঘূর্ণি আর সেই প্রবল হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে তাদের খোলা চুল, যেন দাউদাউ করে জ্বলছে নরকের কালো আগুন। বাচ্চা মেয়ে দুটি চোখ খুলে পরম আবেশে পান করে যাচ্ছে সেই অঝোর ধারায় উৎসারিত রক্ত, তাদের হাতেও একটি করে ভীমকায় খড়্গ, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাদের সমস্ত মুখ, রক্তস্নাতা সেই ভয়ংকরী দু-জনকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাক্ষাৎ রক্তপিশাচী ডাইনি! দেওয়ালে, সিলিঙে জানালার কাঠে লেগে আছে তাজা রক্তের ছাপ। সারা মেঝে থইথই করছে রক্তে, যেন আজ বিশ্বচরাচরের সমস্ত রক্ত এই ঘরের মধ্যে।

আওয়াজ শুনে একইসঙ্গে তিনটে মাথাই এদিকে ফেরে। রক্তমাখা মুখে সাদা দাঁত বার করে তিনটে মুখই খল খল খল করে একটু হেসে নেয়। তারপর যেন পাতালের গভীর থেকে, সমুদ্রের বুকের থেকে, আগ্নেয়গিরির আগুন থেকে উঠে এল এক প্রশ্ন, উচ্চারিত হল একইসঙ্গে তিনটি গলায়, 'কি রে, খাবি না? আমাদের খাবি না? রক্ত খাবি? আয়, খাবি আয়, আয় রে আয়, এদিকে আয়, খেয়ে যা, আয় রে আয় আয় আয় আয়...'

ভোগ

মূর্তিটাকে দোকানে দেখেই ভারি পছন্দ হয়ে গেল অতীনের। কিন্তু তারপর মূর্তিটাকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে...

পার্ক স্ট্রিটের এই কিউরিওর দোকানে প্রায়ই আসে অতীন। মালিক সুবেশ আগরওয়ালের সঙ্গে গল্পগুজব করে কিছুক্ষণ, এটা ওটা নেড়েচেড়ে দেখে, কিছু পছন্দ হলে ঘরে নিয়ে যায়। সুবেশের সঙ্গে মাত্র এই কয়েক বছরেই বেশ একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেছে অতীনের। দু-জনেই ব্যাচেলার, বয়েসও কাছাকাছি, একত্রিশ আর তেত্রিশ। তার ওপর সুবেশ আগরওয়াল নামেই মাড়োয়ারি, পাঁচ পুরুষের বাস কলকাতা শহরে। চট করে দেখলে বা কথা বললে মনে হয় মাণিকতলার গলি থেকে বগলে ব্যাগ নিয়ে বার হয়ে পান চিবোতে চিবোতে গিল্যান্ডার হাউসে কেরানিগিরি করতে যাওয়া বাঙালি বাবুটি বুঝি।

অতীনের সঙ্গে সুবেশের এই হৃদ্যতা দোকানদার আর খদ্দেরের সাধারণ আলাপচারিতার থেকে অনেক বেশি। ধার বাকি তো আছেই, সময় সুযোগ বুঝে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ড্যান্স বারে বসে মদ্যপান, শনিবার দেখে মাঝেমধ্যে রেস কোর্সে ঢুঁ মারা, সবই চলে। সুবেশের আরও দুটি সদ্‌গুণ হচ্ছে এক, টাকার জন্যে অতীনকে মোটেও তাগাদা দেয় না, আর দুই, চার পেগের পর লোকটা ভারি উদার হয়ে পড়ে, কিছুতেই অতীনকে পয়সা দিতে হয় না।

আজ অক্টোবরের শেষ শনিবার। অফিসফেরতা আজও এসেছিল অতীন, টুকটাক গল্প করে তারপর মেট্রো ধরে নেতাজিনগরের বাসায় ফিরে যাবে, এই ছিল প্ল্যান। এমনিতেও অতীন অকৃতদার, তার ওপর প্রথম যৌবনেই মা-বাবা দেহ রাখেন, তার বাড়ি যাবার তেমন তাড়া থাকে না। বুড়ি কাজের লোক পুষ্পদি ছাড়া অতীনের তিন কুলে কেউ নেইও। পুষ্পরানি এ বাড়িতে সর্বক্ষণের কাজের লোক হয়ে আসেন যখন অতীন জন্মায়। সেই থেকে রয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা, সার্বজনীন পুষ্পদি হয়ে। এই বুড়ি ছাড়া অতীনের তিন কুলে আর কেউ নেই। ফলে যখন খুশি বাড়ি ফেরার এই স্বাধীনতাটা খুব আয়েশ করেই উপভোগ করে অতীন। বাপ-মা একটা দোতলা বাড়ি আর মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স রেখেই দেহ রেখেছেন, টাকার খুব একটা টানাটানি অতীনের নেই, সে নিজেও একটা এফ এম সি জি কম্পানির ট্রেড মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিসেবে কাজ করে, মাইনে খারাপ না, তদুপরি ইন্সেন্টিভ তো আছেই। তার স্বভাবচরিত্র ভালো, পাড়াপড়শিরা তাকে ভালোবাসেন, রাস্তায় দেখা হলে খোঁজ নেন। বার্সিলোনা, পলিটিক্স, ইস্টবেঙ্গল, সিনেমা এসব নিয়ে অতীন সুখেই আছে।

অতীনের শখ বলতে শুধু একটিই, অ্যান্টিক কিউরিও কেনা। তার মাসিক হাতখরচের বেশিটাই চলে যায় টুকটাক পুরোনো জিনিস কিনতে। অবশ্য খুব বেশি দামি কিছু না, এই একটা টেবিলঘড়ি কি পুরোনো আফ্রিকান মুখোশ, এই আর কী। আজকাল আবার ঝুঁকেছে মূর্তি কেনার দিকে। ঘরের একটা কোণ ফাঁকা আছে। তক্কেতক্কে আছে, ভালো দাঁওতে একটা মূর্তি পেলে কিনে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখবে।

তাই মূর্তিটাকে দোকানে দেখেই ভারি পছন্দ হয়ে গেল অতীনের। ফুট তিনেক মতন লম্বা, পিতলের তৈরি দেবীমূর্তি। সারা মূর্তিটা সবজেটে নীল রঙের। মুকুট ও অন্যান্য অলংকারের ডিজাইন দেখে মনে হয় তিব্বতীয় বৌদ্ধমূর্তি। আরেকটু ভালো করে দেখবে বলে মূর্তির কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে দেখতে লাগল অতীন।

দেবীমূর্তিই বটে। পদ্মের ওপর বসে আছেন দেবী, ডান পা নীচে নামানো, বাঁ-পা ভাঁজ করে ডান পায়ের হাঁটুর ভাঁজে ঢোকানো। দেবীর চার হাত, নীচের বাঁ-হাতে বীণা ধরে আছেন, ডান হাতে অভয়মুদ্রা।

বৌদ্ধদের মধ্যে সরস্বতীপুজোর প্রচলন ছিল নাকি? ধন্দে পড়ে গেল অতীন। আস্তে আস্তে চোখ দুটো ওপরে তুলল অতীন, আর ওপরের হাত দুটোর দিকে নজর পড়তেই থমকে গেল,

ওপরে ডান হাতে খড়্গ, আর বাঁ-হাতে নরকরোটি!!!

আজ অবধি এমন অদ্ভুত কম্বিনেশনের মূর্তি একটিও দেখেনি অতীন। একইসঙ্গে খড়্গ, করোটি আর বীণা? দেবীর মুখে স্তিমিত প্রসন্ন হাসি, নেশাতুর নয়ন। আর অত্যন্ত আবেদনময়ী শরীর। সারা মূর্তি জুড়ে আঁটোসাঁটো যৌনতা ফেটে পড়ছে যেন। পীনোন্নত স্তনযুগল, তার ওপর চওড়া কাপড়ের পট্টি বাঁধা আছে কাঁচুলি হিসেবে, যদিও এই মদোন্মত্ত যৌবন দুটিকে আটকে রাখা তার সাধ্য নয়। সরু কোমর, একটা কটিবন্ধনী দিয়ে আবৃত। একটি স্নিগ্ধ রম্যশ্রী সমগ্র মূর্তি জুড়ে লেগে আছে, শান্ত শৃঙ্গাররসের এমন গ্রেসফুল প্রকাশ আর দেখেনি অতীন। সে আরও মুগ্ধ হল মূর্তিকারের হাতের কারুকাজ দেখে। নাভি থেকে স্তনযুগলের মাঝ অবধি যে লোমরাজি উঠে এসেছে, সেটিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটে উঠেছে মূর্তির মধ্যে। এমন সূক্ষ্ম হাতের কাজ অতীন শেষ কবে দেখেছে নিজেই মনে করতে পারল না।

'বাহ, সুন্দর তো' তৃপ্ত মুখে উঠে দাঁড়াল অতীন, মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে মূর্তিটি বিলক্ষণ পছন্দ হয়েছে তার। মোবাইল পকেটে ঢুকিয়ে গলা তোলে সে, 'বাবা সুবেশ, কীরকম দাম রেখেছিস এটার? দেখিস, গলা কাটিস না কিন্তু ভাই, হ্যা হ্যা হ্যা।'

সুবেশ খিঁচিয়ে ওঠে 'হ্যাঁ রে শালা, তোর গলা কেটে তো হেব্বি পয়সা পাব কিনা, চিপ্পুস কঁহিকা। শালা, নিবি তো একটা কাঁথা কি ভাঙা ঘড়ি, তারজন্য আবার দরাদরি কীসের অ্যাঁ? দ্যাখ ভাই, পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি, ভালো মাল দেখলে কিন্তু ছাড়াছাড়ি নেই, যেমন গুড় ঢালবে...' বলতে বলতে এদিকেই এগিয়ে আসছিল সুবেশ। হঠাৎ করে মূর্তিটার দিকে চোখ পড়তে থমকে যায়, 'ওহ, ইয়ে, মানে এইটাই পছন্দ হল নাকি তোর?'

'হ্যাঁ, আপত্তি আছে তোর?' হাসতে হাসতেই বলে অতীন, কিন্তু পরক্ষণেই সুবেশের মুখ দেখে একটু সিরিয়াস হয়ে পড়ে, 'কী রে, কী হল রে? গম্ভীর হয়ে গেলি কেনো? এনিথিং রং উইথ দ্যট স্ট্যাচু?'

সুবেশ কিছু কথা না বলে পকেট থেকে একটা গোল্ড ফ্লেক কিং সাইজ বার করে অতীনকে দেয়, নিজেও একটা বার করে, তারপর তার ফিল্টারের দিকটা অন্যমনস্কের মতন দোকানের কাউন্টারের ওপর ঠুকতে থাকে। সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে সরু চাউনিতে সুবেশকে এক বার মেপে নেয় অতীন। যথেষ্ট প্র্যাকটিক্যাল চালু জিনিস এই সুবেশ আগরওয়াল। এসব নাটক করে দাম বাড়াচ্ছে না তো?

'মূর্তিটা তুই এমনিই নিয়ে যা। আসলে ওটা আমি কিনিনি, একজন দিয়ে দিয়েছে, বুঝলি। এমনিই দিয়েছে, ফ্রি তে, এক পয়সা নেয়নি। শালা কীসের কার মূর্তি আমি নিজেও জানি না। ভাবলাম একবার প্রফেসর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যর কাছে নিয়ে যাই। তিব্বতি মূর্তিটুর্তি লাইনে উনিই অথেনটিক কিনা। তারপর তো খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি উনি অনেকদিন আগেই অফ হয়ে গেছেন। এখন ভাবছি কার কাছে যাই। ভালো করে না জেনে শালা দামও হাঁকতে...

'আহহ, বড্ড বাজে বকিস তুই সুবেশ', ধমক দেয় অতীন, 'মালটা পেলি কী করে আগে সেইটা বল।'

'ওহ, হ্যাঁ, দাঁড়া বলছি', বলে সিগারেটটা ধরিয়ে একটা সুখটান দেয় সুবেশ, তারপর শুরু করে,

'লাস্ট উইকে, বুঝলি, বামুনগাছি গেছি। চিনিস তো? দমদম ক্যান্টনমেন্ট লাইনে। খবর ছিল এক পুরোনো জমিদার বাড়ি ভাঙা পড়ছে। পুরোনো মানে প্রায় ছ-শো বছরের পুরোনো স্ট্রাকচার। প্রতি এক-শো দেড়-শো বছর অন্তর অন্তর রিমডেলিং আর সারাই করে জমিদার ফ্যামিলি ওখানেই আছে ছ-শো বছর ধরে। লাস্ট মেজর রিস্ট্রাকচারিং নাকি সিপাইবিদ্রোহের পরের বছর হয়, প্রায় এক-শো সত্তর বছর আগে। বাড়ির তখনকার মালিক নাকি নুনের আর কাটা কাপড়ের ট্রেডিং করে প্রচুর পয়সা কামায়। প্রচুর মানে প্রচুর। পরের সাত জেনারেশন বসে খেতে পারে এমন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে আর পাঁচটা বাঙালি জমিদার বাড়ির মতন এদের মধ্যে কোন শরিকি বিবাদ দেখা দেয়নি। যার আলাদা হবার কথা, নির্বিবাদে নিজের পাওনাটা

নিয়ে চুপচাপ কেটে পড়েছে। নো মামলা মোকদ্দমা, নো হাঙ্গামা। তা প্রেজেন্ট জেনারেশনের যিনি মালিক, নারায়ণ চক্রবর্তী, তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে থাকে ইউ এস এ-তে। ছেলে সফটওয়্যারে আছে, হেবি উঁচু পোস্ট আর সেইরকম মাইনে। সাউথ সিটিতে পনেরো-শো স্কোয়ারফিটের ফ্ল্যাট, বুঝলি? দুই ভাই-বোনে হেব্বি ভাব মাইরি, না দেখলে বিশ্বাস হয় না শালা, আমাদের ফ্যামিলিতে তো ভাবাই যায় না। সে যাক গে। তা এই চক্কোত্তি মশাই তো গত মাসে পটল তুলেছেন। ইউ এস থেকে মেয়ে জামাই, কলকাতা থেকে ছেলে বউ, দুই পক্ষের একগাদা বাচ্চাকাচ্চা মিলে এসে হাজির। প্রচুর খরচাপাতি করে, আশেপাশের দশ গ্রামের লোক খাইয়ে তারা চক্কোত্তি ফ্যামিলির নাম রাখল। তারপরেই তো চিত্তির। অত বড়ো প্রপার্টি দেখবে কে? দু-দিনে পার্টির পেটে যাওয়া তো নিশ্চিত। তা ছেলে আর জামাই দু-জনেই বুদ্ধি করে বামুনগাছি আসার আগেই দালাল লাগিয়ে এসেছিল। খাঁটি ঘি দুধ খাওয়া ব্রেন ভাই, তোর আমার মতন নাকি?

তা শ্রাদ্ধশান্তি শেষ, দালাল তো খুবই চটপটে লোক, কেনার লোক এনে হাজির। দু-দিনের মধ্যে সইসাবুদও শেষ। শোনা যায় কোটি টাকার কাছাকাছি ডিল, গ্রামের হাওয়া তাই নিয়ে দেখলাম খুব গরম।

তা এই যে দালাল, বুঝলি, আমারই জাতভাই, নাম রাজকমল গিলরা, সেই আমাকে নিয়ে যায় জমিদার বাড়িতে। তোকে তো আর বলতে হবে না, বেঙ্গলের এইসব পুরোনো জমিদার বাড়ি এক-একটা অ্যান্টিক আর কিউরিওর ডিপো। পুরোনো বই থেকে শুরু করে ঝাড়লণ্ঠন, ওয়াল ক্লক, পেইন্টিং, সেজবাতি, এমনকী রাইটিং ডেস্ক আর থালা বাসন অবধি! তা আমিও দালালের দেশোয়ালি ভাই হবার সুবাদে বেশ কিছু জিনিস ভালো জিনিস বেশ সস্তা দরেই পেয়ে গেলাম বুঝলি? তারপর টাকাপয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় ওদের যে পুজো করার ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক, তিনি এসে এইটে রাখলেন আমার সামনে, বললেন, এইটে নিয়ে যান, পয়সা দিতে হবে না।'

এতটা বলে একটু থামল সুবেশ। অতীন বলে উঠল, 'সে কি রে, ওদের জিনিস, পুরুতমশাই এসে বিলিয়ে দিলেন? ওরা কিছু বলল না?'

ভ্রু কুঁচকে কী যেন ভাবল সুবেশ, তারপর বলল, 'যেটা বুঝলাম, এই পূজারি ব্রাহ্মণটি অনেকদিন ধরে এই জমিদার বাড়ির সঙ্গে যুক্ত। খুব সম্ভবত জেনারেশন ধরে এরা পুজো করে এসেছে। বুঝিসই তো, এইসব জায়গায় একটা জোর এসেই যায়। জামাই বোধ হয় এক বার বলতে গেছিল যে অমন অ্যান্টিক মূর্তি ফ্রিতে দিয়ে দেওয়াটা ঠিক কি না। মেয়ে তো দাবড়েই থামিয়ে দিল, বলে জ্যেঠু যা করছে নিশ্চয়ই ভালোর জন্যেই করছেন। বুঝলাম, এই ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটিকে ওরা খুব রেসপেক্ট দেয়।'

আবার থামল সুবেশ। সেই সুযোগে সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অতীন বলল, 'তা ফোকটে পেয়েছিস ভালো কথা। এখন কথা হচ্ছে নিশ্চয়ই এটা পুজো করা হত না, কারণ পুজো করা মূর্তি কেউ বিক্রিও করে না, কাউকে এই ভাবে দেয়ও না। দিলে মন্দিরে দেয় বা কারো বাড়িতে দেয়, যাতে পুজোটা বরকরার থাকে, তাই না? তা এই অ্যান্টিক জিনিসটা তোকে এমন ফ্রি-তে বিলিয়ে দেওয়ার কারণটা জিজ্ঞেস করিসনি?'

বেশ খানিকক্ষণ ভ্রু কুঁচকে কী যেন ভাবল সুবেশ, 'একটা কথা কী মনে হল জানিস? হয়তো বা মনের ভুলই হবে, বাকি কাজের লোকজনকে দেখলাম মূর্তিটাকে এড়িয়ে চলতে। ইন ফ্যাক্ট বাড়ির লোকজনেরও দেখলাম, মূর্তিটার প্রতি একটা ভয় বা দূরে রাখার প্রবণতা আছে। পুরুতমশাই ছাড়া কেউ ছোঁয়নি ওটা। উনি এসে রাখলেন, আমিও তুলে নিয়ে এলাম। যখন নিয়ে আসছি, ঠাকুরমশাইকে দেখলাম বিড়বিড় করে কী একটা মন্ত্র পড়তে। কি জানি, নিয়ে আসার সময় একটু অস্বস্তিই হচ্ছিল আমার বুঝলি?'

দু-মিনিট কী একটা ভাবল অতীন, তারপর বলল, 'আসলে একটু বিটকেল দেখতে তো, তাই বোধ হয়... গ্রামের দিকের লোকজন সব, এমনিতেই সুপারস্টিশনের ডিপো। তুই আমাকে দে তো। আমি নিয়েই যাই। পয়সাকড়ি না হয় তুই যা বলবি সেরকম দিয়ে দেবো'খন পরে, কেমন?'

হেসে ফেলল সুবেশ, ‘আরে তুই নিয়ে যা তো। তোর সঙ্গে কি টাকার সম্পর্ক নাকি রে আমার? যখন যা মনে হয় দিস। তবে সাবধানে রাখিস ভাই। আমারই একটু কেমন কেমন লাগে মূর্তিটার দিকে তাকালে।

এবার অতীনও হেসে ফেলল, ‘এই বয়সে তোর কি ভীমরতি ধরল সুবেশ, দিস ইজ জাস্ট আ স্ট্যাচু ইয়ার।’

সুবেশ একটু সিরিয়াস হয়ে যায়, ‘তবুও, তুই একটু নিজের পুরুতঠাকুরকে দিয়ে দেখিয়ে নিস, বুঝলি? এই, জাস্ট মনে পড়ে গেল একটা ইম্পর্ট্যান্ট কথা। ওদের ওই পূজারি ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক কিন্তু সাধারণ অং বং চং আওড়ানো পুরুত নয়। এটা নিয়ে আসার সময় আমার কাজিন রাজকমল বলেছিল, উনি কিন্তু ওদিককার একজন বিশিষ্ট ইয়ে, বুঝলি? শুধু উনি কেন, ওনার বাপ, দাদা, মানে ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন অনুযায়ী ওনারা খুব বিখ্যাত ইয়ে।’

‘আহ, ইয়েটা আবার কী?’ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে অতীন।

কাছে এসে, কাউন্টারের ওপর মুখ নামিয়ে খুব গোপন খবর দেবার ভঙ্গীতে ফিসফিস করে বলে সুবেশ, ‘তান্ত্রিক, ওনারা ওদিককার খুবই বিখ্যাত তান্ত্রিক, বুঝলি?’

* * *

পরের দিন সকালে ভবেশবাবু অভ্যেসমতন এক কাপ চা খেতে এসে ঘরের কোণে রাখা মূর্তিটাকে দেখে ভ্রু কুঁচকে ফেললেন, ‘এটা আবার কোত্থেকে জোটালে অতীন?’

ভবেশ ভট্টাচার্য অতীনের বাবা অজয় মুখুজ্জের বাল্যবন্ধু, প্রায় ঘুনসি পরার সময়কার ইয়ারি আর কী! সেই থেকে ভদ্রলোক অতীনের বাড়ির একজন হয়ে গেছেন। ইতিহাসের প্রফেসর ছিলেন, সদ্য রিটায়ার করেছেন। অকৃতদার, গোঁড়া ব্রাহ্মণ এই ভদ্রলোকের একমাত্র নেশা বই। অতীনের মা এঁকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, দাদা বলে ডাকতেন ও মান্য করতেন। তবে এ বাড়িতে এঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচিতি হচ্ছে যে ইনি অতীনের ঠাকুরদা, বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আশুতোষ মুখার্জির প্রিয়তম শিষ্য। দরিদ্র উদ্বাস্তু পরিবারের এই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রটিকে আশুতোষবাবু প্রায় বুকে তুলে মানুষ করেছেন। শোনা যায় এককালে কিশোর ভবেশের খাওয়া-পরার খরচাও আশুতোষবাবু নিজের পকেট থেকে দিতেন। ভবেশবাবু অবশ্য নিরাশ করেননি শিক্ষাগুরুকে, বি এ, এম এ, দুটোতেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে এলাকার মুখোজ্জ্বল করেন। আধা খ্যাপাটে, আজীবন ব্যাচেলর এই ইতিহাসের প্রোফেসরটি এলাকাতে যুগপৎ ভীতি ও সম্মানের উদ্রেক করে থাকেন। তবে মুখুজ্জে পরিবারের প্রতি এঁর আজন্মলালিত টান আজও যায়নি। রোজ সকালে আসেন, এক কাপ চা খান, অতীনের কুশল মঙ্গল জিজ্ঞেস করেন, তারপর পাড়ার লাইব্রেরিতে গিয়ে বসেন। এঁর জন্যেই অতীনের মনে হয় মাথার ওপর একটা ছাদ এখনও যেতে যেতেও যায়নি।

ভবেশবাবু যখন প্রশ্নটা করেন, তখন অতীন স্নান করে এসে তোয়ালে দিয়ে মাথা ঘষছিল। হাসিমুখে বলে, ‘মূর্তিটা ভালো না কাকু? সুবেশের দোকান থেকে কাল নিয়ে এলাম। আরে আমার ওই বন্ধু যার কিউরিওর দোকান আছে। আপনি দেখেছেন ওকে বেশ কয়েক বার।’

ভবেশবাবু মূর্তিটাকে দেখছিলেন, চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কত পড়ল?’

অতীন হেসে ফেলে, ‘এখন অবশ্য এমনিতেই দিয়েছে, পরে পয়সা নেবে যদিও। কী করে ও মূর্তিটা পেল সেটা কিন্তু একটা বেশ ইন্টারেস্টিং কিস্যা, শুনবেন নাকি?’ জবাবে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়েন ভবেশবাবু। অতীনও বেশ গুছিয়ে পুরো ঘটনাটি বিবৃত করে।

ততক্ষণে চায়ের তলানিটুকু অবধি খেয়ে মূর্তির কাছে গিয়ে অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে হাঁটু গেড়ে বসেছেন ভবেশবাবু। খানিকক্ষণ বাদে উঠে এসে নিজের চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসে তারপর বলেন, ‘দেখো অতীন, যতটুকু বুঝলাম, এই মূর্তি কোনো সাধারণ দেবীমূর্তি নয়। সম্ভবত ইনি কোনো তান্ত্রিক মতের দেবী।

স্যার, মানে তোমার দাদু তন্ত্রমন্ত্র নিয়েও যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন, জানো নিশ্চয়ই। তোমার বাবা অবশ্য কমিউনিস্ট হয়ে গিয়ে এসব আর বিশ্বাস করত না। স্যার আমাকেও কিছু কিছু শিখিয়েছেন, যদিও সেসব আমার বিশেষ মনে নেই, তবে...' বলে জানলা দিয়ে আকাশের দিয়ে চেয়ে একটু অন্যমনস্কই হয়ে গেলেন ভবেশবাবু। তারপর খেই ফিরে পেয়ে বললেন, 'যদ্দূর মনে হচ্ছে, বুঝলে, এটা তিব্বতের জিনিস, থারটিন্থ সেঞ্চুরির বা আশেপাশের। তখন ভারতে ইসলামিক আক্রমণ শুরু হয়েছে, তার চাপে বৌদ্ধরা বেশ কোণঠাসা। বৌদ্ধ গুরুরা যাবতীয় পুঁথিপত্র নিয়ে পালালেন তিব্বতে। তিব্বতি বুদ্ধধর্ম, বা বজ্রযান শাখা নতুন ইন্ধন পেয়ে আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠল। এটা ওই সময়েরই, কারণ এর মধ্যে কিছু হিন্দু ইনফ্লুয়েন্স দেখতে পাচ্ছি। তার আগেকার বজ্রযান মূর্তিতে এত হিন্দু ইনফ্লুয়েন্স... উঁহু, এটা ওই থারটিন্থ বা ফোরটিন্থ সেঞ্চুরিরই জিনিস হে। কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সটা কি, সেটাই ধরতে পারছি না', বেশ চিন্তিত দেখায় ভবেশবাবুকে।

একটা টি-শার্ট গলাতে গলাতে কৌতূহলী গলায় প্রশ্ন করে অতীন, 'বজ্রযান বলতে?'

ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক দৃশ্যতই ভারি খুশি হয়ে ওঠেন, 'বলি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসটা মনে আছে তো? ফোর্থ সেঞ্চুরি বিসিতেই বৌদ্ধধর্ম দুটো ভাগ হয়ে গেল, হীনযান অ্যান্ড মহাযান। অনেকে আবার এই হীনযান না বলে থেরবাদী বুদ্ধিজম বলেন, যদিও দুটো আলাদা, বুঝলে? তা বৌদ্ধধর্ম তো তারপর এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যখন, ধরো থার্ড বা ফোর্থ সেঞ্চুরিতে বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রবেশ করল, তখন তার সঙ্গে স্থানীয় বঁ বা বন উপজাতির শামানিস্ট ধর্মগুরুদের সঙ্গে লাগল লড়াই। এরপর নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে, তরাই, উত্তর বিহার অ্যান্ড উত্তর বেঙ্গল, সিকিম ইত্যাদি জায়গায় প্রচলিত বিভিন্ন তান্ত্রিক রিচুয়ালস আত্মীকরণ করে তিব্বতে মহাযানের নতুন রূপ হয়, নাম হয় বজ্রযান। এই বুদ্ধমত কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত। বিচিত্র সব দেব-দেবীর পূজা, মুদ্রা মন্ত্র ও মণ্ডল নিয়ে নানা গোপন রিচুয়ালস, এই হল এদের মুখ্য ধর্মাচরণ। বজ্র অর্থে কিন্তু এখানে ডায়ামন্ড বা হিরে, ভাবার্থে ঈশ্বরপ্রাপ্তির পক্ষে সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং শক্তপোক্ত যান বা বাহন। ওদের ভাষায় বলে দোরজে।

বজ্রযান যাকে বলে সত্যিকারের স্টেট রিলিজিয়ন হয়ে ওঠে সিক্স ফিফটি নাগাদ, তিব্বতের তেত্রিশতম রাজা সং-শেন-গাম্পোর সময়ে, যিনি দুইজন বৌদ্ধ প্রিন্সেসকে বিয়ে করেন, এক জন চায়নার, এক জন নেপালের। এরপর আট-শো সতেরো নাগাদ তিব্বতে আসেন তিব্বতীয় বুদ্ধিজমের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র, গুরু পদ্মসম্ভব, ওরা বলে গুরু রিনপোচে। তান্ত্রিক বুদ্ধিজম নেভার হ্যাড টু লুক ব্যাক ফ্রম দেন। বাংলা আর বিহারে তখন পালরাজাদের আমল।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিল অতীন। ভবেশবাবু থামলে বলে উঠল, 'আর ইয়ে, অতীশ দীপঙ্কর বলে আরও কে একজনও যেন গেছিলেন না?'

মোটা চশমার ওপর দিয়ে ভবেশবাবু খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে অতীনকে নিরীক্ষণ করেন, তারপর রুমাল বের করে কপালের ঘাম মোছেন, 'অতীশ দীপঙ্কর কে একজন বলছ অতীন? আমাদের বাঙালিদের দুর্ভাগ্য, আমরা পৃথিবীর খবর রেখে বিশ্ব নাগরিক সাজতে ভালোবাসি, কিন্তু নিজেদের ইতিহাস জানি না। বা জানলেও বলতে লজ্জা পাই। বলি বাঙালিদের মধ্যে অমন মেধাসম্পন্ন, ধীশক্তির লোক খুব কমই জন্মেছেন, সেটা জানো কি? হ্যাঁ, উনিও তিব্বতে যান ধর্মপ্রচার করতে, খুব সম্ভবত হাজার বেয়াল্লিশ সাল নাগাদ।'

অতীন একটু মিইয়ে গেছিল। ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'তা এর সঙ্গে এই মূর্তির সম্পর্ক?'

ভবেশবাবু একটু গম্ভীর হয়ে যান। 'তান্ত্রিক বুদ্ধিজম বিশাল শাস্ত্র হে। উড্ডীয়ান, কামাখ্যা, শ্রীহট্ট অর্থাৎ সিলেট ও পূর্ণগিরি, এই পাঁচটি হচ্ছে তান্ত্রিক বুদ্ধিজমের সবচেয়ে রেসপেক্টেড প্লেস। এই মতে তথাগত বুদ্ধের অবদান যতটা, ততটাই অবদান বাংলার তন্ত্রসাধনার ঐতিহ্যের। বাংলার মাতৃসাধনাকেন্দ্রিক তন্ত্রাচারে যেমন অনেক ভয়ানক ও শক্তিশালী দেব-দেবীদের নাম শুনেছ, এখানেও একই কেস। এই মতে আদিবুদ্ধের পাঁচটি ধ্যানমূর্তি আছে, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। এঁদের প্রত্যেকের আবার বিভিন্ন মন্ত্রপদ, মুদ্রা, বাহন এবং প্রতীকচিহ্ন আছে। আর বিভিন্ন মূর্তির জন্যে আছেন বিভিন্ন শক্তি,

মানে দেবীরা। এঁদের অনেকেই খুব রাগী এবং ভয়ংকর। যেমন বজ্রবারাহী, হেরুক বা তাঁর বিভিন্ন রূপ যেমন বুদ্ধকপাল সম্বর, এ ছাড়া যমারি, বজ্রচর্চিকা ইত্যাদি। খেয়াল করলে দেখা যায় হিন্দু তন্ত্রের সঙ্গে এই সব দেব-দেবীদের কোথাও একটা যোগসূত্র আছেই। অনেক তন্ত্রের নামও একই, যেমন ধরো ভূতডামর। অনেক দেব-দেবীদের নামও সেম, যেমন মহামায়া। কোনো কোনো জায়গায় নাম এক না হলেও মূর্তি এক, যেমন দেবী বজ্রযোগিনীর বর্ণনা এক্কেবারে দেবী ছিন্নমস্তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।'

এতটা বলে থেমে যান ভবেশবাবু, তারপর উঠে দাঁড়ান, 'কিন্তু এই মূর্তিটা স্পেশাল হে। কোন ক্যাটেগরিতে ফেলব বুঝতে পারছি না। দাঁড়াও বাপু, একটু পড়াশোনা করে নিই। কোথায় যে এর রেফারেন্স পাব...' বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে যান বৃদ্ধ প্রফেসর, 'তদ্দিন আর বিশেষ নাড়াঘাঁটা করো না বাপু, কোথাও একটা ক্যাচ আছে, বুঝলে। অদ্ভুত দেবীমূর্তি, দোকানদার তোমাকে এমনিই দিয়ে দিল, তাকে আবার পুরোনো জমিদার বাড়ির তান্ত্রিক পুরোহিত এমনিতেই দিয়েছে, না হে, কিছু তো একটা...'

সেদিন রাতেই অতীন স্বপ্নে দেখল এক দেবীমূর্তি। অসাধারণ অপরূপা এক দেবী অতীনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন, 'আমাকে এভাবে রেখো না অতীন। যখন ঘরে এনেছ, আমার পূজা কর। তোমার কল্যাণ হবে।'

পর পর তিন রাত ঠিক একই স্বপ্ন দেখল অতীন।

* * *

কয়েক দিন বাইরে গেছিলেন ভবেশবাবু, একটা সেমিনারে যোগ দিতে। যেদিন ফেরেন, সেইদিন সন্ধে নাগাদ অতীনের বাড়িতে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন ভবেশবাবু। বাইরের বসার ঘর থেকেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে অতীনের স্টাডি রুমের একটা দিক সাফসুতরো করে সেখানে একটা কাঠের জলচৌকি রাখা, তার ওপর লাল চেলি বিছিয়ে সেই দেবীমূর্তি, গলায় রক্তজবার মালা। ধূপ আর গুগগুলের গন্ধ এতদূর থেকেও পাওয়া যাচ্ছে।

অতীন অফিস থেকে ফিরে স্নান করে এদিকেই আসছিল, ভবেশবাবুকে দেখে একটু সংকুচিতই হয়ে পড়ে, চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আসুন কাকু, বসুন', বলেই পুষ্পাদির উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ে চা দিয়ে যাবার জন্যে।

ভবেশবাবু তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসেন, অতীনের পরনের লাল লুঙ্গিটি লক্ষ্য করেন, তারপর তীক্ষ্ণ চোখে অতীনকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি চা খাবে না?'

অতীন একটু বিব্রত হাসি হেসে বলে, 'না কাকু, আমি একেবারে পুজো দিয়ে খাব।'

ভবেশবাবু অত্যন্ত বিস্মিত হন, 'সে কি হে? পুজো দিয়ে খাবে মানে? তোমার আবার ধম্মেকম্মে মতি হল কবে থেকে, অ্যাঁ? তুমি কলেজে এস এফ আই করতে না? তুমি নাকি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় পৈতে দিয়ে জুতোর ফিতে বানিয়েছিলে? তা হঠাৎ এখন আবার এদিকে?'

অতীন খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে বসে থাকে, তারপর স্বপ্নাদেশের পুরো কথাটা খুলে বলে ভবেশবাবুকে।

ভবেশবাবু ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে অতীনের দিকে, তারপর বলেন, 'দেখ অতীন, আমি একটু প্রাচীনপন্থী লোক, জনই তো। এই নিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে আমার কম ঝামেলা লাগত না। আমি স্বপ্নাদেশ মানি বলব না, তবে এখনও যে অনেক কিছুই যুক্তি দিয়ে এক্সপ্লেইন করা যায় না সেটা মানি। বামুনের ছেলে, পুজোআচ্চায় মতি হয়েছে সে ভালোই, আমি তোমাকে আটকাব না। তবে...'

'তবে কী কাকাবাবু?'

'তোমার মতন বামপন্থী রাজনীতি করা ছেলে তিন দিনের স্বপ্নাদেশেই এক্কেবারে মাথা মুড়িয়ে বামাক্ষ্যাপা হয়ে গেলে, জানি না কেন বাপু, আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছে হে। এসব বুড়ো বয়সে হয় বাবা, তখন মনের

জোর কমে যায়, মৃত্যুভয় আসে। তখন মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করা শুরু করে। তোমার তো সে বয়েস হয়নি বাপু। কেসটা কী খুলে বল দেখি হ্যাঁ' এই বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অতীনের দিকে তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ ভূয়োদর্শী অধ্যাপকটি। অতীনের চোখ দুটো একটু লাল আর অস্থির অস্থির মনে হয় ওঁর। গালে দাড়ি, একটু অবিন্যস্ত ভাব, ডাক্তার দেখাবেন নাকি? না থাক, আজকালকার ছেলে, কী মনে করে বসবে। উনি পরের প্রসঙ্গে যান,

'আরও একটা কথা, বলি এই মূর্তিটাই পেলে পুজো করার জন্যে? এখনও তো জানাই গেল না ইনি কে, কার মূর্তি। প্রত্যেক দেব-দেবীদের পূজা পদ্ধতি আলাদা হয় অতীন। বীজমন্ত্র আলাদা হয়, প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র আলাদা হয়। একের মন্ত্রে অন্যের পুজো করলে এঁরা কুপিত হন। তুমি মোড়ের কালী মন্দিরের ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলে এই পুজো করা নিয়ে? কীভাবে কি করতে হয় জানো কিছু?'

অতীন আরও বিব্রত হয়ে পড়ে, 'না কাকু, কারও সঙ্গেই কথা হয়নি। আমার মনে হল সব দেবীই তো শক্তির অংশ, মাতৃমূর্তি, তাহলে আর অত ইয়ে মেনে চলে কি হবে? আমি নিজের মতন করে একটু পুজোটুজো করে নিই। ওই আর কী, ধূপধুনো ফুল মালা আর কিছু ফলপ্রসাদ।'

ভবেশবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েন, 'ওহে তুমি কি সাধক রামপ্রসাদ না স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ, যে মা মা বলে কাঁদলেই মহামায়া নিজে এসে বেড়া বেঁধে দেবেন? স্পষ্ট বলছি যে এটা তান্ত্রিক মূর্তি, বৌদ্ধতন্ত্র নিয়ে সামান্যতম আইডিয়া আছে তোমার? কোথা থেকে কি হয়ে যাবে কোনো ধারণা আছে? এ কি ছেলেখেলা নাকি, অ্যাঁ? আরে আমি খোঁজ লাগাচ্ছি বাপু, বিদেশের বেশ কিছু ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের সঙ্গেও কথা চলছে এই মূর্তিটা নিয়ে। এ অত্যন্ত ইউনিক মূর্তি বাপু, এর আলাদা হিস্ট্রি আছে। সেসব না জেনে বুঝে এমন সময়ে হুটপাট করে কিছু একটা করে বসার কোনো দরকার আছে কিছু, অ্যাঁ?'

খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে থেকে চোখ তোলে অতীন, ভবেশবাবুর বুকটা ধক করে ওঠে, দু-মিনিটের মধ্যে ওর চোখ দুটো অত লাল হয়ে গেল কী করে? চোখের মণি দুটো অত ওপরের দিকে ওঠা কেন? অপরিচিত একটা ঘষা গলায় অতীন বলে, 'মায়ের পুজোয় বাধা দেবেন না কাকু, প্লিজ, মা আমাকে ডাকেন, ভালোবাসেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, মা আমার ভালো চান, আমাকে দেখেন, আমার সেবাযত্ন নেন, মা আমাকে চান, মা আমার সব বোঝেন, মা আমাকে ভালোবাসেন, মা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, আপনি বুঝবেন না কাকু...'

সেই স্বগত প্রলাপোক্তির মধ্যে ভ্রু কুঁচকে উঠে দাঁড়ান ভবেশ ভট্টাচার্য। নিজে অকৃতদার হলে কী হবে, অতীন ওঁর নিজের সন্তানতুল্য। আসন্ন অমঙ্গলের একটা আবছায়া আভাস পেলেন ভবেশবাবু, তারপর ধীরপায়ে বেরিয়ে গেলেন। ভালো না, ভয়ংকর একটা কালো ঝড় ধেয়ে আসছে, স্পষ্ট বুঝতে পারলেন সেই বৃদ্ধ প্রফেসর, তারপর চোয়ালটা শক্ত করলেন। ঠিক হ্যায়, দেখা যাক কে জেতে, উদ্ভট এই মূর্তির উৎকট 'মাতৃস্নেহ' না উদ্বাস্তু বাঙালের জেদ।

বেরিয়ে আসার সময় ভবেশবাবু দেখলেন যে পুষ্পদি উদ্বিগ্নমুখে তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছেন দরজার কাছে, ফিসফিস করে বলেন, 'ও দাদা, অতুকে একটা ভালো দেখে ডাক্তার দেখাও না গো। ছেলেটা কেমন করছে ক-দিন থেকে। ভালো করে খায় না, ঘুমায় না। রাত-দিন বিড়বিড় করে। আমি তো বাইরের ঘরে শুই, মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে শুনি কেমন অদ্ভুত গলায় মা মা বলে কাঁদছে। আমার বুকটা ধড়ফড় করে গো, ভয় লাগে। তখন না, ডাকলে সাড়া অবধি দেয় না। ছেলেটা কি পাগল হয়ে গেল দাদা, হ্যাঁ? ওর মা যে মরে যাবার সময় আমার হাত ধরে বলে গেল, ছেলেটাকে দেখো পুষ্প। অতুর যদি কিছু হয়ে যায়? মরে গিয়ে দিদিকে কী জবাব দেব দাদা? ও দাদা, আমার বলার মতন আর কেউ নেই গো, তুমিই কিছু কর না গো', বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন সেই প্রৌঢ়া।

সন্তানহীনা, রক্তের সম্পর্কে অনাত্মীয়া সেই স্নেহশীলা মহিলাটির মাথায় এক বার হাত রাখেন ভবেশবাবু, তারপর বেরিয়ে যান।

সেই রাতেই ফের স্বপ্নাদেশ পেল অতীন। সেই অপরূপ নারীমূর্তি অতীনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলছে, ‘বড়ো খিদে পেয়েছে অতীন, কিছু খেতে দাও, আমাকে কিছু খেতে দাওওও।’ সাপের শিষের মতো সেই আর্তকামনার মধ্যে মিশে ছিল কিছু কি বিপজ্জনক বিষ শিখা? অতীন দেখল যে সে নিজে মূর্তির পায়ের কাছে সাপের মতন আকৃতি নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে মাটিতে শুয়ে, সে ফণার মতন নিজের মাথাটি দু-হাত জড়ো করে বলছে, ‘কী খাবেন মা? যা চাইবেন, আমি তাই এনে দেবো, এক বার শুধু বলুন, কী খাবেন মা?’



সেই অপরূপা নারীমূর্তি অদ্ভুত হেসে বললেন, 'খাবার খাব অতীন। যে সে খাবার নয়, মহাক্ষুধা আমার। আমাকে জাগিয়েছ অনেক কাল পরে, তবুও জিজ্ঞেস করছ অতীন? আমার শরীর দেখোনি অতীন?'

'কী চাই মা আপনার?'

'ভোগ, মহাভোগ!'

* * *

এর কয়েক দিন বাদে যেদিন ডামরীকে ঘরে নিয়ে এল অতীন সে-দিনটা ছিল মঙ্গলবার, তার ওপর ছিল অমাবস্যা, ভোরের দিকে আংশিক সূর্যগ্রহণও ছিল।

নাহ, অতীনের চরিত্র যথেষ্ট পরিষ্কার। তা সত্ত্বেও এই ঘটনাটা কী করে ঘটে গেল সেটা পুষ্পদি বা ভবেশবাবু কেউই বুঝে উঠতে পারলেন না।

রায়চক রাডিসন ফোর্টে অতীনের কোম্পানির একটা কনফারেন্স চলছিল। দু-দিনের প্রোগ্রাম, দ্বিতীয় দিনের শেষে গালা ককটেল ডিনার। সেলসের ছেলেগুলো এমনিতেই মালখোর পাবলিক, তার ওপর কোম্পানির পয়সায় দামি স্কচ ফ্রি-তে পেলে কপাল অবধি মদ খায়। তারপর মাঝরাত্তির অবধি হুল্লোড় করে পরের দিন সকালে ফেরা। প্রতি বছরেই এই হয়, গত বছর অবধি অতীন এদের সঙ্গে সারারাত হুল্লোড় করেছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রিজিয়োনাল ম্যানেজার সাহেব নিজের হাতে সবাইকে স্কচের পেগ বানিয়ে দিয়েছেন, তারপর ডিজে চালিয়ে সমবেত উল্লাসনৃত্য।

কিন্তু কয়েক মাস ধরে অতীনের এসব ভালো লাগে না। কিছুই ভালো লাগে না। ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে না, কথা বলতে ভালো লাগে না, রেসের মাঠে যেতে ইচ্ছে করে না, সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে না, আড্ডা দিতে ভালো লাগে না, সুবেশের দোকানে যেতে ভালো লাগে না, মানুষের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না, হাসতে ইচ্ছে করে না, আনন্দ করতে ইচ্ছে করে না, এমনকী দুঃখ পেতেও ইচ্ছে করে না!

তার সমগ্র চৈতন্য, সত্তা জুড়ে সেই মূর্তি। মা খেয়েছেন? মা কি খুশি? মা তৃপ্ত হয়েছেন? আজ মা কখন ঘুমোতে যাবেন? মায়ের কি আজকের ভোগ পছন্দ হয় নি? মা কেন আজও গ্রহন করলেন না?

তার কাজে মন নেই। তার পারিপার্শ্বিক কিছুতে কোনো উৎসাহ নেই। সদাসর্বদা সেই দেবীমূর্তি তার সমস্ত অস্তিত্ব অধিকার করে নিয়েছে, এই এক মাসের মধ্যেই। তার বেশভূষা বেশ শৌখিন ছিল এককালে। একই শার্ট সে পর পর দু-দিন পরেনি কখনো, কাচা ইস্ত্রি করা শার্ট প্যান্ট ছাড়া তার চলত না। এখন তাকে চেনাপরিচিত কেউ দেখলে চমকে ওঠে। অনেকদিনের না কামানো দাড়ি, গাল গেছে ভেঙে। উলোঝুলো চুলগুলোকে কোনোমতে শান্ত করে রাখার চেষ্টা। জামাকাপড় কাচাকুচি বা ইস্ত্রির বালাই বিশেষ নেই, গা থেকে পুরোনো ঘামের টকপচা গন্ধ ছাড়ে। অফিস না যেতে হলে জুতোর বদলে হাওয়াই চপ্পলই চলে। কোনোদিকে কোনো হুঁশ নেই, কোনো খেয়াল নেই, কোনো বন্ধন বা আসক্তি নেই, ভালোবাসা নেই, ঘৃণা নেই, জীবনের স্বাদ নেই, মৃত্যুর ভয়ও নেই!

সুবেশ এসেছিল এ বাড়িতে, অনেকদিন অতীন ওর দোকানে যায়নি বলে খবর নিতে এসেছিল। কথা বলাবার অনেক চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে গেছে। যাওয়ার সময় পুষ্পদিকে আলাদা করে ডেকে নিজের নাম্বার দিয়ে গেছে, বলে গেছে দরকার হলে ফোন করতে।

অফিসেও এই নিয়ে কথা চলছে কলিগদের মধ্যে, বোঝে অতীন, হাসিখুশি ছেলেটার এই হঠাৎ পরিবর্তন কারোরই নজর এড়ায়নি। রিজিয়োনাল ম্যানেজার সাহেব বাঙালি, খুবই মাই ডিয়ার মানুষ। তিনিও কেবিনে ডেকে জানার চেষ্টা করেছেন হঠাৎ এই হাল কেন। অতীন জবাব দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত, রিক্ত, বিরক্ত। এই অকারণ জগতের অহৈতুকী কর্মব্যস্ততা, কৌতূহল, এসব নিয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন।

তার চালচলন বদলে যায় শুধু রাত্রিবেলায়। চোখে আসে উজ্জ্বল দীপ্তি। তখন সে স্নান করে একাগ্রচিত্তে পূজায় বসে। অনেক রাত অবধি পূজাপাঠ করে সে নিজে খেতে যায়, তার আগে সেই দেবীমূর্তির সামনে সযত্নে সাজিয়ে দিয়ে যায় ভোগ!

বিশেষ কিছুই না, যা যা তার বাড়িতে রান্না হয়, ঠিক তাই তাই সে সাজিয়ে দিয়ে যায় থালায়। তার বিশ্বাস ছেলে যা খায়, মা ও তাই-ই খাবেন নিশ্চয়ই।

পরের দিন সকালে উঠে দেখে ভোগ যেমনকার তেমনই, দেখে সে মুষড়ে পড়ে। আজও মা তার ভোগ গ্রহণ করলেন না? আর কতদিন মা তার সন্তানের পরীক্ষা নেবেন?

তারপর সেই মহাপ্রসাদ খেয়ে সে অফিসে যায়।

ভবেশবাবু পাড়ার মোড়ের পুরোহিতমশাইকে ডেকে এনেছিলেন একদিন, তিনি তো মূর্তি চিনতে পারলেনই না, উলটে অতীনের কার্যকলাপ দেখে স্তম্ভিত। প্রবীণ পুরোহিত, বহুদিন এ পাড়াতে পুজো করেন, অতীনকে চোখের সামনে বড়ো হতে দেখেছেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে অতীনের হাত চেপে ধরলেন, 'বাবা, এ কাজ করো না, নিষেধ করছি। ইনি কে চিনতে পারছি না, এনার বীজমন্ত্র জানা নেই। এভাবে দেবীর পূজা করতে নেই বাবা, ওনারা কুপিত হন। ইনি দশমহাবিদ্যার কেউ, নাকি অষ্টদেবীর, নাকি চৌষট্টি যোগিনীদের মধ্যে একজন, তার কিছুই জানা নেই। তার ওপর তিব্বতীয় মূর্তি, ওদের তান্ত্রিকপন্থা বড়ো সাংঘাতিক বাবা। অনেক অপদেবী, ডাকিনীবিদ্যার উল্লেখ আছে, আলাদা পূজোপকরণ লাগে, বিভিন্ন মুদ্রা আছে, যৌগিক মণ্ডল আছে। লক্ষ্মী বাবা, তুমি এঁকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। কোথা থেকে কী অনর্থ হয়ে যাবে...'

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল অতীন, সেই অপার্থিব হাসি শুনে থমকে গেছিলেন প্রবীণ পুরোহিত, হাসতে হাসতে অতীন বলেছিল, 'মায়েপোয়ের ব্যাপার কাকু, টেনশন নেবেন না। মা আমার সঙ্গে কথা বলেন, হাসেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, ভালোবাসেন। খাবেন, মা একদিন নিশ্চয়ই খাবেন আমার বেড়ে দেওয়া ভোগ, আমি আপনাকে দেখাব কাকু। আপনি শুনতে পাচ্ছেন মায়ের ডাক? শুনতে পাচ্ছেন?'

বৃদ্ধ পুরোহিত প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন, 'তুমি শান্ত হও বাবা। এভাবে হয় না। ওভাবে খাবার বেড়ে দিলে দেবী তা গ্রহণ করেন না। ভোগ নিবেদনের পদ্ধতি আছে, মন্ত্র আছে, নিয়ম আছে...'

পুরোহিতকে টেনে বাইরে এনেছিলেন ভবেশবাবু। কিছু কথা হয়, কেউ জানে না তার ব্যাপারে বিশেষ।

তা অনেক জোরাজুরি সত্ত্বেও মিটিং শেষ হতেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল অতীন। রাতে মাকে ভোগ না দিলে তার খাওয়া, ঘুম এসব হয় না। ফলে বেশ দ্রুতই গাড়ি চালিয়ে আসছিল সে। মধ্য নভেম্বরের সন্ধ্যা, গ্রামগঞ্জ এলাকা, ঘন কুয়াশা ছেয়ে আছে রাস্তায়, তার ওপর অমাবস্যার অন্ধকার। দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে বেশ ঠান্ডা পড়েছে। রাস্তাঘাট জনশূন্য, কুকুর অবধি দেখা যাচ্ছে না। মাঝেমধ্যে রাস্তার পাশের বন্ধ দোকানঘরের শাটারের নীচ থেকে আলোর আর মৃদু গুঞ্জনের আভাস পাওয়া যায়, বোঝা যায় দেশি মৌতাতের আসর বসেছে।

সরিষা পেরিয়ে শিরাকোল— শেরপুর রোডের মোড় থেকে বাঁ-দিক বেঁকে খানিকটা এসেই গাড়ি স্লো করতে বাধ্য হল অতীন। রাস্তার মাঝখানে এক মহিলা অসহায়ের মতন হাত তুলে গাড়িটাকে থামতে বলছেন। অন্য সময় হলে অতীন স্রেফ গাড়ি না থামিয়ে বেরিয়ে যেত, হাইওয়ে ডাকাতির জন্যে খুবই কুখ্যাত এই অঞ্চল। অনেক তরিকা আছে এইসব গ্যাঙেদের লুটতরাজ চালাবার জন্যে। কিন্তু কিছু একটা ভেবে মহিলার কাছে এসে গাড়ি থামায় অতীন, 'কী হয়েছে? গাড়ি থামালেন কেন?'

মহিলা ড্রাইভারের দিকে উইন্ডোর পাশে আসেন, কাচ নামায় অতীন, কাঁদতে কাঁদতে মহিলাটি বলেন, 'আমার খুব বিপদ বাবু, আমাকে বাঁচান। আমার কেউ নেই, কোথাও যাওয়ার নেই, দেওররা এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। সারাদিন কিছু খাইনি বাবু। আমাকে বাঁচান বাবু।' গাড়ি লক করে নেমে আসে অতীন, কোম্পানি থেকে রাতের খাবার প্যাক করে দিয়েছিল, সেটা তুলে দেয় মহিলাটির হাতে।

মহিলা গোগ্রাসে বুভুক্ষুর মতন গিলতে থাকেন খাবার, বোঝাই যায় যে অনেকক্ষণ, বা সারাদিনই হয়তো

কিছু খাননি। বেশভূষায় দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। চাপা গায়ের রং, উশকোখুশকো চুল, ম্লান বৈধব্যবেশ সত্ত্বেও মধ্যবয়স্কা মহিলাটির আঁটোসাঁটো গড়নটির দিকে অতীনের চোখ চলেই যায়। যৌবনকালে বেশ সুশ্রী ছিলেন মনে হয়। এখন বোধ হয় সহায়হীনা মহিলাটির দেখভাল করার কেউ নেই। দু-মুঠো ভাতের দায় ঝেড়ে ফেলেছে পরিবার পরিজন।

খাওয়া শেষ হলে জলের বোতল এগিয়ে দেয় অতীন। ভদ্রমহিলা হাত ধুয়ে ঢকঢক করে অনেকটা জল খান। তারপর হঠাৎ করে রাস্তায় শুয়ে অতীনের পা জড়িয়ে ধরেন, 'আমাকে বাঁচান বাবু, আমার তিন কুলে কেউ নেই, আমার কোথাও যাওয়ার নেই। শেয়াল কুকুরে আমাকে ছিঁড়ে খাবে বাবু। ও বাবু, আমাকে ফেলবেন না বাবু। আমি সব কাজ পারি, ঘর মোছা, বাসনমাজা, জলতোলা, সব পারি বাবু। বামুনের মেয়ে বটে আমি, রান্নার কাজও পারি। আমাকে ফেলে যাবেন না বাবু, ধর্মসাক্ষী বাবু, দু-মুঠো খেতে দেবেন বাবু, পরনের কাপড় একটা.... বাবু, ও বাবু...'

অবিবেচক বা হঠকারী বলে অতীনের কোনোদিন কোনো দুর্নাম ছিল না। কিন্তু এই অপার্থিব শীতের রাতে অতীনের চিন্তাভাবনা কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। পায়ের নীচে মৃত অজগরের মতন শুয়ে আছে শীতল ডায়মন্ড হারবার রোড, দু-ধারের খালি মাঠ থেকে ঘন ধোঁয়ার মতো উঠে আসছে শীতের অশরীরী কুয়াশা, দূরে নির্বাক হাতির পালের মতন দাঁড়িয়ে গাছপালার জঙ্গল। মাথার ওপর দিগন্ত থেকে দিগন্তে অপার হয়ে শুয়ে আছে কালচে নীল নভেম্বরের আকাশ, ওটা কি ক্যাসিওপিয়া? নিজেই ভাবে অতীন। নিশ্ছিদ্র, নিঃসীম এই পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে কোনো শব্দ নেই, কোনো প্রাণের সাড়া নেই, কোনো দিশা নেই, মুক্তি নেই, পাপ নেই, পূণ্য নেই, শুধু পায়ের কাছে এই রমণীর ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। অতীনের সমগ্র চৈতন্য যেন ক্রমশ গলে যেতে থাকে। কালো লোমশ এক ছায়া যেন তার সমস্ত চিন্তা আবৃত করতে থাকে, অতীনের সব বোধবুদ্ধি যেন নিমেষে মাথায় শিকড় পড়া সাপের মতন নুইয়ে আসতে থাকে...

এ যদি মায়ের আদেশ হয়? মা যদি এইভাবেই তার সন্তানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন? কী করবে অতীন? নারী মাত্রেই মায়ের অংশ না? একে উপেক্ষা করে চলে যাবে? নাকি নিয়েই যাবে? কী দরকার... কোথাকার কে না কে, খায়নি অনেক্ষণ, খাইয়ে দিয়েছে অতীন, গাড়ি করে বেরিয়ে গেলেই হল... না কি... না থাক... রান্নার কাজে অন্তত... পুষ্পদির একজন হেল্পিং হ্যান্ড...

মহিলাটিকে উঠিয়ে দাঁড় করায় অতীন, 'রান্নার কাজ পার?'

'হ্যাঁ বাবু' সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'চল তাহলে, সঙ্গে কিছু নেবার আছে?'

'না বাবু।'

একটা খটকা যেন অতীনের মনের দরজায় ঘা মেরেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে উড়ে যায়, কিছুই নেই নেওয়ার মতন? কিচ্ছু না? নিদেনপক্ষে একটা পুঁটুলি? লোকে এমন নিঃস্ব হয়ে ঘর ছাড়ে নাকি?

'কী নাম তোমার?'

সেই নিঃসীম শূন্য কালোর মধ্যে, দিগন্তবৃত্তের নীলচে আভার প্রেক্ষাপটে, উড়তে থাকা শুকনো চুলের মধ্যে ঝিকিয়ে ওঠে মহিলার শ্বদন্তদুটি, 'ডামরী, আমার নাম ডামরী বাবু।'

* * *

ডামরীকে নিয়ে রাতে ঘরে ঢুকতে দেখে ভ্রু কুঁচকে ফেলেছিলেন পুষ্পদি, 'এ কাকে নিয়ে এলি অতীন?'

ডামরী জড়োসড়ো হয়ে এক কোণায় দাঁড়িয়েছিল। জুতো খুলতে খুলতে পুরো ব্যাপারটা অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে জানায় অতীন। তারপর পুষ্পদিকে বলে, 'চিলেকোঠার ঘরটা খুলে দিও পুষ্পদি। ডামরী ওখানেই থাকবে। আর হ্যাঁ, এবার থেকে রান্নাবান্নার কাজটা ও-ই করবে, ওকে সব দেখিয়ে টেখিয়ে দিও।'

তারপর ডামরীর দিকে ঘুরে বলে, 'আজকের দিনটা কোনোমতে চালিয়ে নাও, কাল পুষ্পদি লোক ডেকে পরিষ্কার করে দেবে ঘরটা। যা যা লাগবে পুষ্পদিকে বলবে আর পুষ্পদির কথামতো চলবে। পুষ্পদির কথামতোই সব কাজ হয় এ বাড়িতে।'

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে ডামরীকে নিয়ে ওপরে উঠে যান পুষ্পদি। খানিকক্ষণ বাদে নেমে এসে ফেটে পড়েন অতীনের ওপর, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে অতীন? কোথাকার কে জানাশোনা নেই, কোন অজাত বেজাতের মেয়ে, পাগল না কি কিছু জানিস তুই? বলি চোর বা গুন্ডাদেরও লোক তো হতে পারে। রাস্তায় ধরল বলে নিয়ে চলে এলি? বুদ্ধি বিবেচনা সবই কি ওই মূর্তি খেয়ে নিয়েছে?'

দ্রুত চোখ তুলে তাকায় অতীন, আর সেই মুহূর্তের মধ্যে লাল হওয়ে যাওয়া চোখ দেখে বুকটা ধক করে ওঠে পুষ্পদির, ভয়ে সিঁটিয়ে যান উনি, 'মা ই ওকে জুটিয়ে দিয়েছেন পুষ্পদি। মায়ের আদেশ অমান্য করা যায় না সে তো তুমি জানোই। দেখ, ওর যেন কোনো অসুবিধা না হয়। আমাকে গামছাটা দিয়ে যাও, স্নান করতে যাব। আমার খাবার আর মায়ের ভোগ রেডি করে রেখেছ তো?'

এই বলে সামান্য স্খলিত পায়ে বাথরুমের দিকে চলে যায় অতীন। পুষ্পদির সঙ্গে এই বোধ হয় শেষ সামনাসামনি কথা হয় অতীনের।

কারণ সকালে উঠে দেখা যায় পুষ্পদির বিছানা খালি। পুষ্পদি নেই।

* * *

পরের দিন সারা পাড়া ভেঙে পড়ল অতীনের বাড়িতে। এলাকায় তীব্র উত্তেজনা। মুখার্জী পরিবার এলাকার যথেষ্ট সম্মানীয় পরিবার। অতীনকেও লোকজন খুবই ভালোবাসে। আর পুষ্পদিকেও এলাকায় সবাই চেনে মুখার্জী বাড়িরই একজন বলতে। অতীন পুরো ঘটনায় হতচকিত হয়ে গেছিল, কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। শেষে ভবেশবাবুই এসে পুলিশে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

পুলিশ তোলপাড় করে ফেলল বটে, কিন্তু পুষ্পদির কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। কোথায় গেছেন, কী হয়েছে কেউই বলতে পারল না। পুষ্পদির গ্রামের বাড়ি হাওড়ার ডোমজুড়ের কোথায় যেন, সেখান অবধি পুলিশ খোঁজ নিয়ে এল, কিন্তু না, কোনো খবর নেই। ভদ্রমহিলা একবস্ত্রে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন, চপ্পল অবধি নিয়ে যাননি। একটিও নিজের জিনিস নিয়ে যাননি, একটা টাকা অবধি না। কলকাতা শহরের সমস্ত হাসপাতাল, নার্সিং হোম, মেন্টাল অ্যাসাইলাম, থানা সব খোঁজ নেওয়া হয়ে গেল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, উঁহুঁ, কোনো পাত্তাই নেই। পুলিশ এসে পাড়াপড়শিদের দু-দিন জিজ্ঞাসাবাদ করল। অতীন আর ভবেশবাবুর কাছ থেকে অনেক কিছু জানার চেষ্টা করল, কিন্তু দু-জনের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো সূত্রই উদ্ধার করা গেল না। ডামরীকে অবশ্য পুলিশ প্রথম দিনই ক্লিনচিট দিয়ে দেয়। কেউ কাউকে চেনে না, কয়েক ঘন্টার আলাপ। আর ক্রমাগত হাপুস নয়নে ক্রন্দনরত গ্রাম্য মহিলাকে কতক্ষণই বা জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়?

ভদ্রমহিলা যেন জাস্ট ভ্যানিশ করে গেলেন!

ভবেশবাবু ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিলেন। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কিছু একটা অলৌকিক অশনিসংকেত আছে বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু সেকথা পুলিশকে বলা চলে না, ওরা হেসেই উড়িয়ে দেবে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রথমদিককার ধাক্কা সামলে, অতীন কিন্তু খুব শান্ত ভাবেই ব্যাপারটা দেখছে। ঠান্ডা মাথায় পুলিশকে সাহায্য করা থেকে খবরের কাগজের অফিসে দৌড়াদৌড়ি করা সবই সে করছে নিরাসক্ত দক্ষতার সঙ্গে। তার কোনো বিকার নেই, যেন খুবই সহজচিত্তে মেনে নিয়েছে যে পুষ্পদি আর আসবে না, আর ফিরবে না, আর খেতে ডাকবে না, আর জামাকাপড় গুছিয়ে রাখবে না, আর অতীনের শরীর খারাপ হলে পাগলের মতো করবে না। নিঃসহায় বিধবা মাতৃসমা প্রৌঢ়াটির প্রতি সমস্ত দায়িত্ব যেন অতীন তার উদাসীন

কর্তব্যকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। তার মন যেন অন্য এক প্রাপ্তির পূর্ণতায় মশগুল, সেখানে পুষ্পদির অস্তিত্বটাই অপ্রয়োজনীয়।

হায়, ভবেশবাবু যদি জানতেন, এর পেছনের কারণ! কোন আধিদৈবিক আকর্ষণ এখন অতীনের সমগ্র চৈতন্য জুড়ে বিরাজমান। পুষ্প হারিয়ে যাবার পরদিন থেকেই এ বাড়িতে প্রাত্যহিকী চা পানের আসরটি ত্যাগ করেছেন তিনি। ফলে এর কারণ জানে শুধু দু-জন, অতীন আর ডামরী।

মা ভোগ স্বীকার করেছেন!

অতীন স্বীকার করতে বাধ্য, ডামরী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা। সেই চূড়ান্ত ডামাডোলের মধ্যেও সে বাড়ির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে, তাকে রান্নাঘরের বা বাড়ির কোনো কাজই দেখিয়ে দিতে হয়নি। সে যেন সবই জানত, যেন এ বাড়িতে সে বহুকাল ধরেই আছে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সে কাজ করতে পারে। অতীনকে মুখ ফুটে কিছু চাইতেই হয় না, সে সবই যেন জানে বোঝে। পুষ্পদি যেদিন হারিয়ে যান, সেদিন রান্না করেছিল ডামরী। অতীন স্নান করে পূজায় বসে, তারপর ভোগ উৎসর্গ করে মা-কে। তারপর অভ্যেসমতন বাইরে বেরিয়ে এসে স্টাডি রুমের দরজায় তালা দিয়ে দেয়। রাতে খেতে বসে রান্নার স্বাদ একটু অন্যরকম লাগে অতীনের, কী ধরণের অন্যরকম সেটা অবশ্য বলা মুশকিল। অবশ্য হতেই পারে, পুষ্পদির হাতের রান্না খেয়ে অভ্যস্ত অতীন। একে নতুন হাতের রান্না, তার ওপর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রান্নার স্টাইলটাই হয়তো অন্যরকম। তা ছাড়া সেইদিন রান্নার স্বাদ নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থাতেই ছিল না অতীন। দ্রুত খাবার খেয়ে শুতে চলে যায়।

রাতে চুড়ির কিছু হালকা রিনিরিনি আওয়াজ এসেছিল কি অতীনের কানে? তারপর ছমছম করে নুপুরের শব্দ, কে যেন ছাদ থেকে নীচে নেমে আসছে আর উঠে যাচ্ছে...সেটাও কি ভুলই শুনল নাকি অতীন? খিলখিল হাসির শব্দও শুনতে পেল কি একটা? কিন্তু সারাদিনের ঝোড়ো ক্লান্তির পর অতীনের দু-চোখে ঘুম নেমে আসতে দেরি হয়নি বিশেষ।

পরের দিন সকালে স্টাডি রুমের দরজা খোলে অতীন, আর তীব্র বিস্ময়, আনন্দে ছিটকে যায়। বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ে এক সমুদ্র আবেগ, মা শুনেছেন! মা শুনেছেন!! শেষপর্যন্ত ছেলের ভালোবাসার কাছে মা ধরা দিয়েছেন!!! অস্ফুটে ‘মা মা গো’ বলে দরজা ধরে থরোথরো কাঁপতে থাকে অতীন। সেই দেবীমূর্তির সামনে সমস্ত খাবার ছড়ানো ছিটানো। কে যে দু-হাতে খাবারগুলোর খানিকটা খেয়েছে, বাকিটা স্টাডি রুমের মেঝে জুড়ে ছড়িয়েছে। দুয়েকটা দানা মূর্তির মুখেও লেগে। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে অতীন। ডামরীও দৌড়ে এসেছিল। সেও গলবস্ত্র হয়ে নমস্কার করতে থাকে।



সেই থেকে একই জিনিস রোজ ঘটে যাচ্ছে। রোজ রাতে পূজা করে, ডামরীর রান্না ভোগ হিসেবে সেই দেবীমূর্তির সামনে সাজিয়ে, নিজে খেয়ে ঘুমোতে যায় অতীন। আজকাল বড়ো গাঢ় ঘুম হয় তার। নিঃসীম চেতনাহীন গাঢ় ঘুম। কখনো কখনো মগ্নচৈতন্য ঘা দিয়ে যায় কিছু খলখল হাসির শব্দ, বা কাচের চুড়ির শব্দ। সেই ঘুম ভাঙলে সকালে উঠে নিজের হাতে স্টাডি রুমের দরজা খোলে সে, সেই একই দৃশ্য! সমস্ত অর্ধভুক্ত, বাকিটা ঘরের মেঝেতে ছড়ানো ছিটানো। মূর্তির মুখে দু-একটা দানা লেগে থাকে। অতীনের চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে, তার প্রতি মায়ের এই নিঃসীম করুণার কথা ভেবে।

মাসখানেক বাদে একদিন সকালের দিকে অতীনের বাড়ি আসেন ভবেশবাবু। আগের দিন সন্ধেবেলা থানায় গেছিলেন তিনি। পুলিশ পুষ্পর কোনো খোঁজ বা সূত্র না পেয়ে কেস ক্লোজ করে দিচ্ছে। সেটাই জানাতে মধ্য ডিসেম্বরের সেই সকালে অতীনের বাড়ি আসছিলেন উনি। পুষ্প চলে যাবার পর রোজকার আসাটা বন্ধ করে দিয়েছেন ভবেশবাবু। কিন্তু এই খবরটা না দিলেই নয়।

সদর দরজা খোলাই ছিল, বোধ হয় দুধ বা খবরের কাগজ নেওয়ার জন্যে। ঢুকেই থমকে গেলেন ভবেশবাবু। স্টাডি রুমের সামনে দাঁড়িয়ে অতীন, কোমরে প্রায় খসে পরোপরো ছোটো গামছা একটা, প্রায় উলঙ্গ অতীনের দু-হাত প্রণামের ভঙ্গিতে বুকের কাছে জড়ো করা, অস্ফুট 'মা মা' ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পেছনে ডামরী দাঁড়িয়ে। সে কিন্তু ঠিক তার ঈন্দ্রিয় দিয়ে বুঝেছে কেউ এসেছে ঘরে। এক বার ঘাড় ঘুরিয়ে শ্বাপদের ক্ষিপ্রতায় রান্নাঘরে ঢুকে যায় সে। ভবেশবাবু মৃদুস্বরে একবার ডাকেন, 'অতীন'। অতীন সাড়া দেয় না। এবার এগিয়ে এসে অতীনের কাঁধে হাত রাখেন ভবেশবাবু। অতীন ঘুরে দাঁড়ায়, গাঢ় লাল চোখ আর অদ্ভুত উজ্জ্বল দৃষ্টি, ঘ্যাসঘ্যাসে গলায় অতীন বলে, 'কাকু, এসেছেন? দেখুন মা আমার দেওয়া ভোগ নিয়েছেন, দেখেছেন? মা শুনেছেন আমার ডাক, কই আপনার সেই পুরুতঠাকুরকে ডাকুন, এসে দেখে যাক, ছেলের ডাকে মা সাড়া দেন কি না।'

ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা দেখে মুহূর্তের মধ্যে গা গুলিয়ে উঠল ভবেশবাবুর। প্রায়ান্ধকার বন্ধ ঘরে ভ্যাপসা হাওয়ার সঙ্গে মিশেছে বাসি এঁটোকাঁটার পচা দুর্গন্ধ। এই সকালেও একটা লাল নাইট ল্যাম্প জ্বলছে, তাতে আরও ভয়াবহ দেখাচ্ছে সেই তিব্বতীয় দেবীমূর্তি। কী ভয়ানক, কী নোংরা, কী বমনোদ্রেককারী সেই দৃশ্য! ফের গা গুলিয়ে ওঠে ভবেশবাবুর। অমঙ্গলের আশঙ্কায় শিউড়ে ওঠেন তিনি।

দৃঢ় হাতে অতীনের কাঁধ ধরে বাইরে নিয়ে এসে বসান ভবেশবাবু। লক্ষ্য করেন যে অতীন এর মধ্যেই রোগা হয়ে গেছে অনেক। গাল আরও বসে গেছে, কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে আছে, চোখের নীচে গাঢ় হয়ে আছে কালি, হাতের শিরা-উপশিরা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। শুধু চোখ, চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে আছে। এখন গাঢ় লাল থেকে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে ক্রমশ। সেই দিকে তাকিয়ে চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করেন ভবেশবাবু, 'এসব কবে থেকে হচ্ছে অতীন?'

উৎসাহ আর ঘোরের মধ্যে পুরো ঘটনা বলে যায় অতীন। কিচ্ছু বাদ দেয় না। অনেক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকেন ভবেশবাবু, তারপর মাথা তুলে জিজ্ঞেস করেন, 'সুবেশের দোকানটা পার্ক স্ট্রিটের ঠিক কোথায় বলতে পারবে?'

* * *

আজকাল মাঝেমধ্যেই বিকেলের দিকে নিমতলা শ্মশানে গিয়ে বসে থাকে অতীন। যদিও নিমতলাঘাট তার দক্ষিণ কলকাতার বাড়ি থেকে অনেকদূর। কিন্তু দক্ষিণের গড়িয়া মহাশ্মশান, সিরিটি বা ক্যাওড়াতলা কোনোটাতেই এই নিমতলা বা কাশি মিত্তিরের ঘাটের মতন গঙ্গার মিঠে হাওয়াটা পাওয়া যায় না। আজকাল শ্মশান বড়ো ভালো লাগে তার। শান্ত ঠান্ডা জায়গা, কেউ তাকে তার এই গত মাস দুয়েকের পরিবর্তন নিয়ে জিজ্ঞাসা করে না। একটা কোণ ধরে চুপচাপ বসে থাকে সে। কয়েকটা নেড়ি, মাতাল, পাগল আর গেঁজেল

নেশাড়ু ছাড়া আর কেউ থাকে না। তবে থেকে থেকেই মৃদু বলহরি হরিবোল ধ্বনি ভেসে আসে। মৃতদেহের সঙ্গে দু-একজন শোকার্ত মানুষ, এবং বাকি বেশ কিছু উল্লসিত লোকজন লরি বা শববাহী গাড়ি থেকে নামে। অন্যান্য প্রথাগত কাজ চলার মধ্যে শ্মশানের একটা কোণ দেখে কিছু ছেলেপিলে রামের বোতল আর কল্কে নিয়ে বসে পড়ে। শ্মশানের গা ঘেঁষে চা, লাড্ডু, সিগারেট আর লুচি তরকারি বিক্রির দোকানঘরগুলোতে বেড়ে ওঠে ব্যস্ততা।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, পরের দিন অমাবস্যা। প্রায় এক মাস হয়ে গেছে পুষ্পদি নেই। ভবেশকাকুও শেষ এসেছিলেন দিন পনেরো আগে। তারপর তাঁরও আর পাত্তা নেই। গত পনেরো দিনে শরীর আরও খারাপ হয়েছে অতীনের। অফিসের লোকজন অবধি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে শরীরের এই অবস্থা দেখে। দিন পাঁচেক আগে রিজিয়োনাল ম্যানেজার সাহেব তো প্রায় জোর করেই বেলভিউতে পাঠাচ্ছিলেন। এইসব নামজাদা হাসপাতালের সঙ্গে কোম্পানির বোঝাপড়া আছে, পয়সা লাগবে না, কোম্পানির আই কার্ড নিয়ে ভরতি হলেই হল। বিল মেডিক্লেইম কোম্পানি মেটাবে। কিন্তু না। অতীন জানে যে সে সুস্থ। কোনোগতিকে সেদিন পালিয়ে এসেছে সে, তারপর থেকে টানা পাঁচ দিনের ছুটিতে। সবই ঠিক আছে। রোজ রোজ মা ভোগ খেয়ে যাচ্ছেন, অর্ধভুক্ত খাবার সারা স্টাডি রুম জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু একটা জিনিস অতীনের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুষ্পদির যাওয়ার পর থেকেই। খাবার। ডামরীই রান্না করে। নিশ্চয়ই সে রান্না খুব ভালো, নইলে মা সেই ভোগ স্বীকার করলেন কেন? কই, পুষ্পদির রান্না তো মা কোনোদিনই ভোগ হিসেবে নেন নি? কিন্তু রান্নাটা কোনো এক অদ্ভুত কারণে অতীনের পোষাচ্ছে না। খাবারে সবসময় সে একটা কটু গন্ধ পায়। হয়তো কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই, সবই ঠিক আছে, কিন্তু খাবার মুখে দিলেই অজ্ঞাত কারণে গা গুলিয়ে ওঠে তার। মনে হয় জন্মজন্মান্তরের ভাত নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে সব কিছু উঠে আসবে। আজকাল তাই খাওয়া-দাওয়া খুব কমে গেছে তার। যেটুকু পারে, ওই একটু অমলেট আর সিদ্ধ ভাত খেয়ে বেরিয়ে আসে সে। ডামরী গজগজ করে খুব। এখন এত সব রান্না নিয়ে কী করবে সে? আজকাল তো অতীনের বাড়ির আশেপাশে কুকুর বিড়ালও আসে না। এমনকী বাড়ির ওপর দিয়ে কাক অবধি ওড়ে না। এটাও লক্ষ্য করেছে অতীন।

আজও উদাসী মুখে একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বসে ছিল অতীন। খুব খিদে পেয়েছে তার। উঠে গিয়ে কাছের দোকানে গেছিল কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে। দোকানদার খুব কাঁচুমাচু মুখে জানিয়েছে আজ কাস্টমার বহোত জ্যাদা। একটা রুটি আপাতত আছে আর দুটো জিলাবি। বাবু আপাতত এই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন। আধা ঘণ্টা বাদে সে দুটো গরমাগরম রুটি দিয়ে শাম কা নাস্তার ব্যবস্থা করে দেবে।

রুটিটা তুলে হাতে নিয়েছে সবে, পাশ থেকে একটা আওয়াজ পেয়ে থমকে যায় সে, 'ইয়ে, একা খাবেন নাকি? হাফ হাফ করে খেলে হত না? আমাকেও নগিন্দর বলেছে আধ ঘন্টা বাদে রোটি পাক্কা মিলেগা... হ্যা হ্যা হ্যা... তখনই না হয় শোধ দিয়ে দেব, অ্যাঁ? এমনি অবশ্য বলি না কাউকে তেমন। কিন্তু আজ মশাই খিদেটা মোটে সহ্য হচ্ছে না।'

পাশের দিকে তাকায় অতীন। এই প্রায় অন্ধকারের মধ্যে লোকটা কখন এসে পাশে বসেছে সেটা খেয়ালই করেনি অতীন। দেখে অবশ্য ভিখিরি বা চোরছ্যাঁচড় মনে হয় না। ফর্সা, বেঁটেখাটো একটা লোক, সাধারণ একটা হাফ শার্ট আর ট্রাউজার্স পরনে। চোখ দুটো আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল, তাতে যেন কৌতুক খেলা করছে।

অতীনের একটু মায়া হল। হাতের রুটিটা ছিঁড়ে দু-ভাগ করল সে, তারপর ডান হাতের ভাগটা তুলে দেয় লোকটার হাতে, জিলিপির ঠোঙাটা এগিয়ে দেয়। লোকটা রুটির টুকরোটা নিয়ে খানিকক্ষণ অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইল অতীনের দিকে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ডান হাতের বড়ো টুকরোটাই দিলেন যে? বাঁ-হাতের ছোটোটাও তো দিতে পারতেন?'

অতীন একটু অপ্রস্তুত হয়, 'অত কিছু মনে করে দিইনি। আপনি বললেন খিদে পেয়েছে... আর নগিন্দর তো একটু পর বানিয়ে দিচ্ছেই...'

লোকটা রুটির টুকরোটা নিয়ে মাথায় ঠেকায়, তারপর স্পষ্ট সংস্কৃতে বলে, 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম, শ্রীয়া দেয়ম', বলেই রুটিটা মুখে পুরে পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবোতে থাকে।

কী জানি, লোকটাকে বেশ ভালো লেগে যায় অতীনের, নিজের রুটির টুকরোটা জিলিপি দিয়ে চিবোতে চিবোতে বলে, 'দাদার বাড়ি কোথায়?'

লোকটা নিমীলিত চোখে বলে, 'অনেক দূর দাদা, নবদ্বীপ, নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট।'

'হুমম, তা বেশ সংস্কৃত জানেন দেখছি। কী করা হয়?'

'ওই আর কী দাদা, ছাত্র ঠ্যাঙানো আর পুজোআচ্চা, পারিবারিক ব্যবসাই বলতে পারেন, হে হে।'

'ও, আপনি টিচার? আরে আগে বলবেন তো। দাঁড়ান দাঁড়ান, নগিন্দরকে বলে দেখি... আমার বাবাও প্রফেসর ছিলেন...'

'বাহ, ভালো ভালো। সমস্ত দানের মধ্যে শিক্ষাদান হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম দান।'

'তা দাদা হঠাৎ নবদ্বীপ ছেড়ে কলকাতার শ্মশানে?'

'আর দাদা, বলবেন না, একটা বই লিখেছি, বুঝলেন, সেই নিয়ে পাবলিশারের সঙ্গে কথা বলব বলেই কলেজস্ট্রিটে আসা। তা কাজ হয়ে গেল, ভাবলাম একবার ঘুরেই যাই। শ্মশান অতি বিশুদ্ধ স্থান, চিত্ত পরিষ্কার হয়...'

'আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি বইও লেখেন নাকি? আরে বাহ। তা কীসের বই?'

'ওই, পুজো পাঠের বই দাদা। এদিক-ওদিক থেকে বিভিন্ন পুজো প্রথা এক জায়গায় নিয়ে একটা সংকলন মতো করেছি। তেমন বিশেষ কিছু না...'

'বাহ বাহ, তা আপনি পূজারি মানুষ, তন্ত্রমন্ত্র এসব দিকেও ইন্টারেস্ট আছে নিশ্চয়ই', বহুদিন বাদে কারো সঙ্গে কথা বলতে পেরে অতীনের সত্যিই খুব ভালো লাগছিল।

'তন্ত্রমন্ত্র তেমন ইম্পর্ট্যান্ট কিছু না দাদা। মানুষকে ভালোবাসার থেকে বড়ো তন্ত্র আর কিছু হয় না। এই যে আপনি একটা মাত্র রুটি দুই ভাগ করে বড়ো ভাগটা ডান হাতে ভালোবেসে আমার হাতে তুলে দিলেন, এর চেয়ে বড়ো তন্ত্রমন্ত্র কিছু আছে নাকি? বুঝলেন, অনেক পুজোপাঠ করে এই সার বুঝেছি, ভালোবাসা হল সবচেয়ে বড়ো তন্ত্র, সবচেয়ে বড়ো জাদু।'

অতীন চুপ করে রইল। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে এক বার তাকান অতীনের দিকে, তারপর বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়েই থাকেন। বাপরে, সে কী দৃষ্টি, অতীন সিঁটিয়ে যায়। তারপর আপনমনে বলেন, 'তিনি ত্রিগুণাতীতা, রাজরাজেশ্বরী। অপশক্তির সাধ্য কি তাঁর সন্তানের ক্ষতি করে?' বলে পকেট থেকে একটা কী বার করলেন। অতীন দেখল একটা লালসুতোর মালা, শুধু একটি রুদ্রাক্ষ আকারের স্ফটিক আছে তাতে, আর কিচ্ছু নেই। অতীন কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে মালাটা পরিয়ে দেন অতীনকে, তারপর হাসিমুখে বলেন, 'নিন দাদা, একটা জিনিস দিয়ে গেলাম। কক্ষনো গলা থেকে খুলবেন না। যখন এর কাজ শেষ হবে, আপনা থেকেই আমার কাছে চলে আসবে। আহা, ব্যস্ত হতে হবে না। নিরন্ন ক্ষুধার্তকে যিনি নির্দ্বিধায় নিজের গ্রাস তুলে দিতে পারেন, মহামায়া তাঁকে রক্ষা করুন।'

অতীন প্রথমে বিরক্ত ও পরে হতচকিত হয়ে যায়, তারপর বলে ওঠে, 'আরে, কথা নেই বার্তা নেই, ও দাদা কী পরিয়ে দিয়ে গেলেন? আর এ জিনিস আমি পরবোই বা কেন? আচ্ছা লোক তো আপনি।'

ভদ্রলোক বোধ হয় একটু লজ্জাই পেলেন, 'আহা, রাখুন না মশাই। ক্ষতি তো কিছু নেই। বিপদে-আপদে মানুষই তো মানুষের কাজে আসে, নাকি?'

'বিপদ? কীসের বিপদ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'বুঝতে হবে না। শুনুন, ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাত যাই ঘটুক, পৃথিবী এদিক থেকে ওদিক হয়ে যাক, আপনি এই মালা খুলবেন না। যদি বাঁচতে চান, এই আপনার প্রাণভোমরা। এটি কাছছাড়া করবেন না। যা বললাম, মনে থাকে যেন।'

শুনে চমকে গেল অতীন। ভদ্রলোক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। কাঁপা গলায় অতীন জিজ্ঞেস করে, ‘আপনি কে দাদা? নামটা একটু বলবেন?’

ভদ্রলোক হেসে ফেলেন, ‘নাম জেনে কী করবেন? আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আর নেই বললেই চলে। তবুও যখন জানতে চেয়েছেন তখন তো বলতেই হয়, আমার নাম হচ্ছে কে এন মৈত্র, বাবা মহেশ মৈত্র। নবদ্বীপের মৈত্র বংশের ছেলে আমি।’

বলে একটু চুপ করেন। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এসেছে তখন, সেই অন্ধকারে ভদ্রলোক যেন মিলিয়ে যেতে থাকেন, সেখান থেকেই তাঁর গলার স্বর ভেসে আসে, ‘অবশ্য যে বইটা লিখেছি, তাতে আপনি দেখবেন অন্য উপাধি লেখা আছে। লোকে আমাকে সেই উপাধিতেই বেশি চেনে, আগমবাগীশ। আমার পুরো নাম কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।’

* * *

ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুন্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়গবামাধোর্দ্ধক রাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোদ্ধার্ধপাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কন্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধিরচর্চিতাম্॥
কর্নাবতংসতানীতশ বযুগ্মভয়ানকাম্।
ঘোরদ্রংষ্টাং করালস্যাং পীণোন্নতপয়োধরাং॥

একমনে পুজো করছিলেন দ্বিজোত্তম মিশ্র। প্রায় পাঁচ-শো বছরের পুরোনো প্রতিষ্ঠিত কালী মূর্তি ওঁর বাড়িতে। মায়ের সান্ধ্যকালীন নিত্যপূজাটিই উনি করে থাকেন। দিনের বাকি কাজ অবশ্য ওঁর পুত্রবধূই করে। ছেলে ব্যাঙ্কের চাকুরে, দরকারে সেও হাত লাগায়। আর এখন তো সারাদিনের জন্যই মা নিজের পূজার দায়িত্ব ওঁর কাঁধে তুলে দিলেন। জমিদারবাড়ির কর্তব্যকর্ম তো ফুরোল। অবশ্য ওঁর নিজের বয়েসই কি খুব কম হল? সামনের জ্যৈষ্ঠমাসে আশি-তে পা দেবেন উনি। মা নিজেই তাঁর সন্তানের ভার লাঘব করছেন ধীরে ধীরে।

পূজা শেষ হলে সাষ্টাঙ্গে মা-কে প্রণাম করেন উনি। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়েই, থমকে যান।

ঠিক ঠাকুরঘরের সামনেই দুইজন ভক্তি সহকারে বুকের কাছে হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছেন। এক জন বয়স্ক, আরেকজন তরুণ। এদের পেছনে ওঁর পুত্রবধূ, তিনি মৃদুস্বরে জানালেন, ‘বাবা, এনারা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কলকাতা থেকে, বলছেন খুব জরুরি দরকার। আপনি পুজো করতে ব্যস্ত ছিলেন বলে আর আপনাকে বিরক্ত করিনি।’

দুইজনের মধ্যে যিনি বয়স্ক, তিনি দু-হাত তুলে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করেন, ‘নমস্কার ঠাকুরমশাই। আমার নাম ভবেশ ভট্টাচার্য। কলকাতা থেকে আসছি। এককালে কলেজে ইতিহাস পড়াতাম, এখন রিটায়ার্ড। আর আমার সঙ্গে এই ছেলেটির নাম সুবেশ আগরওয়াল। পার্ক স্ট্রিটে ওর একটা দোকান আছে পুরোনো জিনিসপত্রের। আপনি বোধ হয় আগে দেখেছেন ওকে।’

সুবেশ প্রায় কোমর অবধি ঝুঁকে প্রণাম জানায়, জায়গা পেলে বোধ হয় শুয়েই পড়ত। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে জানায়, ‘সেই মাস দুয়েক আগে এই জমিদারবাড়ির পুরোনো জিনিসপাতি কিনে নিয়ে গেছিলাম, আপনি একটা মূর্তি দিলেন ফ্রি অফ কস্ট, মনে নেই?’

দ্বিজোত্তম মিশ্রের মুখে বিস্ময়, ভয়, আশ্চর্য সবকটি ভাবের ছায়া খেলে যায় একসঙ্গে, তারপর স্মিতহাস্যে বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে বই কী, বিলক্ষণ মনে আছে। বলুন ভাই, কী সেবা করতে পারি আপনাদের' বলেই পুত্রবধূকে বলেন, 'মা, আমাদের সবার জন্যে এক কাপ করে চা এনে দাও না', শুনেই সেই মহিলা দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে যান।

'এইখানেই বসি ঠাকুরমশাই? আহা মায়ের মুখটি বড়ো সুন্দর। জগজ্জননী মহামায়া, মা মা গো', ফের যুক্তকরে প্রণাম করেন ভবেশ ভট্টাচার্য। প্রীত হন দ্বিজোত্তম। মন্দিরের চাতালেই পদ্মাসনে বসেন। মুণ্ডিতমস্তক, ঋজু পাকানো দেহ, চোখে প্রগাঢ় প্রশান্তি। বলেন, 'এই মূর্তি বিশেষভাবে প্রাপ্ত, বুঝলেন। আমাদের এক পূর্বপুরুষ বহুভাষাবিদ ছিলেন। মল্লভূমের মল্লরাজাদের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছেন, ও আপনি তো ইতিহাসের অধ্যাপক। তা আমাদের এই পূর্বপুরুষ, নাম দনুজদমন মিশ্র, রাজা চন্দ্র মল্লর কাছে চাকরি করতেন। তাঁর কাজ ছিল মল্লভূমবাসী সাঁওতাল আর মুণ্ডাদের সঙ্গে রাজার যোগাযোগ রক্ষা করা। একবার ভুল বোঝাবুঝির কারণে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়, রাজা আদিবাসীদের উৎখাত করার আদেশ দেন। চন্দ্র মল্ল প্রবল প্রতাপশালী পুরুষ ছিলেন। আমার পূর্বপুরুষ রাজাকে অনেক বুঝিয়ে, সুকৌশলে রাজার ক্রোধ প্রশমিত করেন। কৃতজ্ঞচিত্ত মুণ্ডাসর্দার তাঁদের পূজিত দেবীকে আমাদের সেই পূর্বপুরুষকে উপহার দেন। সেই থেকে কষ্টিপাথরের এই মূর্তি আমাদের গৃহদেবী।'

সুবেশের চোখ দেখে বোঝাই যাচ্ছিল সে ভক্তিভরে প্রণাম করবে, না এই অমূল্য মূর্তিটির দাম আন্দাজ করবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। এক চোখে শ্রদ্ধা, আরেকচোখে প্রফিট! ততক্ষণে চা এসে গেছিল। তাতে চুমুক দিতে দিতে ভবেশবাবু সরাসরি আসল প্রসঙ্গে চলে আসেন, 'ঠাকুরমশাই, আপনি একটি দেবীমূর্তি আমাদের এই সুবেশকে এমনিই দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মূর্তিটির ব্যাপারেই কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল।'

দ্বিজোত্তম চোখের পলক অবধি ফেললেন না বটে, কিন্তু মুহূর্তের জন্য, চকিতে সারা শরীরটা একবার কাঠ হয়ে উঠল। মৃদু হাসলেন ভবেশবাবু। ইনভলান্টারি ডিফেন্স মেকানিজম। দেয়ার মাস্ট বি সামথিং রং, টেরিবলি রং। দ্বিজোত্তম গলা খাঁকারি দিয়ে বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, 'সে তো মাস দুয়েক আগের কথা। মূর্তি একটা ছিল বটে, দিয়ে দিয়েছি। এমনকী তার দাম অবধি নিইনি। তা সেই নিয়ে এত প্রশ্ন কীসের? আমার তো আর কোনো দায় নেই।'

'দায়ের কথা আসছে কোথা থেকে ঠাকুমশাই? আমরা তো আপনাকে কোনো দোষারোপ করিনি। আপনার কি মনে হয় এই মূর্তি থেকে আপনার কী কোনো দায়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে?'

পলকে সাদা হয়ে যায় দ্বিজোত্তম মিশ্রের চোখ-মুখ, তারপর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, 'আপনারা কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন? আপনি জানেন আমি কে? আমরা ঊর্ধ্বতন বিশ পুরুষের তান্ত্রিক পরিবার। আপনি জানেন আমি কি করতে পারি আর কি করতে না পারি? আপনারা ভেবেছেন কি? আমি কি আপনাদের চাকর যে কৈফিয়ত দিতে হবে আপনাদের?'

পলকে দ্বিজোত্তম মিশ্রের দুই পা ধরে ফেলেন ভবেশবাবু। সুবেশ এতক্ষণ কাঠ হয়ে ছিল, এবার সেও কিছু একটা খুঁজতে থাকে ধরার জন্যে। অবশেষে কিছু না পেয়ে সোজা উপুড় হয়েই শুয়ে পড়ে।

ভবেশবাবুর গলা কেঁপে যায়, 'ঠাকুর আমি বিয়ে করিনি, আমার ত্রিসংসারে কেউ নেই। ছোটোবেলার বন্ধুর এক সন্তান, তাকেই নিজের সন্তান বলে জেনেছি। তার আজ বড়ো বিপদ ঠাকুর। এই মূর্তি সে ঘরে নিয়ে গিয়ে ইচ্ছেমতো ছেলেখেলা করেছে। ফলে তার জীবনে আজ ঘোর কালরাত্রি নেমে এসেছে ঠাকুর, তার জীবন বিপন্ন। আমিও সদ্বংশের ছেলে, জীবনে কোনোদিন মিথ্যে বলিনি, লোক ঠকাইনি। কিন্তু ওই ছেলেটি আমার নিজের ঠাকুর। ওকে বাঁচান, মা মহামায়া আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।'

খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে বসে থাকেন দ্বিজোত্তম মিশ্র। তারপর যখন মাথা তোলেন তখন ওঁর মুখের রেখা অনেক কোমল হয়ে এসেছে। মন্দিরের সামনে চাতাল থেকে আকাশ দেখা যায়। মধ্য ডিসেম্বরের

সন্ধ্যা, আকাশ কালচে নীল। স্নিগ্ধ সন্ধ্যাতারাটি ফুটে উঠেছে পশ্চিমে। সেদিকে তাকিয়ে অতীতমগ্ন হন বিখ্যাত বামাচারী তান্ত্রিক দ্বিজোত্তম মিশ্র।

'আপনাদের যা বলব সেসব কাহিনি শুধু মৌখিক ভাবেই আমাদের বংশপরম্পরায় চলে আসছে, এর কোথাও কোনো লিখিত প্রমাণ নেই। আমাদের পূর্বপুরুষ দনুজদমন মিশ্র মুণ্ডাসর্দারের দেওয়া কালীমূর্তি পেয়ে রাজা চন্দ্র মল্লর কাজ ছেড়ে পালিয়ে আসেন এই এলাকায়। তখন এলাকার জমিদার ছিলেন বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী। তিনিও প্রবলপ্রতাপ জমিদার ছিলেন। বাংলাদেশে তখন হুসেন শাহের জমানা। এদিকে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবভাবধারায় গোটা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ডুবুডুবু। কিন্তু বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী ছিলেন ঘোর শাক্ত। তাঁর এলাকায় বৈষ্ণবরা মাথাই গলাতে পারেনি তেমন। বিশ্বেশ্বরের এক ভাই ছিলেন, সহস্রাক্ষ চক্রবর্তী। ইনি ব্রাহ্মণ হলেও বিভিন্ন ভেষজ ও প্রাণীজ বিষ সম্পর্কে আশ্চর্য জ্ঞান ছিল। লোকমুখে প্রবাদ, রাজগোখরো অবধি নাকি সহস্রাক্ষ চক্রবর্তীর নাম শুনে মাথা নীচু করে পথ ছেড়ে দিত। বছর তিরিশেক বয়সে সহস্রাক্ষ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান। বিশ্বেশ্বর বয়সে অনেক ছোটো গুণী ভাইটিকে নিজের সন্তানসম স্নেহ করতেন। তিনি পাগলের মতন খোঁজ করেন, কিন্তু সহস্রাক্ষের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। ঠিক বছর কুড়ি বাদে সহস্রাক্ষ আবার ফিরে আসেন এই জমিদারিতে। বিশ্বেশ্বর তখন প্রায় পঁয়ষট্টি বছরের প্রৌঢ়, তাঁর নিজের সন্তানই প্রায় চল্লিশ বছরের তখন। তাও তিনি সহস্রাক্ষকে জমিদারির ভার নিতে অনুরোধ করেন।

কিন্তু যে সহস্রাক্ষ গেছিলেন, তিনি যুবক বিষবৈদ্য। যিনি ফিরেছেন, তিনি ঘোর বামাচারী তান্ত্রিক। তিনি রক্তাম্বর ছাড়া কিছু পরেন না, স্বপাক ছাড়া আহার করেন না, সারা মুখে দাড়ি গোঁফ আর জটাজুট। তিনি শুধু বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নন, তিব্বতীয় বজ্রযানতন্ত্রও তাঁর করায়ত্ত তখন। জমিদারি নেওয়া তো দূরস্থান, এসেই কী একটা যজ্ঞ করে ঘোষণা করলেন যে এরপর থেকে চক্রবর্তী পরিবারে যেই কখনো কোনো ভ্রাতৃবিরোধ শুরু করবে, তার সর্বনাশ হবে। পুত্রসম ভ্রাতুষ্পুত্রকে কী একটা যজ্ঞসম্ভব মাদুলি বানিয়ে দিলেন, যাতে তার ও তার বংশজদের সম্পত্তিলাভ নিষ্কণ্টক ও নির্বিঘ্ন হয়। যেন কোনো ভ্রাতৃদ্রোহের ছায়া এ বাড়ির আনাচেকানাচে না পড়ে।'

এতটা বলে দম নিলেন দ্বিজোত্তম। পরের রাউন্ডের চায়ের আদেশ দেন, তারপর শুকনো ঠোঁট চেটে বলতে থাকেন,

'খবরে প্রকাশ পায়, যে সহস্রাক্ষ পালিয়ে প্রথমে নেপাল ও তার পর তিব্বত গেছিলেন। নেপালের তরাই অঞ্চলে এক তান্ত্রিকের কাছে বামাচারে দীক্ষা নেন। বছর দশেক সেখানে থেকে চলে যান তিব্বত। সেখানে তখন বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় অধ্যায় চলছে। সহস্রাক্ষ এক বিখ্যাত তান্ত্রিক গুরু জুটিয়ে বজ্রযান তন্ত্রসাধনায় মগ্ন হন। অত্যন্ত মেধাবী হওয়ার দরুন খুব তাড়াতাড়ি সহস্রাক্ষ বজ্রযানের সবকটি মার্গ অতিক্রম করতে পারেন। সঙ্গে সহজাত বিষবৈদ্যগিরি তো চলছিলই।

তিব্বতে তখন ভয়ানক অরাজক সময়। গের উপজাতীয় শাসক রিন্সপাংস্পা রাজবংশের শেষের শুরু। রাজধানী শিগাৎসের গভর্নর কর্মা সেন্তেন বিদ্রোহী হয়েছেন। তিনিই গোপনে সহস্রাক্ষের গুরুকে ডেকে পাঠান, তন্ত্রশক্তির সাহায্যে জয়ী হওয়ার জন্যে।

সেই তিব্বতীয় ধর্মগুরু নিজে গেলেন না, পাঠালেন সহস্রাক্ষকে। সহস্রাক্ষ গিয়ে দেখলেন অবস্থা খুবই সঙ্গিন। ইতিমধ্যেই কর্মা সেন্তেনের একমাত্র মেয়ে শত্রুপক্ষের কূটচালে মরোমরো প্রায়। সহস্রাক্ষ আবিষ্কার করলেন যে মেয়েটি ধীর বিষক্রিয়ার শিকার। তাঁর সতর্ক বিষনিবারণী বিদ্যার দৌলতে সামন্তকন্যার দ্রুত রোগমুক্তি ঘটে। কিন্তু এতেই ঝামেলা শেষ হল না। যারা চাইছিল কন্যাকে মেরে কর্মা সেন্তেনকে দুর্বল করবে, তারা এবার সহস্রাক্ষের পিছনে পড়ল। তখন সহস্রাক্ষ এই মূর্তিটি বানান। আপনারা যদি খুব ভালো করে মূর্তিটাকে দেখতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন যে আদতে এটি হিন্দুমূর্তি, সহস্রাক্ষের কাছে মৌখিক বর্ণনা শুনে এক তিব্বতীয় মূর্তিকার বানিয়েছে বলে দেখলে তিব্বতীয় মনে হয়। এই মূর্তি তৈরি হবার পর এক অমাবস্যার রাত্রে, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণও ছিল সে-দিন, সহস্রাক্ষ নিজে এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন।'

এতটুকু বলে সেই বৃদ্ধ থামলেন, তারপর চোখ সরু করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তন্ত্রের অভিচার ক্রিয়া নিয়ে কোনো ধারণা আছে শিক্ষকমশাই?'

গলা খাঁকারি দেন ভবেশবাবু, তারপর বলেন, 'জানি বই কী। মারণ, উচাটন, স্তম্ভন ইত্যাদি।

খানিকক্ষণ চুপ থাকেন দ্বিজোত্তম, তারপর আরও ধীর গলায় বলতে থাকেন, 'হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্র মিলিয়ে যা যা অভিচারক্রিয়া শিখেছিলেন সহস্রাক্ষ, তাই দিয়ে তিলে তিলে মূর্তির বীজক্রিয়া তৈরি করেছিলেন। ফল ফলতে বেশি সময় নেয়নি, শাসক রিন্সপাংস্পা রাজবংশ সবংশে ধ্বংস হয়। কর্মা সেন্তেন সমগ্র তিব্বতের রাজা হন। এর পর কর্মা সেন্তেন সহস্রাক্ষের ওপর চাপ দিতে থাকেন মূর্তিসহ তাঁর কাছে থেকে যেতে। রাজগুরুর পদ নিতেও অনুরোধ করেন। কিন্তু বিধির লীলা বোঝা বড়ো দায়। উড়ে বেড়ানো পাখিকে কি আর সোনার খাঁচায় বন্দি রাখা যায়? আর সহস্রাক্ষ এও জানতেন যে ওই পৈশাচিক শক্তির আকরস্বরূপ মূর্তিটি আর কোনো নিম্নগোত্রীয় তান্ত্রিকের হাতে গেলে কী প্রলয় ঘটতে পারে।

ফলে এক ঝড়জলের রাতে অন্ধকারে মূর্তিটি নিয়ে সহস্রাক্ষ পালিয়ে যান। না উনি আর গুরুর কাছে যাননি, তাহলে মূর্তিটা বাঁচানো যেত না। উনি সোজা ফিরে আসেন নিজের বাড়ি, এই বামুনগাছিতে।

এখানে এসে মহা সমারোহে সেই মূর্তিটি নিজের জমিদারবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন। আর তার নিত্য তান্ত্রিকপূজার ভার পড়ে আমাদের পূর্বপুরুষ, দনুজদমনের হাতে। দনুজদমন কালীভক্ত ছিলেন, তান্ত্রিক ছিলেন না। সহস্রাক্ষ তাঁকে নিজের হাতে বামাচারী তন্ত্রসাধনা শেখান। গুরু উপযুক্ত শিষ্যই পেয়েছিলেন বটে। কোনো এক তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তিনি দনুজদমনকে নিয়ে রক্তপ্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যে, যতদিন এই জমিদারবাড়ি চক্রবর্তী বংশের নামে থাকবে, ততদিন দনুজদমনের বংশধররা সেই সহস্রাক্ষের আনা মূর্তির নিত্য তন্ত্রসেবা করে যাবে। সেই মূর্তির জোরে ব্রিটিশ শাসন, মন্বন্তর, দু-খানা বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ কোনো কিছুর আঁচই এ বাড়িতে পড়েনি। আর সেই থেকে আমরা, মিশ্র পরিবারের প্রতিটি সন্তান তন্ত্রজ্ঞ এবং চক্রবর্তী পরিবারে বংশগত পুরোহিত।

সহস্রাক্ষ কিন্তু এরপরেও সংসারে থাকেননি। দাদা বিশ্বেশ্বর মারা যান বছর দুয়েক বাদে। যেদিন শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হয়, সেদিনই উনি বিশ্বেশ্বরের ছেলে বিশ্বনাথের নামে বিশেষ হোমযজ্ঞ করেন, বিশ্বনাথ তখন বিয়াল্লিশ বছরের নবযুবা। আর সেইদিন রাতে তিনি দ্বিতীয় ও শেষবারের মতন গৃহত্যাগ করেন। এর পরে তাঁর খোঁজ আর কেউ পায়নি!'

'এটাই কি সেই স্ট্যাচু যেটা আমাকে দিয়েছিলেন?' তড়বড় করে বলে ওঠে সুবেশ।

ম্লান হাসেন সেই বৃদ্ধ পুরোহিত, 'হ্যাঁ বাবা। সেই রকমই নির্দেশ ছিল দনুজদমনের, নিজেদের বংশধরদের প্রতি। যেদিন চক্রবর্তী বংশের উত্তরাধিকারী এই প্রাসাদকে আর নিজেদের বাড়ি বলবে না, সেইদিনই যেন আমরা যেনতেনপ্রকারেণ এই মূর্তির মায়া ত্যাগ করি।'

'কিন্তু কেন ঠাকুর? কে এই দেবী? এত তন্ত্রবিদ্যা প্রয়োজন কেন? ইনি এত ভয়ংকরীই বা কেন? কে ইনি?'

ফের খানিকক্ষণ চুপ থাকেন দ্বিজোত্তম, তারপর বলেন, 'এটি আসলে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মন্ত্রসিদ্ধ দশমহাবিদ্যা মূর্তি। আগেই বলেছি আপনারা যদি খুব ভালো করে মূর্তিটাকে দেখতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন যে আদতে এটি হিন্দুমূর্তি, এবং ইনি দশমহাবিদ্যার কোনো দেবী।'

'কে ইনি? কোন দেবীর মূর্তি, ঠাকুর?' প্রায় ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করেন ভবেশ ভট্টাচার্য।

একটা আবছা আতঙ্কের ছায়া খেলে গেল চক্রবর্তী বাড়ির শেষ পুরোহিত দ্বিজোত্তমের চেহারাতে। তিনিও মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলেন, 'ইনি যে সে দেবী নন, ইনি দশমহাবিদ্যার নবম মহাবিদ্যা, ভয়ংকরী দেবী মাতঙ্গী।'

* * *

মেট্রোয় করে বাড়ি আসার সময় অতীনের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। যেন মাথাটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে, কী যেন একটা ছিল, এখন নেই। কীসের যেন কী একটা মগজে চেপে ছিল, আস্তে আস্তে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে উড়ে যাচ্ছে, যেন সেই উড়ে যাওয়াটাও টের পাচ্ছে অতীন। মাথার মধ্যে একটা ঠান্ডা শিরশিরানি ভাব, শীতের রাত্রে কর্পূর দেওয়া জলে স্নান করার মতন। মস্তিষ্কের পরত কেটে কে যেন ভাবনাগুলোকে আরও সতেজ, সুতীক্ষ্ণ করে তুলছে।

বাড়ির একটা চাবি ওর কাছে থাকেই। রাতে বাড়ি ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে একটা অস্বস্তিকর চাপা গন্ধ যেন পাঁচিলের মতন সামনে দাঁড়াল অতীনের। যেন সে পাঁচিল গায়ের জোরে ভেঙে অতীনকে ঢুকতে হবে। ঠিক এই মুহূর্তে অতীন খেয়াল করল, তার বুকের কাছে থাকা রুদ্রাক্ষটা ঈষৎ গরম হয়ে উঠেছে। তাতে বুকে ছ্যাঁকা লাগছে না বটে, কিন্তু গরম হওয়াটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অতীন দরজার পাশে, শু-রাকের সামনে চপ্পল খোলে, তারপর জামা খুলতে খুলতেই নিজের টকপচা ঘামের গন্ধে ওয়াক তোলে, ইশ, কদ্দিন কাচা হয়নি জামাটা? তারপর ট্রাউজারের দিকে নজর যায়, নোংরা ধুলোপড়া, ঘাম নুনের সাদা দাগ ওয়ালা এই ট্রাউজারসটা পরে ও ঘুরছে? হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যায় অতীনের, বাড়িতে কাজের লোক রেখেও এই অবস্থা কেন? চেঁচিয়ে ডাকে 'ডামরী, ডামরী, গেলে কোথায়?' রান্নাঘর থেকেই ডামরী ছুটে আসে, এবং অতীনের দিকে চোখ পড়তেই সবেগে ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এইখানটায় মুহূর্তের এক ক্ষুদ্র খণ্ডাংশের জন্যে অতীন যা দেখল, সেটা হয়তো সে কোনোদিনই প্রমাণ করতে পারবে না। কিন্তু দেখাটাকে সে অস্বীকারও করতে পারবে না। মুহূর্তের সেই খণ্ডাংশে অতীন দেখে হঠাৎ যেন ডামরীর সমস্ত মুখ বীভৎস কালো হয়ে গেল, চোখ দুটো লাল আর বড়ো বড়ো, মাথার চুল সাপের মতন উড়ছে, লাল ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁকা, তীক্ষ্ণ যে দুটি দাঁত বিদ্যুতের মতন ঝিকিয়ে উঠল, ও দুটি কি শ্বদন্ত? মুহূর্তের খণ্ডাংশ, তার মধ্যেই অতীনের বুকের সেই রুদ্রাক্ষকার স্ফটিক যেন দপ করে জ্বলে উঠল।

স্পর্ধার বিরুদ্ধে স্পর্ধার মতন!

ওই, মুহূর্তের খণ্ডাংশ মাত্রই। তারপরেই ডামরী একগাল হেসে বলল, 'বল দাদাবাবু, ডাকলে?'

অতীন ভ্রু কুঁচকে বলে, 'জামাকাপড় এত নোংরা, তুমি কি এসব দেখ না? কাল যেন পরিষ্কার জামাকাপড় পাই। এসব কাল সকালে উঠেই কেচে ফেলবে। নোংরা কাপড় আমি পছন্দ করি না।'

ডামরীর ঠোঁট হাসে, চোখ হাসে না!

অতীন স্নান করে, গিজার চালিয়ে। গলার অদ্ভুত স্ফটিকটাকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে। বিশেষ কিছুই খুঁজে পায় না। কাচের তৈরি স্ফটিকখণ্ড, একটু ভারী এই যা!

স্নান করে অতীন রোজকারমতো রক্তবস্ত্র ধারণ করে। তারপর স্টাডি রুমের দরজা খুলে দাঁড়ায়। বন্ধ স্টাডি রুম, জানলাগুলো গত দেড় মাস ধরেই বন্ধ। একটা চাপা এঁটোকাঁটার গন্ধ ঘরের বাতাস আরও ভারী করে তুলেছে। রাস্তার দিকের জানালার ফাঁক দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো চুঁইয়ে আসছে। অতীন স্পষ্ট দেখল সেই দেবীমূর্তির মাথার কাছে একটা বিন্দুবৎ লাল আলো জ্বলে উঠল। আর সঙ্গেসঙ্গে অতীন লক্ষ্য করল যে ওর বুকের স্ফটিকনির্মিত রুদ্রাক্ষটি মৃদু নীল আলো জ্বালাতে শুরু করেছে। হঠাৎ ঘরের মধ্যেই হাওয়ায় একটা চাপা ঘূর্ণি অনুভব করল অতীন। মেঝে থেকে দুটো মুখোমুখি হাওয়ার স্রোত যেন লড়াই করতে করতে ওপরে উঠছে। খুবই হালকা করে দুটো সাপের তীব্র শিসের শব্দও যেন শুনল অতীন। আলো জ্বালাল অতীন। তারপর দৃঢ় পায়ে গিয়ে জানালাগুলো খুলে দিল। দেড় মাসের পর।

এরপর অতীন নিজের মতন পূজাপাঠ শুরু করে দিল, যা সে গত দেড় মাস ধরে করে এসেছে। পূজা শেষে দাঁড়িয়ে উঠে হুংকার দেয় অতীন, 'ডামরী, ভোগ কই?' অন্যদিনের মতন কিন্তু ডামরী আর গলবস্ত্র হয়ে ভোগ নিয়ে আসে না, দরজার কাছেই থালা রেখে যায়, পাশের রান্নাঘরের দরজা থেকে মৃদু স্বর ভেসে আসে, 'ভোগটা নিয়ে নিয়ে দাদাবাবু, শরীরটা ভালো নেই আজ।'

ভোগের থালা তুলে নিয়ে এসে মায়ের সামনে রেখে প্রণাম করে অতীন। তারপর নিজের হাতে স্টাডি রুমের তালাচাবি বন্ধ করে। ডামরীকে জানিয়ে দেয় যে আজ তার খিদে নেই, কোথাও রুটি তরকা জিলিপি খেয়ে এসেছে। তারপর নিজের ঘরে শুতে যায় অতীন।

বড়ো গাঢ় ঘুম হয় অতীনের সেদিন। প্রশান্ত, নিশ্চিত, নির্ভার ঘুম। হায় অতীন যদি জানত, কত সহস্র ছায়ামূর্তি তার ঘরের আশেপাশে নিষ্ফল আক্রোশে, রক্তক্রোধে ঘন হয়ে ঘুরছে আর মাথা কুটে মরছে!

সারারাত অতীনের বুক থেকে জ্বলা এক নীলাভ আলো সারা ঘর অধিকার করে রইল!

* * *

দ্বিজোত্তম খানিকক্ষণের জন্যে দম নিয়ে নেন, তারপর শুরু করেন,

'দেবী মাতঙ্গীকে বলা হয় দেবী সরস্বতীর তান্ত্রিকরূপ। নিগূঢ় অতিপ্রাকৃত শক্তিলাভের জন্যে তান্ত্রিকরা এঁর সাধনা করেন। শত্রুনাশ, বশীকরণ ও গূঢ়বিদ্যা আহরণ করার জন্যে এঁর পূজাই প্রশস্ত। দেবী প্রসন্ন হলে মহাবিদ্যা দান করেন, সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এঁর পূজা পদ্ধতি অতি কঠোর। সিদ্ধ সাধক ছাড়া এঁর পূজা সম্ভব না। সামান্য বিচ্যুতিতে দেবী ক্রোধাবিষ্ট হন, সংকল্পকারীর মহা সর্বনাশ উপস্থিত হয়। বলা হয় ইনি চণ্ডালরাজ মাতঙ্গের কন্যা। দেবী তাই চণ্ডালিনীরূপে পূজিতা হন। দেবী বনজঙ্গল, পশুপাখি ইত্যাদির রক্ষাকর্ত্রী, এবং যৌবনমদমত্তা, মত্ত মাতঙ্গী যেমন হয়!

দেবী মাতঙ্গীর উল্লেখ আছে বৌদ্ধতন্ত্রেও, এবং একই রূপে। তাই বোধ হয় সহস্রাক্ষ এই দেবীকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর অভীষ্টসিদ্ধির জন্যে। আপনারা যে মূর্তিটি নিয়ে গেছেন, ওটি দেবীর রাজ-মাতঙ্গী রূপ। খেয়াল করে দেখবেন, দেবীর পায়ের কাছে খুব ক্ষুদ্র দুটি শুকপাখি আছে, যাদের আমরা বলি টিয়াপাখি!

দেবী মাতঙ্গীর পূজার একটি বিশেষ বিধি আছে যা বাকি সমস্ত দেব-দেবীদের থেকে আলাদা। ইনি যা কিছু অশিষ্ট, অপবিত্র, নোংরা, ফেলে দেওয়া হয় তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টই এনার খাদ্য, রজঃস্বলা নারীর রক্তরঞ্জিত লাল কাপড় এঁর পরিধেয়।'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলেন ভবেশ, 'কেন ঠাকুরমশাই, আমরা তো পরিশুদ্ধ না হলে ঈশ্বর আরাধনার কথা চিন্তাও করতে পারি না। এনার আরাধনার এই রীতি কেন?'

মৃদু হাসেন সেই তন্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ, বলেন, 'তন্ত্রে অশুচিরও স্থান আছে এইটে বোঝাতে। মহামায়ার আনন্দযজ্ঞে সবারই অধিকার। যা কিছু বন্য, যা কিছু প্রাকৃতিক, শোভন, অশোভন, শুচি, অশুচি সবই সেই জগদ্ধাত্রীর অংশ, তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে। দেবী উচ্ছিষ্ট খাদ্যই ভোগ হিসেবে নেন, তাই দেবী মাতঙ্গীর আরেক নাম উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী। আর সেইজন্যেই এনাকে ভোগ দেওয়ার একটি বিশেষ বিধি আছে। ইনি বাকিদের মতন সাজিয়ে-গুছিয়ে দেওয়া ভোগ গ্রহণ করেন না। যেমন বলেছি, ইনি শুধুমাত্র উচ্ছিষ্ট আহার স্বীকার করেন। অন্যথায় দেবী ভোগ নেন না, এবং ক্ষুধার্ত দেবীর ক্রোধ কালান্তক হয়ে নেমে আসে যজমানের ওপর। পূজারীও তার কোপ এড়াতে পারেন না।'

কাঠ হয়ে যায় ভবেশবাবুর সমস্ত দেহ, সুবেশও সতর্ক হয়ে ওঠে।

'আর যদি পূজারি আর যজমান এক হন?'

'তিনি কি তন্ত্রবিদ?'

'না, এমনকী পূজা পদ্ধতিও জানেন না। নিজের খেয়ালে ফুল বেলপাতা ধূপধুনো এইসব দিয়ে পূজা করেন। কোনো বিধিও নেই, কোনো মন্ত্রও নেই।'

অবিশ্বাস ভরা স্তম্ভিত চোখে চেয়ে থাকেন সেই বৃদ্ধ, তারপর বলেন, 'পূজাবিধি, মন্ত্র, নিবেদন, এসব ছাড়া দেবী মাতঙ্গীকে ভোগ? তাও আবার উচ্ছিষ্ট নয় এমন ভোগ? কে সেই বদ্ধ উন্মাদ? আপনার সেই বন্ধুপুত্র নাকি ? হা ভগবান, আটকান, সে উন্মাদকে এক্ষুনি আটকান। দেবীর ক্রোধ বড়ো সাংঘাতিক, আমাদের

কল্পনার বাইরে। মৃত্যু, সাক্ষাৎ মৃত্যুর পরোয়ানা বেছে নিয়েছে সে। হায় ঈশ্বর, এ আমি কী করলাম? কেন সেই মূর্তির অন্য ব্যবস্থা করলাম না', সন্ধের অন্ধকারের মধ্যে হাহাকার করে আর্তস্বরে বিলাপ করতে থাকেন সেই বৃদ্ধ।

মুহূর্তে সমস্ত পরিবেশ আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় যেন শিউরে ওঠে। ভবেশবাবুর হাত-পা কাঁপতে থাকে। সেই শিউড়ে ওঠা অন্ধকারে খানিকক্ষণের নৈঃশব্দ।

তারপর এই প্রথম মুখ খোলে সুবেশ, ইতস্ততভাবে জিজ্ঞেস করে, 'ইয়ে, ঠিক কীভাবে বিপদ আসবে একটু বলতে পারবেন কি? তাহলে কিছু যদি আটকানোর ব্যবস্থা করা যেত...'

বিলাপ বন্ধ করেন বৃদ্ধ, তারপর তাঁর ফিসফিসানি শোনা যায়, যেন এই অন্ধকারের ওপার থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো, 'দেবী সরস্বতীর তান্ত্রিক রূপ ইনি। ইনি বাক্ ও বুদ্ধির দেবী। আগে হতভাগ্যের বুদ্ধিনাশ করেন। তার বোধ, চিন্তাশক্তি হরণ করতে থাকেন। তার বেঁচে থাকার ইচ্ছে শোষণ করতে থাকেন। তাকে নোংরা অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরতে, নোংরা জায়গায় যেতে বাধ্য করেন। তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা সবই কমে যেতে থাকে। জীবনীশক্তি ক্ষয় হয়, বিপুল স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তার সম্মান ও প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। আত্মীয়পরিজনদের মহা দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়। আর তাতেও যদি সে হতভাগ্য পূজা ত্যাগ না করে, তখনই শুরু সর্বনাশের। দশমহাবিদ্যার অধীন কোনো এক পিশাচী হতভাগ্যের পিছু নেয়। মহাক্রোধী সে, মহাকালীর সহচরী, সাক্ষাৎ মৃত্যু। স্বয়ং যমও তাকে ভয় পান। তার কালান্তক লোলজিহ্বা যেন মহামারীর সমান। সে এক এক করে তার পরিবার পরিজনের প্রাণহরণ করে। তারপর বীভৎস তাড়নার পর হতভাগ্যকে হত্যা করে।'

একটু ইতস্তত করেন ভবেশ, তারপর বলেন, 'সেই পিশাচীকে চেনার উপায়?'

অন্ধকারের মধ্যেও মৃদু হাসিটা চোখ এড়ায় না কারোরই, 'সে আসে মানুষের বেশে, একমাত্র সিদ্ধ যোগী ছাড়া তাকে কেউ চিনতে পারে না। তাকে পশুজগৎ এড়িয়ে চলে, তার ছায়া পড়ে না মাটিতে। যেখানে সে অধিষ্ঠান করে, অলৌকিক সব ঘটনা ঘটতে থাকে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। সে মূর্তিমান অমঙ্গল, সাক্ষাৎ মৃত্যু। দেবীর ইঙ্গিতে সে তছনছ করে দিয়ে যায় হতভাগ্যের পরিবার, বুদ্ধি, সম্মান, সম্পত্তি ও প্রাণ।'

সুবেশ দেখতে পায় এই শীতেও ভবেশবাবুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মোছেন প্রৌঢ় অধ্যাপক, 'এর কোনো প্রতিকার?'

হেসে ফেলেন দ্বিজোত্তম, 'ভগবানের মার, দুনিয়ার বার। অন্তত আমার জানা কোনো প্রতিকার নেই। এক যদি না অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোনো অসাধারণ নারী বা পুরুষ কেউ অহৈতুকী কৃপা করেন। সেরকম মানুষ আজকাল আর দেখা যায় না।'

উঠে দাঁড়ান তিন জনেই, মন্দিরের চাতাল থেকে নামেন। জুতো পরে চলে যাবেন, আবার ঘুরে দাঁড়ান ভবেশ, 'কতদিন সময় নেয় এই পিশাচী কাজ শেষ করতে?' 'কাজ শেষ' বলার সময় গলাটা একটু কেঁপেই যায় ভবেশবাবুর। 'এক মাস', বলেন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, 'এক চান্দ্রমাস। এক অমাবস্যাতিথিতে সে হতভাগ্যের পিছু নেয়, পরের অমাবস্যার আগেই সব শেষ।'

মনে করার চেষ্টা করেন ভবেশ, ডামরী যেন কবে এসেছিল অতীনের সঙ্গে, মাই গুডনেস... ওঁর গলাটা এবার থরথর করে কাঁপতে থাকে, 'মানে সে যদি গত মাসের অমাবস্যায় আমার বন্ধুপুত্রের পিছু নেয়, তাহলে আপনার কথামতো...'

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একটিমাত্র আঙুল তোলেন তন্ত্রবিদ দ্বিজোত্তম মিশ্র, 'কালই অমাবস্যা। এক দিন, আপনার বন্ধুপুত্রের আয়ু আর মাত্র এক দিন।'

* * *

পরের দিন খুব সকাল সকাল ঘুম ভেঙে যায় অতীনের। উঠেই অনুভব করে যে শরীরটা খুব ঝরঝরে লাগছে। লেপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সে, জানালাটা খুলে দেয়। সঙ্গেসঙ্গে কিছু দুরন্ত কুয়াশা আর এক ঝাঁক সজীব শীত ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। বল্লমের মতন কিছু দীর্ঘ সূর্যরশ্মি ঘরের এদিক-ওদিক গেঁথে যায়।

আশ্চর্য অলৌকিক ভোর।

চটপট ফ্রেশ হয়ে নেয় অতীন। তারপর এক কাপ চায়ের জন্যে বেরিয়ে ডামরীর উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ে সে। এক বার নয়, বেশ কয়েক বার। কিন্তু কোনো উত্তর নেই।

চিন্তায় পড়ে যায় অতীন। আবার এর কী হল? ওপরে গিয়ে দেখে আসতে হচ্ছে তো!! দোতলায় গিয়ে অতীনের মনে পড়ে প্রায় দীর্ঘ দু-মাস পর দোতলায় পা দিল সে। অবশ্য দোতলায় বিশেষ কিছু নেইও।

দোতলার পাশ দিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ি বেয়ে উঠে ছাদ, আর তার পাশেই চিলেকোঠা। ডামরীর যেখানে থাকার কথা।

ছাদে পা দিয়েই গা গুলিয়ে উঠল অতীনের। সারা ছাদ জুড়ে বিভিন্ন পশু ও পাখির হাড়, কাকের ভাঙা বাসা, বড়ো বড়ো পালক, কাকের কাটা মাথা, এমনকী শকুন বা ওই জাতীয় কোনো পাখির দুটো কাটা পা অবধি পড়ে আছে! দুয়েকটা ভাঙা কুলো আর ঝাঁটা এক কোণে, তার পাশে সিঁদুরের স্তূপ আর বড়ো নারকেল মালায় রাখা খানিকটা কীসের তেল যেন! পাশে কিছু কালো সরষে ছড়ানো।

আতঙ্কিত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিল এসব অতীন। এসব কী তার বাড়ির ছাদে? কারা করেছে? মানে কী এসবের? ডামরী দেখেনি এসব?

হঠাৎ তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে জানান দিল যে তার এখানে থাকা ঠিক নয়। তাকে নীচে যেতে হবে। এক্ষুনি নীচে যেতে হবে। একমুহূর্তও সে যেন এখানে দাঁড়িয়ে না থাকে। তার ঘাড়ের সমস্ত রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল, হঠাৎ করে দুরন্ত শীতে তার দাঁতকপাটি লাগার উপক্রম।

কাঁপতে কাঁপতে সে নীচে নেমে এল। বাথরুমে ঢুকে গিজারের গরম জলে স্নান করার পর তার হাতে পায়ে কিছু সাড় আসে। স্নান করে সে ঝটপট জামাকাপড় পরে নেয়। তারপর ঘর থেকে বেরিয়েই দেখে ডাইনিং টেবিলের পাশে ডামরী।

তার দিকেই স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সাতসকালেই ডামরীকে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যায় সে। এ কি সেই নিঃসহায় নিঃসম্বল গ্রাম্য মহিলা, যাকে সে প্রায় রাস্তা থেকে তুলে এনে ঘরে জায়গা দিয়েছে? ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে? মুখটা একটু লম্বাটে দেখাচ্ছে ডামরীর, গালগুলো ভাঙা ও শুকনো। এক রাত্রেই যেন গায়ের রং কয়েক পোঁচ গাঢ় কালো হয়ে এসেছে। হাতের শিরা অস্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আছে, নখগুলোও দীর্ঘ, কালো ও বাঁকানো। শুকনো চুলগুলো হাহাকারের মতন উড়ছে হাওয়ায়। শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করল ডামরী, 'তুমি ছাদে গেছিলে?' গলা শুনেই চমকে উঠল অতীন। সেই গ্রাম্য বিধবার করুণ গলার স্বর কই? এই কর্কশ, তীক্ষ্ণ ও সামান্য সানুনাসিক গলা কার? আর শ্বদন্তদুটি অত বড়ো হল কী করে?

ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি ধরছিল অতীনের। ঠিক এই সময়েই সে টের পায় তার বুকের মধ্যে ধীরে ধীরে উষ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে সেই স্ফটিকখণ্ড। আর কোথা থেকে তার সেই শিরশিরানি ভাবটা উধাও হয়ে গিয়ে স্বাভাবিক সাহসটা ফিরে আসছে। সে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, 'ছাদে অত নোংরা কেন? তুমি থাকো ছাদে, এগুলো দেখতে পাও না? কীসের জন্যে রাখা হয়েছে তোমাকে?'

এরপরের ঘটনাটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না অতীন। ধক করে জ্বলে ওঠে ডামরীর চোখ দুটো, যেন চোখের কোটরে দু-টুকরো কাঠকয়লা জ্বলছে। ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখা হাতটা প্রবল আক্রোশে মুঠো করতে চায় সে, নখের আঘাতে কাঠের গা থেকে একটা ক্যরররররর আওয়াজ উঠে আসে অশ্লীল বীভৎসতার মতো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই, অতীন বুঝতে পারে আরও জ্বলে উঠেছে তার বুকের সেই স্ফটিক। না তাকিয়েও বুঝতে পারছে বুকটা পুরো নীল আভায় ভরে গেছে। দুইজনেই দুইজনের সামনে প্রতিস্পর্ধীর ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর যা ঘটল সেটা ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। যেন কিছুই হয়নি, এমন ভঙ্গিতে আগের মতোই লাজুক স্বরে ডামরী বলল, 'শরীলটা ঠিক নেই গো দাদাবাবু, পাখিতে এনে কিছুমিছু ফেলেছে বোধ হয়, আমি আজই পোষ্কার করে দিচ্ছি।' ডামরী ফের সেই গ্রাম্য বালাটি। গোলগাল স্নেহময় মুখ, স্বাভাবিক চোখ ও নখ। লাবণ্যময় হাত দু-খানি। যেন এক মুহূর্ত আগের সেই পৈশাচিক রুদ্রমূর্তির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই!

তারপর মাথা নামিয়ে খুবই দুঃখের সঙ্গে বলে, 'তবে একটা খারাপ খবর আছে দাদাবাবু, সকালে উঠে চাবি দিয়ে তালা খুলে দেখি মা আজ ভোগ নেন নি। আমার রান্নায় নিশ্চয়ই কিছু খুঁত ছিল, নইলে মা নেবেন না কেন? আজ তুমি একটু রাত করে ফিরো, কেমন? আজ অমাবস্যা, আজ মায়ের জন্যে মহাভোগ রান্না করে দেব। ঠিক আছে? মাকে আজ খুশি না করে ছাড়বই না', বলে খিলখিল করে হেসে ওঠে ডামরী।

খিলখিলের মধ্যে একটা শিউড়ে ওঠার মতন খলখল হাসির শব্দও কি মিশে ছিল? মেট্রোতে যেতে যেতে সে কথাই ভাবে অতীন।

অফিসে সবাই অতীনের এই আপাত পরিবর্তনে স্পষ্টতই খুশি হয়। বহুদিন বাদে সহকর্মীরা চুটিয়ে গল্প করে। রিজিয়োনাল ম্যানেজার সাহেব এসে একসঙ্গে সিগারেট খান, কুশল জিজ্ঞেস করেন এবং যথারীতি একগাদা কাজ চাপিয়ে দেন! অফিস থেকে বেরোতে বেশ রাত হয়ে যায় অতীনের। নতুন প্রডাক্ট লঞ্চ হবে। তার প্ল্যান প্রোগ্রাম বানিয়ে, রিজিয়োনাল ম্যানেজারকে দিয়ে অ্যাপ্রুভ করিয়ে, সেলস ম্যানেজারদের পাঠিয়ে অফিসের ঝাঁপ বন্ধ করতে করতে প্রায় সাড়ে ন-টা।

পাড়ায় ঢুকতে ঢুকতে প্রায় সাড়ে দশটা কি এগারোটা হয়ে যায় অতীনের। আর ঠিক সেইসঙ্গে লোডশেডিং। দাঁড়িয়ে পড়ে অতীন। যাঃ, একে অমাবস্যার রাত, তার ওপর লোডশেডিং। রাস্তার ত্রিফলাগুলো অবধি জ্বলছে না। মোবাইলেরও ব্যাটারি তলানিতে, ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাবার প্রশ্নই নেই। হাতড়ে হাতড়ে কোনোরকমে এগোচ্ছিল অতীন। অদ্ভুতভাবে তাদের পাড়াটাও আজ নিশ্চুপ। এমনিতেও নেতাজিনগর বাঙালদের এলাকা। লোকে নিজেদের মধ্যে প্রেমের কথাও সারা পাড়া না জানিয়ে বলতে পারে না। সেই এলাকা এমন নিঃশব্দ, এ তো ভাবাই যায় না! এই সময় তো লাইট জ্বালিয়ে ব্যাডমিন্টন, আড্ডা ইত্যাদি চলার কথা। লোডশেডিং বলে এরকম বিলকুল শুনশান হয়ে যেতে হয় না কি? এ কি গ্রামগঞ্জ, আটটা বাজলেই রাস্তাঘাট ফাঁকা? অনেক কষ্টে, পা প্রায় ঘষে ঘষে এগোচ্ছিল অতীন। হঠাৎ করে কে যেন তার কাঁধ খামচে ধরে। সে চমকে ওঠে প্রথমে, তারপর সেই আগন্তুকের গলায় 'অতীন' ডাক শুনে নিশ্চিন্ত হয়, 'কাকু, আপনি এখানে? এত রাতে? সারা পাড়া এত শুনশান কেন? সবাই কোথাও গেছে না কি? কোত্থাও একটা টর্চ, হ্যারিকেন, মোমবাতি কিছুই জ্বলছে না দেখছি।'

'জ্বলবেও না অতীন। আজ কোথাও কোনো আলো জ্বলবে না। কেউ জেগে থাকবে না। আকাশের দিকে তাকাও অতীন, কালরাত্রি নেমেছে, দেখতে পাচ্ছ?'

অতীনের সব কিছু গুলিয়ে যায়। কালরাত্রিটা কী বস্তু? আর এসব কী বলছেন ভবেশকাকু?

'আমি পাড়ার বাইরে ছিলাম এতক্ষণ। তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। আজ সারা পাড়া মড়ার মতন নিঃসাড়ে ঘুমোবে অতীন। আকাশের দিকে তাকাও অতীন। এ বড়ো ভয়ানক রাত। মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছে অতীন, তোমার জন্যে। আজ আমি সারারাত তোমার সঙ্গে থাকব, তোমার বাড়িতেই।'

আকাশের দিকে তাকায় অতীন, আর তখনই ব্যাপারটা তার বোধগম্যতার মধ্যে আসে। সমস্ত চরাচর কেমন যেন এক বিস্তীর্ণ নিঝুম স্তব্ধতায় কুঁকড়ে আছে। শুধু যে আলো নেই তা নয়, শব্দও নেই। ধুলোয় মলিন কলকাতার আকাশ। তারাগুলো যেন লাল রক্তবিন্দুর মতো জ্বলছে। কোথাও কোনো প্রাণ নেই, রূপ নেই, রং নেই, গন্ধ নেই। ঘোর অমানিশা যেন কোন এক বিপর্যয়ের আশঙ্কায় মূক। এই মোড় থেকে শেষ

বাড়িটা অতীনের, এখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়। অতীন দেখল তার বাড়ির ওপরে খুব ধীরে ধীরে একটা মিহি অন্ধকারের চাদর যেন নেমে আসছে। যেন একটা সর্বগ্রাসী অমঙ্গল সূক্ষ্ম পাপের মতন জড়িয়ে ধরছে বাড়ির সর্বাঙ্গ।

'দাঁড়াও অতীন, তোমাকে কয়েকটা কথা এক্ষুনি বলা দরকার।'

আরও প্রায় আধঘণ্টা। ভবেশবাবু তাঁর ও সুবেশের বামুনগাছি যাওয়া ও দ্বিজোত্তম মিশ্রের সঙ্গে কথোপকথনের পুরোটাই বলেছেন অতীনকে। গাঢ় নিকষ কালোর সঙ্গে মিশে গেছিল ভবেশবাবুর ফিসফিসানি। চুপ করে থেকেছে অতীন, শুধু একটাই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে, 'আজ রাতটা পাড়ার বাইরে কাটালে হয় না?'

'আজ রাত্রে এ পাড়ায় যে ঢুকবে, তার আর বেরোবার পথ নেই অতীন। আর যেখানেই যাও, সেই পিশাচী তোমাকে ছাড়বে না। আজই তার কর্মসমাপ্তির দিন, সমস্ত হিসেব চুকিয়ে দেওয়ার দিন। তার শিকার আজ সে ছাড়বে না অতীন।'

'কিন্তু কাকু, আপনি কেন স্বেচ্ছায় এর মধ্যে...'

অন্ধকারের মধ্যেও ক্ষীণ হাসিটা বুঝতে অসুবিধা হয় না অতীনের, 'তুমি হয়তো বুঝবে না বাবা। সবাইকে একদিন তাঁর কাছে গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়াতে হয়। কৃতকর্মের কৈফিয়ত দিতে হয়। তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন বিপদের দিনে পিতৃহীন মাতৃহীন ছেলেটাকে একলা ফেলে কোথায় পালিয়ে গেছিলে, কী জবাব দেব অতীন?' নিঃশব্দে হাসতে থাকেন সেই প্রৌঢ়।

কালই কে একজন যেন বলছিলেন না অতীনকে, যে ভালোবাসা হল সবচেয়ে বড়ো তন্ত্র, সবচেয়ে বড়ো জাদু?

নিজের বাড়ির তালা খুলে নিঃশব্দে প্রবেশ করে অতীন, পিছন পিছন ভবেশবাবু। এবং ঢুকেই দু-জনে হিম আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যান। একটা তীব্র মড়াপচা গন্ধ হু হু করে ছুটে আসে দু-জনের দিকে, দু-জনেই দ্রুত নাকে রুমাল চাপা দেন। এবং ঠিক তক্ষুনি সদর দরজাটা নিজে থেকেই নিঃশব্দে আঁট হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর বাঁ-দিকে যেতে চান দু-জনেই, ওদিকেই রান্নাঘর। এই জায়গায় একটা চেয়ার থাকার কথা, কারণ তার পাশেই ডাইনিং টেবিল। অভ্যেসমতন হাতটা বাড়ায় অতীন, এবং সে হাত শূন্যে ফিরে আসে। পা ঘষে ঘষে আরেকটু এগোয় দু-জনে। আশ্চর্য পিনপতনস্তব্ধ নৈঃশব্দ সারা বাড়ি জুড়ে। কয়েক পা এগোতেই অতীন বুঝতে পারে যে পুরো জায়গাটাই ফাঁকা। এইবার একটা মৃদু টুপ শব্দ দু-জনেরই কানে আসে, কয়েক সেকেন্ডের বিরতি দিয়ে, আরেক বার, টুপ। কিন্তু কীসের শব্দ বোঝার উপায় নেই। এর পর রান্নাঘরে হঠাৎ করে একটা লালচে আলো জ্বলে ওঠে। রান্না করবার আলো কি? সেই আলোর অতি সামান্য অংশ এসে পড়ে এদিকে। তাতে দু-জনেই দেখে যে সমস্ত মেঝে ফাঁকা, কিচ্ছু নেই।

অতীন আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল জিনিসগুলো গেল কই, এমন সময় পাঁজরে একটা মৃদু গোঁত্তা খেয়ে ভবেশবাবুর দিকে তাকায় অতীন, দেখে ভদ্রলোক আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে অতীনও সিলিঙের দিকে তাকায়, এবং আতঙ্কে কাঠ হয়ে যায়।

ডাইনিং টেবিল, চেয়ার, শু-রাক, কফি টেবিল, পাপোষ প্রত্যেকটা জিনিস উলটো হয়ে সিলিঙের সঙ্গে লেগে ঝুলছে। এবং প্রতিটা বস্তু থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে কোনো এক তরল মেঝেতে এসে ছিটকে পড়ছে, থেকে থেকে হাড় হিম করা শব্দ উঠছে, টুপ! সেই আবঝা আলোতেও বোঝা যায় যে সেই তরলটি রক্ত, এবং তার রং লাল, ঘন লাল।

এই বার থরথর পায়ে দু-জনে রান্নাঘরের দিকে এগোন, দু-পা দূর এগোতেই একটা খোনা গলায় মন্ত্রোচ্চারণ করার সুর ভেসে আসে।

ধীরে ধীরে দু-জনেই উঁকি দেন রান্নাঘরের ভেতরে, এবং আধো খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ স্থানু হয়ে যান।

ডামরী রান্না করছে! এবং তাকে দেখে দু-জনেরই হৃদপিণ্ড মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায়। অতীন তাকে দেখে আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়ে। কে এই সম্পূর্ণ উলঙ্গ পিশাচী? শুকনো অস্থিসার দেহ, সাপের মতন উড়ছে তার খোলা চুলগুলো। বীভৎস মুখ তার, অক্ষিকোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে বড়ো বড়ো রক্তবর্ণ চোখ, কালো ঠোঁটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে তাজা রক্তস্নাত, ঈষৎ বড়ো দুটি শ্বদন্ত। গলায় বিভিন্ন পাখির কাটা পা নিয়ে গাঁথা এক বীভৎস মালা ঝোলানো। ঘরের ঠিক মাঝবরাবর শূন্যে ভেসে আছে সেই পিশাচী। তার কপালে আর সমগ্র অঙ্গে তেল আর লাল সিঁদুর বিশেষ মুদ্রাছাপে অঙ্কিত। তার পা দুটি সামনে প্রসারিত, এবং সে দুটি দাউদাউ করে জ্বলছে। সেই জ্বলন্ত পা দুটির ওপর রাখা একটি হাঁড়ি, তার ভেতর থেকে লালচে ধোঁয়া উঠছে। সেই ডাকিনী প্রথমে তার শিরা ওঠা বাম হাত দিয়ে নিজের একটি স্তন নিজের বুক থেকে ছিঁড়ে নেয়। তারপর রক্তঝরা দাঁত দুটি দিয়ে তার স্তনবৃন্তটি ছেঁড়ে, উপচে পড়ে গাঢ় কালচে রক্ত। সেই রক্ত ডান হাতে ধারণ করে সে ফেলে সেই হাঁড়ির মধ্যে। তারপর ছিন্ন স্তনটি হাঁড়ির ওপর ধরে মোচড়াতে থাকে যতক্ষণ না রক্তের শেষ বিন্দুটকু অবধি পাত্রের মধ্যে পড়ে। অতঃপর সে বিচ্ছিন্ন স্তনটি ফের বুকে লাগিয়ে নেয়, যেন কিছুই হয়নি!

এরপর সে বাম হাতটি দীর্ঘ করে সে ঘরের কোণ থেকে একটি কাটা হাত তুলে আনে। তারপর শক্ত এবং কালচে হয়ে যাওয়া হিংস্র নখ দিয়ে সেই কাটা হাত থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেই হাঁড়ির মধ্যে দেয়। একটু করে দেয়, আর তারপর ডান হাত সেই হাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নাড়তে থাকে, এর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে অশরীরী খোনা গলায় সুরেলা মন্ত্রোচ্চারণ। ভবেশবাবু দরজা ধরে কাঁপতে থাকেন। অতীনের মনে হয় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। চৈতন্য বিলুপ্ত হতে হতে শেষ বারের মতন তার দৃষ্টি সেই কাটা হাতটির ওপর পড়ে। হাতের অনামিকাতে একটা আংটি না? এই আংটিটাই অতীনের মা মারা যাবার আগে সবাইকে সাক্ষী রেখে পুষ্পদিকে দিয়ে যান। এই আংটি অতীনের চেনা। এই হাতও অতীনের চেনা। এ হাত পুষ্পদির হাত!! মা-বাবা মরে যাবার পর যে মানুষটা অতীনকে নিজের ছেলের মতন আগলে রেখেছিল, তার হাত!



সেই বোধবুদ্ধি ভোঁতা করে দেওয়া অলৌকিক ভয়বিহ্বলতার মধ্যেও এই কথাটা অতীনের বুকে গেঁথে গেল, এই পিশাচীই খুন করেছে পুষ্পদিকে!!

কোথা থেকে একটা অব্যক্ত ক্রোধ অতীনের চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। রাগে তার সারা গা রি রি করে জ্বলতে থাকে। সে দরজার সামনে এসে সজোরে লাথি মারে দরজায়, দু-হাট হয়ে খুলে যায় দরজা। থুতু ছিটিয়ে অতীন খিস্তি করে, 'শয়তান ডাইনি, পুষ্পদিকে তুইই খেয়েছিস না? আমি আজই তোকে খুন করব রাক্ষুসী, নিজেকে কী ভেবেছিস তুই?'

ধীরে ধীরে সেই পিশাচীর ঘাড় ঘোরে এদিকে, শরীর ঘোরে না, শুধু ঘাড় ঘোরে। তারপর সেই প্রেতিনি খলখল শব্দে হেসে ওঠে, দুই হাতে তালি দেয়, হাসতে হাসতে খোনা গলায় বলে, 'মা কে ভোগ দেবে না দাদাবাবু? মহাভোগ?' তারপর সমস্ত রান্নাঘর, সমস্ত পাড়া, সমস্ত জগত, অতীনের সমস্ত চৈতন্য জুড়ে ঝড় ওঠে, কালরাত্রির মহাঝড়। অতীন দেখে সে যেন শূন্যে উত্থিত। তার চোখের সামনে আকাশের নীল চাদর যেন একঝটকায় কে ছিঁড়ে নিল। তখন অতীনের সামনে মহাশূন্য, আর সেই মহাশূন্যের সামনে সে একা, চারিধারে সর্বগ্রাসী, সর্বনাশী, সর্বধ্বংসী কালক্ষুধা। তার চারিপাশে শ্মশানের আগুন আকাশ বাতাস জ্বালিয়ে গলিয়ে সেই গলানো লালটকটকে পাপ যেন তরল মোমের মতন তার চৈতন্যের ওপর ফেলছে। কোন রসাতল থেকে যেন উঠে এসেছে হিংস্র শিয়ালেরা আর বীভৎসদর্শন দুই কুকুর, তাদের হিংস্র শ্বদন্ত আর রক্তলোলজিহ্বা থেকে রক্তফেনা উড়ে উড়ে পড়ছে। গলিত শব আর কঙ্কালের দল খলখল করে হাসতে হাসতে তাকে ঘিরে তালি দিয়ে নাচছে। অতীনের দিকে উড়ে আসে সিঁদুরমাখা হাড়ের টুকরো, কালচে রক্তের ছিটে। পচা চর্বি আর রক্ত পোড়া অভিশপ্ত পূতিগন্ধে তার চেতনা বিলীয়মান। তবুও শরীরের সমস্ত শক্তি সংহত করে সে দেখে সেই পিশাচী সম্পূর্ণ উলটো হয়ে সিলিং বেয়ে বেয়ে ধীর এবং নিশ্চিত পদক্ষেপে তার দিকে আসছে, উলটো হয়ে ঝুলছে তার অভিশাপের মতন উড়ন্ত চুল। খোনা গলায় সে জিজ্ঞেস করছে, 'মায়ের মহাভোগ দেবে না দাদাবাবু? খিঃ খিঃ খিঃ।' অতীনের একদম কাছাকাছি এসে গেছে সে, মড়াপচা অভিশপ্ত গন্ধে অতীনের চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায়, সেই পিশাচিনী দীর্ঘ হাত বাড়িয়েছে অতীনের গলা লক্ষ্য করে,

দুম করে যেন একটা আলোর বিস্ফোরণ ঘটে গেল ঘরের মধ্যে। দপ দপ করে অতীনের বুকের কাছে একটা আগ্নেয়গিরির নীল আভা উদ্গিরণ করতে শুরু করল পাগলের মতন। তার প্রথম ধাক্কাতেই সব অশরীরী অপ্রাকৃত অশুচি আত্মারা ছিটকে পড়ে চারিদিকে। সেই পিশাচী এক মরণান্তিক আর্তনাদ করে মেঝেতে ধপ করে পড়ে যায়। ধীরে ধীরে অপসৃত হতে থাকে যাবতীয় নরকভোগী পূতিগন্ধ।

অতীন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে তার বুকের স্ফটিক থেকে সঞ্জাত সেই আলো তার শরীরের চারিপাশে এক অলৌকিক বলয় তৈরি করেছে। শুধু সে নয়। মাটিতে লুটিয়ে থাকা অজ্ঞান ভবেশবাবুর শরীরের চারিপাশেও এক আবরণ তৈরি করে রেখেছে। ভালোবাসা হল সবচেয়ে বড়ো তন্ত্র, সবচেয়ে বড়ো জাদু!

আর সেই নীল বলয় ঘিরে সব অভিশপ্ত, নারকীয়, ভয়াল, পিশাচযোনিসম্ভূত ছায়া অব্যক্ত ক্রোধে নাচতে থাকে, সেই বলয় ছিঁড়ে ঢুকে আসতে চায়। উফফ কী বীভৎস তাদের চাউনি, কী উগ্র তাদের আক্রোশ। অতীনের সমস্ত জাগ্রত চেতনা ওলটপালট হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু কেউই সেই বলয় ভেদ করে আসতে পারে না।

এরপর মেঝে থেকে একটা খড়ড়ড়ড়ড় শব্দ ওঠে। সেই ভূলুণ্ঠিতা পিশাচী নিজের গলার হার থেকে শুকনো পাখির পা ছিঁড়ে নিয়ে নিজের কপালে লেপটে থাকা রক্তসিঁদুরে মাখিয়ে নেয়, তারপর বিড়বিড় করতে করতে তা নিক্ষেপ করে অতীনের দিকে। জবাবে অতীনকে ঘিরে থাকা সেই আলো দপ করে জ্বলে ওঠে। আর কিছুই হয় না। পিশাচী খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দেখে।

তারপর ঝড় ওঠে। হঠাৎ করে এক কালো ঝড় পিশাচীকে আচ্ছন্ন করে। বাকি সমস্ত ছায়াপ্রেত সেই ঝড়ে মিশে ঘূর্ণির মতন ঘুরতে থাকে। সেই ঘূর্ণন তীব্র হলে পর তা এক দমকে দরজা দিয়ে ছিটকে বেরোয়। অতীন তার ধাক্কায় মুখ থুবড়ে উলটে পড়ে। কিন্তু আঘাত লাগে না। সেই কালো ঝড় স্টাডি রুমে ঢোকে।

অতীন বহুকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে স্টাডি রুমের দরজার কাছে যায়। এবং ভিতরের দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে যায়। সেই উলঙ্গিনী পিশাচী দেবীর দিকে পিছন ফিরে উবু হয়ে বসেছে, সে ঝুঁকে বসেছে দেবীর সামনে দেওয়া ভোগের ওপর। সে কি নারকীয় বমনোদ্রেককারী দৃশ্য! ডাকিনী খিলখিল করে হাসতে হাসতে দুই হাতে সেই ভোগ উগ্র বুভুক্ষুর মতন দুই হাতে মুখে পুরছে! দু-হাতে ছড়াচ্ছে, আবার দু-হাত দিয়ে মুখে পুরছে, কিছু ছিটিয়ে ফেলছে থুতুর মতন। কিছু তুলে সারা মাথায় আর মুখে মাখছে।

অতীনের আর সহ্য হল না। কোনোমতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে সে বুক থেকে বার করে আনে সেই জ্বলন্ত নীল স্ফটিকখণ্ড, তারপর সজোরে ছুঁড়ে মারে সেই উগ্রডাকিনীর দিকে। একটা বিস্ফোরণ ও আর্তনাদের শব্দ। তারপর অতীনের চোখের সামনে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসে।

অত রাতে কেউ যদি জেগে থাকত, তবে সে দেখত যে হঠাৎ পাড়ার শেষ বাড়িটায় দপ করে জ্বলে উঠেছে একটা নীল আলো। সারা বাড়িটা থেকে যেন এক নীল আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অভিশাপের মতন যে কালো ছায়ার পরত সারা বাড়িটা ঘিরে নেমে এসেছিল, আস্তে আস্তে তা উঠে যাচ্ছে, গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু উড়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে। সব শেষে একটা দীর্ঘ কালো ছায়া বেরিয়ে আসে বাড়ি ছেড়ে। এক নারকীয় হাহাকার ও আর্তনাদের সঙ্গে সেও মিশে যায় মহাশূন্যে।

* * *

এক সপ্তাহ হাসপাতাল থাকতে হয়েছিল ভবেশবাবুকে। ছাড়া পেয়েই উনি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের ওপর নতুন উদ্যমে পড়াশোনা শুরু করেন।

অতীন পরের দিন রাতভোরে মূর্তিটা হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসে। এখন তার শখ হয়েছে ফুলের বাগান করার। তার গোলাপের কালেকশন দেখার মতন।

শুধু মাঝরাতে যখন কোনো ছোটো মালবাহী জাহাজ হাওড়া ব্রিজের নীচ দিয়ে যায়, কোনো কোনো নাবিক মাঝেমধ্যে জলের অনেক নীচ থেকে এক তীব্র লাল আলো দেখতে পায়, আর শোনে অতল জলের নীচ থেকে উঠে আসা সেই আহ্বান, ‘আমাকে উদ্ধার করো নাবিক। আমার খিদে পেয়েছে। আমাকে উদ্ধার করো। মহাক্ষুধা আমার। আমাকে ভোগ দাও, ভোগ!’

ইনকুইজিশন

১৫৬০। আগস্ট। গোয়া

ঘনকালো অন্ধকারে মেঠো রাস্তা ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে পাগলের মতন দৌড়চ্ছিলেন ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণী।

আমোনা গাঁয়ের মহাবেতাল মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণী পাণ্ডিত্যে, প্রজ্ঞায়, সদাচরণ ও ধর্মবেত্তায় শুধু আমোনা নয়, শুধু গোয়াপুরি নয়, সমগ্র দক্ষিণ কোঙ্কণে শ্রদ্ধার শীর্ষবিন্দুটি অধিকার করে আছেন। সুদূর গোপাকপত্তন থেকে কপর্দকদ্বীপ, সোপারা থেকে অঘনাশিনী নদীর তীর অবধি পণ্ডিত প্রবর ত্রিলোচনের খ্যাতির আলোকে উদ্ভাসিত।

সেই সম্মানের দিন বোধ হয় ফুরোল। একটা আসান গাছের নীচে দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিতে নিতে এই কথাটাই ভাবছিলেন উনি। প্রৌঢ় মানুষ, জীবনে দৌড়ঝাঁপ করেননি, শাস্ত্রালোচনাতেই কালাতিপাত করেছেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ দরদর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। চঞ্চল চোখে ব্যাকুল দৃষ্টিতে পিছনের দিকে তাকান, কেউ ধেয়ে আসছে না তো? আবার দৌড়তে থাকেন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, রাত ফুরোবার আগেই ওনাকে সাত ক্রোশ দূরের কুশস্থলী পৌঁছতে হবে। কোমরের কষিতে গুঁজে রাখা অমূল্য ধনটিকে পৌঁছে দিতে হবে কুশস্থলীর মঙ্গেশি মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের হাতে। তারপর সেই মহাপবিত্র, মহাশক্তির আধারখণ্ডটিকে লুকিয়ে রাখা হবে মন্দিরের মধ্যেই। আমোনা গ্রাম আর নিরাপদ নয়।

না, প্রধান মন্দির, বা গর্ভগৃহের মধ্যে না। ওসব জায়গায় খোঁজাখুঁজির সম্ভাবনা প্রবল। তা ছাড়া ভগবান রুদ্রের পবিত্র লিঙ্গ অস্ত্রদ্বারা স্পর্শ করার কথা কোনো গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।

মন্দিরের মধ্যে নয়, মন্দিরের পেছনে আছে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামদেবতা এবং কুলদেবতাদের ছোটো মন্দির, যেমন বীরভদ্র, সানতেরি, লক্ষ্মীনারায়ণ, সূর্যনারায়ণ এবং কালভৈরব! মনস্থির করে ফেললেন ত্রিলোচন, কালভৈরবের মন্দিরটিই এই অমিত শক্তির আধারটিকে লুকিয়ে রাখার প্রকৃষ্ট স্থান। এই অলৌকিক বেতাল শক্তিখণ্ড আর কেই বা অবলীলাক্রমে ধারণ করতে পারেন, কালভৈরব ছাড়া?

থেমে এক বার আকাশের দিকে তাকালেন ত্রিলোচন। বিড়বিড় করে নিজের কাছে নিজেই প্রতিজ্ঞা করলেন, দেবাদিদেব মহাদেব যদি সুদিন দেন, তাহলে তিনি, মহাজ্ঞানী বেতালসিদ্ধ তন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণী, তিনি নিজের হাতে সপ্তসিন্ধু আর সপ্তনদীর জলে বোধন করে, মহা আড়ম্বরে এই শক্তিখণ্ড মহাবেতালমন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। হাত দুটো মুঠো করে কপালে ঠেকিয়ে নেন এক বার, তারপর আবার দৌড়তে থাকেন।

সামনেই মাণ্ডবী নদী। ঘাটে দ্রুত নেমে যান উনি। একটা নৌকো থাকার কথা এখন। কিন্তু কিছু দেখা যাচ্ছে না কেন? থমকে দাঁড়ান ত্রিলোচন, ধরা পড়ে গেল নাকি সবাই? ধরা পড়ে গেলেন নাকি উনি? বুকটা ধড়ফড় করতে থাকে প্রৌঢ়ের। নিজের জন্যে ভয় করেন না উনি, কিন্তু যে মহাশক্তিশালী আধারখণ্ডটি নিয়ে যাচ্ছেন, তার সামান্য অপব্যবহারে প্রলয় আসতে পারে যে!!

নাঃ, ওই তো, একটা ছায়ামূর্তি যেন অন্ধকার থেকেই উদয় হয় ওনার সামনে, সামান্য ঝুঁকে প্রণাম করে, ‘প্রণাম হই জ্যেঠঠাকুর, এদিকে আসুন, আজ আপনাকে ওপারে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব এই অধমের ওপরে।’

গলাটা চিনতে কষ্ট হয় না, তাই আশ্বস্ত হন ত্রিলোচন, আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাতটা তুলে স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করেন, ‘অভীষ্ট পূর্ণ হোক বিঘ্ননাশ, কিন্তু তোমার নাও কোথায়?’

‘একটু কষ্ট করে এদিকে আসতে হবে ঠাকুর, কেউ যাতে দেখতে না পায়, তাই ঘাটের পাশে লুকিয়ে রেখেছি, এইদিকে, সাবধানে আসবেন ঠাকুর, বর্ষার সময়, ঝোপেঝাড়ে সাপ থাকতে পারে...’

এত বলার দরকারই ছিল না, শিয়রে মহাসর্বনাশ উপস্থিত থাকলে অনেক দুরূহ কাজই মানুষ প্রতিবর্তক্রিয়ায় এমন অনায়াসে করে ফেলে, যা হয়তো সে স্বাভাবিক অবস্থায় নিজে করার কথা ভাবতেই পারত না। কোনোরকমে হাঁচড়পাঁচড় করে নাওতে উঠে চিত হয়ে পড়লেন ত্রিলোচন। কোমরের গেঁজেতে হাত দিয়ে দেখলেন, নাহ ঠিকই আছে সব।

নাও চলতে থাকে, চিত হয়েই শুয়ে থাকেন ত্রিলোচন। আকাশের মেঘ ছিঁড়ে নীল আকাশ অনেকটা বেরিয়ে পড়েছে। ঘনকৃষ্ণ রাতের আকাশ। দু-একটা তারা দেখা যাচ্ছে। ওই তো শুক্র আর বৃহস্পতি, এইসময়ে বড়ো কাছাকাছি আসে। ওটা কি বীণা নক্ষত্র? আহা ওই যে, ধনুরাশি। মনটা স্ত্রী আর ষোড়শবর্ষীয় পুত্রটির জন্যে বড়ো ব্যাকুল হয়ে ওঠে ত্রিলোচনের। মন্দিরে নিত্যপূজায় ব্যস্ত ছিলেন উনি। যবনেরা মন্দির অপবিত্র করতে আসছে শুনেই মহাশক্তিটি বিশেষ ক্রিয়ায় তুলে নিয়ে মন্দিরের পেছনের দরজা দিয়ে দ্রুত দৌড়ে বেরিয়েছেন, স্ত্রী-পুত্রকে খবর দেবার সময় পাননি। তবে ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সব জেনে গেছে। পূর্বনির্ধারিত নিরাপদ পথে পালাতে পেরেছে কি? সবই তো বলে দেওয়া ছিল। আশা করা যায় নিশ্চয়ই পেরেছে। বুদ্ধিমান ছেলে ওঁর, নিজেই মৃদু হাসেন ত্রিলোচন। সামান্য বেশি বয়সেই একে পেয়েছেন উনি, তাও বিশেষ বেতালসাধনার পর। রূপে, গুণে, বুদ্ধিতে, স্থৈর্যে এ ছেলের জুড়ি গোটা গোয়াপুরিতে নেই, এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত উনি।

প্রায় অর্ধশতক আগে আলবুকার্ক নামের এক যবন সেনাপতি আদিল শাহি শাসন হটিয়ে যাবনিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু এই জয় এত সহজে আসত না, যদি না বিজাপুরী সুলতানশাহি দ্বারা বিতাড়িত এক হিন্দু গোষ্ঠী অধিপতি, নাম তিমায়া, এই বিদেশি যবনদের সম্পূর্ণ সহায়তা দিত। তাতেও আপত্তি ছিল না ত্রিলোচনের, ধর্মেকর্মে হাত না পড়লে এসব নিয়ে বিশেষ ভাবেননি উনি। রাজা রাজধর্ম পালন করবেন, পণ্ডিত কুলধর্ম, এই তো নিয়ম।

কিন্তু এই বিদেশি যবনরা বড়ো ক্রূর, নিষ্ঠুর আর নির্মম অত্যাচারী। ইউসুফ আদিল শাহ বিধর্মী শাসক ছিলেন বটে, কিন্তু এদেশেরই ছিলেন। পার্থক্যটা শুধু ধর্মেই ছিল, পাশাপাশি বাস করায় নয়, বিজাপুরী সুলতানশাহি হিন্দুদের ধর্মেকর্মে হাত দেয়নি কখনো। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ত্রিলোচন। তিমায়া, হে তিমায়া, মুসলমান রাজত্ব শেষ করার উদগ্র বাসনায় কী সর্বনাশ করলে তুমি? খাল কেটে এ কোন কুমির আনলে? এই বিদেশি যবনদের হাতে মহাসর্বনাশের কোন নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে গোয়াপুরিতে, তার আঁচ কিছু কিছু এখনই পেতে চলেছে গোয়ার হিন্দু আর মুসলমানরা।

চোখ বুজলেন ত্রিলোচন।

২০১৬। জুলাই। উত্তর আফগানিস্তান

মাথা নীচু করে নিজের ল্যাপটপে ডেইলি রিপোর্ট টাইপ করছিলেন কর্নেল মার্টিনহো ভাজ। রোজের রিপোর্ট রোজ যাওয়াটাই নিয়ম। বিরক্তি লাগছিল কর্নেল ভাজের। মাথা তুলে ঘাড়টা এদিক-ওদিক করে জড়তা ছাড়িয়ে নিলেন উনি। শরীরটা পেছন দিকে ধনুকের মতন বাঁকিয়ে একটা আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন জানলার দিকে।

জানলার বাইরে অপূর্ব দৃশ্য। বিকেলের পড়ন্ত রোদে হিন্দুকুশ পর্বতমালার বিস্তীর্ণ রেঞ্জ পুরো দৃষ্টিসীমা জুড়ে ঝলমল করছে। মার্টিনহো জানেন, এই রেঞ্জের ওপারেই তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান আর তাজিকিস্তান। তুর্কমেনিস্তান থেকে বয়ে এসেছে আমুদরিয়া। স্ট্র্যাটেজিকালি এমন ইম্পর্ট্যান্ট প্রদেশ মধ্য এশিয়াতেও কমই আছে। তাই এই বলখ প্রদেশের প্রধান শহর মাজার-ই-শরিফ স্মরণাতীত কাল থেকেই এত গুরুত্বপূর্ণ, মিলিটারি স্ট্র্যাটেজির দিক দিয়ে। এই শহর দখল করতে পারলেই কেল্লাফতে। হেরাত, কুন্দুজ

আর কাবুল, তিনটেতেই ঢোকার পথের ওপর প্রশ্নাতীত আধিপত্য, বলতে গেলে, সমগ্র উত্তর আফগানিস্তান আর হিন্দুকুশ রেঞ্জ হাতের মুঠোয়।

আফগানিস্তানের এই বলখ প্রদেশ পুরো পাহাড়ি অঞ্চল, যেমন উঁচু, তেমন শুকনো। সর্বোত্তম মাউন্টেন ওয়ারফেয়ারের ট্রেনিং না থাকলে এই পাহাড়ি অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে বসে যুদ্ধ বা ছায়াযুদ্ধ, দুই-ই চালিয়ে যাওয়া কঠিন।

মৃদু হাসলেন মার্টিনহো। কঠিন কাজটাই তো করার জন্যে ওনারা রেঞ্জার্স। পর্তুগালের বিশেষ কম্যান্ডো ফোর্স 'স্পেশাল অপারেশনস ট্রুপ সেন্ট্রো দে ত্রোপাস অপেরাশোস এসপেশিয়ালসের' বা সিটিওই। উজ্জ্বল নক্ষত্র মার্টিনহো ভাজ জানেন, যেকোনো কমব্যাট পরিস্থিতিকে মুহূর্তে নিজের সপক্ষে নিয়ে আসতে সিটিওই-এর রেঞ্জার্সদের সমকক্ষ বলতে শুধু ইউ এস-এর ডেল্টা ফোর্স বা ইউ কে-র স্যাস। অবশ্য ইজরায়েলের সায়ারেত মটকাল বা ইন্ডিয়ার মার্কোসেরও খুব প্রশংসা শুনেছেন মার্টিনহো। রেঞ্জার্সদের ছাড়া, এই শত্রুবেষ্টিত সংকুল জায়গায় ন্যাটোর রেজোলিউট সাপোর্ট মিশনের পার্ট হয়ে এই টাফ কভার্ট অপারেশনস ক-জন পালন করতে পারত, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন মার্টিনহো। তালিবান, আলকায়েদা এসব এদিকে অনেকটাই ঠান্ডা। এখন যা অ্যাকশন তো সিরিয়া আর ইরাকে। অ্যাকশনের মানুষ তিনি, বসে বসে রিপোর্ট পাঠাতে পাঠাতে শরীরে জং ধরে গেল। আহা, দু-চারটে আইসিস ধরে ইন্টারোগেট করবেন, তবে না সুখ। দু-চারটে ইয়েজিদি মেয়েদের হাতের কাছে পেয়ে নিজেদের খুব বীরপুঙ্গব ভাবছে এই জাহান্নমের শয়তানগুলো...

ভাবতে ভাবতেই অত্যাধুনিক লোরান সিস্টেমসের ভিডিয়ো স্ক্রিনটা ব্লিঙ্ক করতে থাকে, ইনকামিং কলের সিগন্যাল ভেসে আসে। দ্রুত টেবিলের কাছে ফিরে আসেন মার্টিনহো। সামান্য বিস্ময়ে ভ্রূ-দুটো ওপরে ওঠে, তারপরেই স্বাভাবিক হয়ে অ্যাকসেপ্টেন্স বাটনটা টেপেন উনি। হেডকোয়ার্টার ল্যামেগো থেকে কল, অন মোস্ট সিকিওরড চ্যানেল। সামথিং মাস্ট বি গোয়িং হরিবলি রং... ভাবতে ভাবতেই অভ্যস্ত গলায় বলেন 'রেঞ্জার্স ফিফটি থ্রি আলফা হ্যাশ। গুড আফটারনুন কমান্ডান্ট।' স্ক্রিনে সিটিওই-এর প্রধানের কঠিন চৌকো খুনি মুখটা ভেসে ওঠে, এমনিতে ঠান্ডা মাথার লোকটাকে বেশ উত্তেজিত লাগে আজ, প্রতি অভিবাদনের ধার ধারেন না, 'রেঞ্জার্স টুয়েন্টি নাইন ল্যামডা কাপা। কর্নেল, আপনার কাছে ঠিক তেরো মিনিট সময় আছে টু রিচ আলিয়াবাদ স্কুল, হুইচ ইজ আন্ডার সিজ ফ্রম সাম ফ্যাকশনস অফ তালিবান। ক্লোজ টু ওয়ান হান্ড্রেড স্টুডেন্টস, ইনক্লুডিং ফিউ টিচার্স আর টেকেন ক্যাপটিভ। টোটাল সিক্স মিলিট্যান্টস আর ইন অ্যাকশন।'

প্রথমে চমকে ওঠেন, তারপরেই ঘেন্নায় চোয়ালটা শক্ত হয়ে ওঠে মার্টিনহোর। এই বেজন্মাগুলো এখন বাচ্চাদের ওপর পৌরুষ ফলাতে গেছে। বাঞ্চ অফ মোরোনস। সামনাসামনি লড়ার দম নেই এই বাস্টার্ডসদের, যত বীরত্ব নিরস্ত্র নিরীহ লোককে ক্যামেরার সামনে হত্যা করার সময়। ঘেন্নায় আর রাগে গা-টা রি রি করে ওঠে মার্টিনহোর, আজ এদের এক-একটাকে ধরে ধরে...

'টেক কেয়ার মার্ট, বি এক্সট্রিমলি কশাস। মোস্ট অফ দ্য কিডস আর অফ টেন টু টুয়েলভ ইয়ার্স অফ এজ।' বলে একটু দম নেন চিফ, 'অলমোস্ট অ্যাজ ইয়াং অ্যাজ তিয়াগো। ভাবো, আজ তুমি তোমার এক-শো-টা ছেলেকে বাঁচাতে যাচ্ছ। একটা বাচ্চার গায়েও যেন আঁচড় না পড়ে। অ্যান্ড লিকুইডেট দোজ অ্যাসহোলস। থারটিন মিনিটস টু রিচ। ওভার।' 'ওভার অ্যান্ড আউট' বলে চুপচাপ ফোনটা রেখে মাস ইন্ট্রাকমের দিকে এগিয়ে যান মার্টিনহো। তিয়াগো ওঁর ছেলে, একমাত্র ছেলে। বুকের পাঁজরের থেকেও মার্টিনহো ভালোবাসেন নিজের ছেলেকে। পাথরের মতন রসকষহীন শুকনো মানুষটা, হাই অলটিচিউড ওয়ারফেয়ার থেকে জাঙ্গল কমব্যাটে যার সমান ঈর্ষনীয় দক্ষতা, খালি হাতে যে একাই দশ বারোটা সশস্ত্র লোকের মহড়া নিতে পারে, ক্লোজ কোয়ার্টার কমব্যাট টেকনিক ক্রাভ মাগাতে যার তুল্য কমান্ডো গোটা ইউরোপে নেই, শুধু হাতে শত্রু খুন করাটা যার বিশেষ স্পেশিয়ালিটি, কম করে গোটা কুড়ির ওপর

জঙ্গিহানা সামলানোতে নেতৃত্ব দিয়েছে যে লোকটা, সেই লোকটাই তিয়াগোর শুধু সর্দি হবার খবরে পাগলের মতন করতে থাকে। কঠিন নাস্তিক লোকটা চার্চে মোমবাতি জ্বালাতে দৌড়য় তিয়াগোর সামান্য জ্বর হলে।

এসব আরও করে সিসিলিয়া মারা যাবার পর। সিসিলিয়ায় তিয়াগোর মা।

আজ এক-শো-টা তিয়াগোকে বাঁচাতে হবে। চোয়ালটা শক্ত হয়ে আসে মার্টিনহোর।

দ্রুত মাস ইন্ট্রাকমটা তুলে নেন হাতে, 'এমার্জেন্সি কল রেঞ্জার্স, রেটিং এক্স। অনলি টেন মিনিটস টু রেসপন্ড। একটি শিশুদের স্কুল দখল করা হয়েছে। প্রায় এক-শো-টি শিশু বন্দি। সিক্স মিলিট্যান্টস টু নিউট্রালাইজ। নট আ সিঙ্গল কিডস টু গেট হার্মড। নিড টুয়েলভ ভলান্টিয়ার্স। আলিয়াবাদ স্কুল, এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দেড় কিলোমিটার, ডাউনটাউন। গেট আর্মড টু দ্য টিথ। লেটস মুভ ফাস্ট।'

বারো জন ঠান্ডা মাথার খুনে রেঞ্জার্স নিয়ে খ্যাপা প্যান্থারের মতোই ছুটে চললেন কর্নেল মার্টিনহো ভাজ।

১৫৬০। আগস্ট। গোয়া

সন্ধের অন্ধকারে লোকগুলো চুপচাপ মশাল জ্বালিয়ে হেঁটে আসছিল। ঠান্ডা বাদলা হাওয়ায় বেঁকে যাচ্ছিল আগুন, উড়ে যাচ্ছিল মশালের কালো ধোঁয়া। জঙ্গল পেরিয়ে মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া দলটিতে আছে দশ বারো জন বিদেশি সৈন্য, সামনে দু-জন দেশীয় পথপ্রদর্শক। দু-জন বিদেশি ঘোড়ায় চড়ে পাশে পাশে যাচ্ছিলেন, তাঁদের সাজপোশাক আর কঠিন চোয়ালে স্পষ্ট যে এই দুইজনই অত্যন্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।

ছোটো দলটি যতদূর সম্ভব কম আওয়াজ করে হেঁটে যাচ্ছিল। কারো মুখে কোনো কথা নেই, পথঘাটও জনহীন। শুধু ঘোড়ায় বসা দীর্ঘকায় রাজকর্মচারীটি এক বার জিজ্ঞেস করলেন চাপা গলায় 'আর কতদূর? আকাশে মেঘ করেছে, বৃষ্টি এল বলে।' 'বেশিদূর নয় সেইনর' এক বিদেশি সৈনিক সম্ভ্রমভরা গলায় উত্তর দেয়, 'এই মাঠটা পেরিয়েই সেই মন্দির।'

একটু পরেই একটি মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল ক্ষুদ্র দলটি। মশাল উঁচু করে তুলে ধরল কয়েক জন। ধীরে ধীরে মেঘকালো অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে জমাটবদ্ধ এক পাথুরে অন্ধ পাহাড়ের মতোই শতাব্দীপ্রাচীন সেই মন্দিরটির অবয়ব ফুটে উঠল। দুইজন বিদেশি সিপাহি এসে ঘোড়া দুটির লাগাম ধরতে ঘোড়া থেকে নেমে আসেন দুই রাজপুরুষ। দু-জনেই আকাশের দিকে তাকান। ঘন কালো মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ, স্তব্ধ অশনিসংকেত ব্যপ্ত এই চরাচরে। ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা মুখে এসে লাগছে। মাথার টুপি উড়ে যাচ্ছিল, সেটাকে ধরে আবার মাথায় বসিয়ে নিয়ে দীর্ঘকায় রাজপুরুষটি আঙুলের ইঙ্গিতে দেশীয় দু-জনকে আদেশ দেন মন্দিরে উঠতে। চকিতে পা জড়িয়ে শুয়ে পড়ে দু-জনেই, 'গরিবকে মাফ করুন হুজুর। মেরে ফেলুন, কেটে ফেলুন, কিন্তু দয়া করে এই মহাজাগ্রত রুদ্রবেতাল মন্দিরের দরজা খোলাবেন না আমাদের দিয়ে। প্রধান পুরোহিত ছাড়া দিনের বেলাতেই কেউ এর দরজা খোলে না, আর আমরা রাতের বেলা দেবতার ঘুম নষ্ট করে অভিশাপ ডেকে আনব নাকি? আমাদের চৌদ্দপুরুষ নরকে যাবে হুজুর। আমাদের রেহাই দিন হুজুর... রাস্তা দেখাতে বলেছিলেন, রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এখন...'

আচমকা একটা জুতোর ঠোক্কর এসে প্রথম দেশীয় লোকটির মুখে সপাটে আছড়ে পড়ে, যন্ত্রনায় কঁকিয়ে ওঠে সে। অন্য লোকটি ভয়ে জড়সড় হয়ে যায়। কঠিন মুখে থুতু ছিটিয়ে আদেশ দেন দীর্ঘকায় রাজপুরুষটি, 'শয়তান হিন্দু, এইসব খেলা আমাদের সঙ্গে খেলিস না, অনেক দেখেছি তোদের। নোংরা, অবিশ্বাসী, নর্দমার কীট তোরা। তোদের এইসব পুতুলগুলোও নোংরা, আর বেজন্মার বাচ্চা তোরাও নরকের এই পুতুলগুলোকে পুজো করে চলেছিস। ভিখিরি শয়তানের দল, ওঠ, মন্দিরে ওঠ, দরজা খোল। ওরে, কে আছিস, বেয়নেটটা এই অপবিত্র পশুটার গলায় ধর তো, বিন্দুমাত্র বেচাল দেখলে গলাটা ফালাফালা করে দিবি।'

অঙ্গবস্ত্রে মুখের রক্তটা মুছে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় সেই দেশীয় লোকটি, এক বার চোখ তুলে তাকায় দীর্ঘকায় রাজপুরুষটির দিকে। অন্ধকারের মধ্যে চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠেই নিভে যায়। তারপর মাথা

নীচু করে পা বাড়ায় মন্দিরের সিঁড়ির দিকে। দ্বিতীয় দেশি লোকটিও তার পিছনে পিছনে যেতে থাকে। পিছনে পিছনে বাকিরা।

ধীরে ধীরে মন্দিরের পাথুরে সিঁড়িতে পা রাখে প্রথম লোকটি। সঙ্গেসঙ্গে শোঁ শোঁ করে বাদুলে হাওয়ার দাপট বেড়ে ওঠে। মাঠের মধ্যে একটা ছোটো হাওয়ার ঘূর্ণি কাঠকুটো ধুলো মিশিয়ে ঘুরতে থাকে। অন্ধকারেই তার মধ্যে একটা শূন্য হাহাকারের ডাক মিশে গেল কি? দেশীয় দু-জন যেন একটু কেঁপে ওঠে সেই আওয়াজে। তবুও ধীরে ধীরে চাতালে ওঠে ওরা। চওড়া পাথুরে চাতাল পেরিয়ে যায় ভারী পা দুটো টেনে টেনে। পেছনে বিদেশি হানাদারদের দল, আর সেই রাজপুরুষ দু-জন। কয়েক পা হাঁটা, তারপর কাঠের সেই ভারী দরজা। দরজায় কোনো আগল নেই, এমনকী বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থাই নেই। কারণ অন্ধকারে চুপিসারে রুদ্রবেতালের মন্দিরের চাতালে ওঠার, বা দরজা খোলার দুঃসাহস শুধু আমোনা গাঁ কেন, গোটা বিচোলিম তালুকা, এমনকী সমগ্র দক্ষিণ কোঙ্কণে কারও নেই। হিন্দুধর্মে বহু দেব-দেবীর পূজা হয়, কিন্তু সমগ্র ভারতে বেতাল শুধু মাত্র এইখানেই পূজিত হন রুদ্রবেতাল রূপে, দেবাদিদেব শিবের অনুচর হিসেবে। একমাত্র মহাতন্ত্রধারক, অঘোরীদীক্ষিত, বেতালসিদ্ধ প্রধান পুরোহিত ছাড়া এই মন্দিরের দরজা কেউ খোলে না। প্রধান পুরোহিতের অনুমতি ছাড়া কেউ চাতালে ওঠে না, পূজার্চনাও করতে আসে না। এই বেতাল মহাভয়ংকর, মহাক্রোধী, স্বয়ং মহাকাল, পূজার্চনার তিলমাত্র ত্রুটিতে মহাঅনর্থ উপস্থিত হয়।

ধীরে ধীরে মানুষের হাতের ধাক্কায় খুলে যায় সেই প্রাচীন কাঠের বিশাল দরজা। সঙ্গেসঙ্গে তুমুল বজ্রপাত হয় কাছেপিঠেই কোথাও। সকলে সচকিত হয়ে ওঠে। বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা ধেয়ে আসে চারিদিক জুড়ে। কাঁপাকাঁপা পায়ে ভেতরে প্রবেশ করে দেশীয় দুইজন, প্রায় তৎক্ষণাৎ হুড়মুড় করে ভেতরে ঢোকে বাকিরা। ঢুকেই দরজা কবাট বন্ধ করে দেয় কেউ।

'মশালগুলো তুলে ধরো' কড়া গলায় আদেশ দেন দীর্ঘদেহী রাজপুরুষটি। এই গর্ভগৃহে কোনো জানলা নেই। তাই ফুল, তেল, অগুরু, সিঁদুর আর রক্তচন্দনের চাপা গন্ধে ভরে আছে ভেতরটা। চারিদিকে নিকষ কালো দেওয়াল, যেন খেয়ে ফেলবে অনধিকার প্রবেশকারীদের! আর সব কিছু ভেদ করে, ওপাশের দেওয়ালে বিশাল একটা অবয়ব।

রুদ্রবেতালমূর্তি!!

আস্তে আস্তে মশালগুলো ওপরে ওঠে। কাঁপা কাঁপা হাতে কয়েক জোড়া বেয়নেটও। বেতালমূর্তি প্রকটিত হয়।

মুহূর্তে দেশীয় দুইজন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হয় মূর্তির সামনে। উচ্চৈঃস্বরে স্তবমন্ত্র আওড়াতে থাকে। লালরঙের মেটে সিঁদুর, যজ্ঞভস্মের কালি আর এরণ্ড তেল মাখানো ভয়াবহ সেই মূর্তির সামনে বিদেশিরাও একটু ঘাবড়ে যায় প্রথমে। সবাই বুকে হাত দিয়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকে। দীর্ঘদেহী রাজপুরুষটি অস্ফুটে বলে ওঠেন 'মাই গড। কী ভয়ানক দেখতে এদের দেবতা। নরক থেকে উঠে এসেছে মনে হয়, কি বলেন মনসেইনর রেভারেন্ডো?'

অপেক্ষাকৃত খর্বকায় দ্বিতীয় রাজপুরুষটি এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে মূর্তিটাকে দেখছিলেন। ভয়াবহই বটে। বেলেপাথরের তৈরি মূর্তি, ফুট দশেক মতন লম্বা। চোখের দিকে তাকালে ভয় করে, পাথরের চোখে এত ক্রূরতা আর ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলা যায় কে জানত? ওস্তাদ স্কাল্পটর, মানতেই হবে! তার ওপর অস্বাভাবিক বড়ো কান দুটি, তাতে আরও ভীতিজনক দেখায় মূর্তিটিকে। তবে যেটা আশ্চর্যজনক লাগে ওনার কাছে, সেটা হল দাড়ি। গত কয়েক বছরে অনেক জায়গায় অনেক হিন্দু মূর্তি দেখেছেন উনি, কিন্তু কোনো মূর্তিরই দাড়ি ছিল না। এখানে আছে। মূর্তির ডান হাতে একটা পাথরের দণ্ড বা স্টিক, বাঁ-হাতটা কিছু নেবার ভঙ্গিতে এগোনো, মুঠি করা। দুটি পায়ে বেয়ে দুটি সাপ উঠছে। তবে মূর্তির সবচেয়ে কদর্য অংশ হচ্ছে দীর্ঘ, অনাবৃত লিঙ্গটি!

বিরক্তিতে এবং বিবমিষায় গা গুলিয়ে ওঠে ওঁর। হোলি জিশাস, মনে মনে বিড়বিড় করেন উনি। এইসব ফিলদি আগলি ডেমনদের পুজো করে এই নোংরা লোকগুলো? এ তো সাক্ষাৎ শয়তানের প্রতিমূর্তি! বিড়বিড় করতে করতে বুকে ক্রুশ আঁকেন তিনি। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে এই ইন্ডিয়ান পিশাচগুলো এইভাবে জাহান্নমের রাস্তায় এগিয়ে যাবে? এইসব নীচু, অপরিষ্কৃত অবিশ্বাসী ইন্ডিয়ানদের উদ্ধার করে প্রভু যিশুর রাস্তায় নিয়ে আসার জন্যেই তো ওঁরা এই গড ফরসেকেন ল্যান্ডে এসেছেন। বিপথগামীদের উদ্ধার করাই তো একজন ক্রাইস্টের সেবকের জীবনের চরমতম ব্রত। তাই তো কষ্ট করে পোপ পঞ্চম নিকোলাসের প্যাপাল বুল রোমানাস নিয়ে, সম্রাট তৃতীয় জনের আদেশ শিরোধার্য করে, প্রভু যিশুর প্রেমের পথে সবাইকে টেনে নিতেই ওনার আগমন এই গোয়াতে।



এবং তার রাস্তায় যদি কেউ বিন্দুমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাকে বা তাদের সমূলে উচ্ছেদ করতে উনি বদ্ধপরিকর এবং এ বিষয়ে উনি বজ্রাদপি কঠোর। অনিচ্ছুক পতিত লোকজনকে উদ্ধার করে প্রেমের প্রভু যিশুর পথে আনতে গেলে একটু রক্তপাত তো হবেই। স্থানীয় সমস্ত শয়তান পুতুলদের পুজো বন্ধ না করলে প্রভু যিশুর বার্তা প্রচার করা বড়ো কঠিন হয়ে পড়ে যে! তার ওপর আবার পুতুল পুজো থেকে মন না সরালে ক্রুশ পুজোতে মন দেবে কী করে এরা? সম্রাট বা পোপ কি তা সইবেন? পর্তুগালের রাজদরবার ছেড়ে আসার সময় দরবার রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ওঁর নজর এড়ায়নি। সম্রাট তৃতীয় জনের বয়েস হয়েছে। এর পর, অঘটন কিছু না ঘটলে সম্রাট হবেন সেবাস্টিয়ান। অবশ্য বকলমে রাজত্ব থাকবে রানি ক্যাথারিনের হাতেই, সে নিয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয়। ইনি আবার জেস্যুইটদের একনিষ্ঠ সেবক, মানে চলবেন তাদের কথাতেই। মনে মনে একটা বাজে গালি দেন মহিলার উদ্দেশ্যে, বুড়ি যেমন গোঁড়া, তেমনই বোকা। সে যাই হোক, মালিক বা মালকিন বোকা হলে সবারই সুবিধা। কিন্তু পর্তুগালের রাজদণ্ডটির নীচে পাকাপাকিভাবে মাথা গুঁজতে গেলে কিছু একটা তো করে দেখাতে হয়!! এখন এই বাজারে পড়ে থাকে দুটিমাত্র কাজ, এক, নতুন দেশ জয়, যা খুবই পরিশ্রমসাধ্যকাজ!! ইনি আবার তলোয়ার কেন, চামচ ছাড়া কিছুই নাড়াতে জানেন না। সেক্ষেত্রে, তদভাবে দ্বিতীয় পন্থা, বিজিত নতুন দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রসারণ, আর কি? তলোয়ার আর খ্রিস্টধর্ম, এ ছাড়া সম্প্রসারণ করার মতন ইউরোপের আর আছেটাই বা কি এখন?

উনি অবশ্য এদেশে এসেছেন বিশেষ কাজে, পোপের আদেশে। সে আদেশের বিন্দুবিসর্গ পোপ ছাড়া আর কেউ জানে না, সম্রাট অবধি না !

আজ থেকে দশ বছর আগে স্বয়ং পোপ ওঁকে বিশেষ আদেশবলে ডেকে পাঠান। এক বিষন্ন বর্ষণক্লান্ত বিকেলে সেই সংক্ষিপ্ত আলাপ এখনও মনে আছে ওঁর। ভ্যাটিকানের এক রুদ্ধকক্ষে, এক সান্ধ্য আলাপের আসরে মিলিত হয়েছিলেন দু-জনে, টেবিলের ওপর খোলা ছিল একটি শতাব্দীপ্রাচীন বৃহৎ বই। আকারে ইঙ্গিতে অনুমান করেছিলেন তিনি, ভ্যাটিকানের সবচেয়ে সুরক্ষিত ভল্ট থেকে তুলে আনা এই বইটি। যে ভল্টে একমাত্র স্বয়ং পোপ ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার নেই। উৎকৃষ্ট বেলজিয়ান সুরা পানের পর পোপ চতুর্থ পায়াস একটি বিশেষ কাজের ভার তাঁকে দিয়েছিলেন, বইটির রেফারেন্স দিয়ে। কাজটা আর কিছুই না, পশ্চিম ইন্ডিয়াতে, যেখানের রাস্তা সবে উন্মুক্ত হয়েছে, সেখানকার একটি বিশেষ স্থানে নাকি একটি অতিপ্রাকৃতিক আধিদৈবিক মহাশক্তির আধার আছে, সেটি তুলে এনে পোপের হাতে সমর্পণ করতে হবে। এই পোপ না হোক, পরের পোপ। এইটাই আদেশ, এবং সম্রাট তৃতীয় জন যেন এর বিন্দুমাত্র আঁচ না পান। এ আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা, কোনোটাই অবশ্য ওঁর ছিল না। কারণটা বক্তব্যের আসল জায়গাটা তিনি ঠিকই বুঝেছেন, ‘এই পোপ না হোক পরের পোপ!’ মানে ইচ্ছেটা পোপ চতুর্থ পায়াসের ব্যক্তিগত নয়, সমগ্র খ্রিস্টান ধর্মজগতের, এবং পরিকল্পনাটি আজকের নয়, বেশ অনেকদিনের। এ কাজে অনেক সাহস করেই হাত দিতে হয়, এবং শেষমেশ এই পোপই দিয়েছেন। তার অবশ্য কারণ আছে। ইনি অতি প্রতাপশালী লোক, শুধু পোপই নন, ইতালির মহা ক্ষমতাধর মেদিচি পরিবারের সন্তানও বটে!

তা এই মহাশক্তিধর ব্ল্যাক মাজিক আর্টিকেলটির খোঁজ হিজ হোলিনেস পোপ পেলেন কী করে? এ প্রশ্নও করেছিলেন তিনি, জবাবে পোপ মৃদু হেসে সামনে খোলা বইটির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। কী বই, কার লেখা, কী বৃত্তান্ত, এ নিয়ে আর কৌতূহল দেখাননি তিনি। পোপের অনুরোধ খ্রিস্টীয় অনুশাসনের যেকোনো সৈনিকের কাছে কালান্তক আদেশের সমান। তিনিও আর প্রশ্ন করেননি, এক-শো বছর আগে জারি করা পোপ পঞ্চম নিকোলাসের আদিষ্ট ‘প্যাপাল বুল রোমানাস পন্টিফে’ বা পোপের বিশেষ আদেশ নিয়ে সোজা এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছেন। ইতিমধ্যে পদোন্নতিও ঘটেছে ওঁর, গোয়াতে পর্তুগিজ রাজত্ব স্থাপন করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্যে পর্তুগালের রাজদ্বারে বিপুল প্রতিপত্তি জুটেছে তাঁর, কিন্তু পোপের আদেশ ভোলেননি। তাই প্রথম সুযোগেই ইনি এখানে। তারপর তন্নতন্ন করে খুঁজে, লক্ষণ মিলিয়ে,

অজস্র উপকথা আর জনশ্রুতি শুনে আজ যখন তিনি সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত স্থানে এসে উপস্থিত, তখন দেখছেন যে, যার জন্যে এত প্রাণপাত, সেই জিনিসটিই ফুড়ুৎ!!!

মূর্তির পাদদেশে একটি ছোটো চৌকো পীঠস্থান মতো আছে। তার ওপরেই এই পাথুরে মূর্তিটি। হিসেবমতো তারই মধ্যে বিশেষ প্রকৌশলে লুকোনো থাকার কথা সেই পোপের আদিষ্ট মহাশক্তিধর জিনিসটির। উনি প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন, দরকার পড়লে পীঠস্থানটি খুঁড়ে দেখবেন বলে। এখন বোঝাই যাচ্ছে যে তার আর দরকার নেই। কারণ চৌকোণা পীঠস্থানটির সামনে একটি ছোট্ট চৌকো গহ্বর খালি। বোঝাই যাচ্ছে যে ওখানে বহু যত্নে কিছু লুকিয়ে রাখা ছিল, হয়তো বহু প্রাচীন কাল থেকে। এবং এখন আর নেই!! চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে মনসেইনর রেভারেন্ডোর। চোখ দুটো একটু সরু হয়েই স্বাভাবিক হয়ে যায়।

এই জিনিসের খোঁজ এক জনের পক্ষেই জানা সম্ভব, এবং সেই-ই সরিয়েছে জিনিসটা। একটা শীতল ক্রোধ ওনার মেরুদণ্ড বেয়ে মাথায় উঠতে থাকে।

'এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কোথায়? তাকে আমার চাই, এক্ষুনি, যে করে হোক', সেই পাথুরে মন্দিরের মধ্যে গমগম করতে থাকে ওনার স্বর।

দীর্ঘদেহী রাজপুরুষটি একটু সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসেন, 'ইয়ে, একটা ছোটো অসুবিধা হয়েছে মনসেইনর। আমি আদেশ দিয়েছিলাম প্রধান পুরোহিত, আর তার পরিবারকে বন্দি করতে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রধান পুরোহিত কোনোভাবে টের পেয়ে পালায়। আমরা অবশ্য তার স্ত্রী আর ছেলেকে আটক করেছি, ফোর্ট আঞ্জেদিভেতে বেঁধে রেখেছি দু-জনকেই, দু-জনের ওপরেই ইনকুইজিশন চলছে', একটু দম নিয়ে নেন তিনি, 'আর অলরেডি এক প্ল্যাটুন সোলজার পাঠিয়েছি লোকটাকে ধরে আনতে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা জানতে পেরেছি, লোকটা কোর্টালিম যাচ্ছে। আশা করছি আজ রাতের মধ্যেই লোকটাকে ধরে কাল সকালে আপনার সামনে হাজির করতে পারব, রেভারেন্ডো।'

ভ্রূকুটিকুটিল চোখে খর্বকায় লোকটি পেছনে ফিরে তাকান, 'আপনি কী করে এত নিশ্চিত হচ্ছেন, সেইনর?'

দীর্ঘদেহী রাজপুরুষটি ধূর্ত হাসি হেসে বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি, যে লোকটা নিজের ছেলেকে পাগলের মতন ভালোবাসে। আজ না হয় কাল, ওকে ফিরতেই হত মনসেইনর।'

'আচ্ছা? খুব ভালোবাসে?' একটা নিষ্ঠুর ক্রূর হাসি খেলে যায় সেই প্রতাপশালী রাজপুরুষটির মুখে, 'কাল বিকেলে, তিন জনকেই বেঁধে আনবে, এই মন্দিরের সামনে। পুট দেম টু ডেথ, ডেথ বাই ফায়ার। এক্সেকিউশনের আদেশ কাল সকালেই আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন সেইনর।'

বলে, মন্দির থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে একটু থামেন তিনি, 'মেক শিওর দ্যাট হি সিইজ হিস সন বার্নিং। অলসো মেক ইট শিওর দ্যাট দ্য এন্টায়ার ভিলেজ ইস প্রেজেন্ট ডিউরিং দ্যাট। আমাদের একটা কড়া উদাহরণ রাখতে হবে। লোকে যেন বোঝে মহান করুণাময় যিশুর পথে না চলার শাস্তি কী।' বলে একটু থামেন তিনি, তারপর যোগ করেন, 'দে নিড টু পে আ প্রাইস, আ ভেরি হেভি প্রাইস, বাই ব্লাড অ্যান্ড ডেথ।'

এই বলে বৃষ্টির মধ্যেই ঘোড়ায় চড়ে চলে যেতে থাকেন মনসেইনর রেভারেন্ডো, গোয়ার ভাইকার জেনারেল, মিগুয়েল ভাজ।

২০১৬। জুলাই। আফগানিস্তান

স্কুলটা একটা উপত্যকার গা ঘেঁষেই। স্কুলের পিছনের চাতাল থেকে ঠিক বারো ফুট দূর থেকে পাহাড়ের খাদ শুরু। সেদিকে যাতে বাচ্চারা চলে না যায়, তারজন্য স্কুল বিল্ডিঙের দু-পাশ দিয়ে বেশ কিছুটা দূর অবধি

লম্বা চলে গেছে কাঁটাতারের ফেন্সিং। উপত্যকার ওপারে হিন্দুকুশ রেঞ্জের অপার্থিব নয়নাভিরাম দৃশ্য। দূর, অতি দূর অবধি ঢেউ খেলে গেছে পাহাড়ের সারি। মাথায় মাঝে মাঝে মেঘেদের আনাগোনা।

কিন্তু আজ এই অপার্থিব দৃশ্য দেখার সময় কারও নেই, একটা নিঃসীম বীভৎসতার আশঙ্কা যেন কালো ডানা মেলে নেমে আসতে চাইছে পুরো এলাকাটা জুড়ে।

স্কুলের সামনের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে দীর্ঘ উপবৃত্তাকার এলাকা কর্ডন করে রেখেছে আফগান ন্যাশনাল পুলিশ। খবর পেয়েই আর্মির টু হান্ড্রেড নাইন্থ কর্প্স এসে উপস্থিত। বড়ো বড়ো পুলিশ ভ্যান আর জিপ, আফগান আর্মির কমব্যাট ভেহিকল, সার্চ লাইটের আলো, স্থানীয় কিছু সংবাদদাতা সংস্থার ভ্যান, এর পিছনে বুকচাপড়ানো আফগান মায়েদের দল, আর হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তাদের সামলে রাখা আফগান বাবাদের ভিড়, রঙ্গ দেখতে আসা ইতর জনগণ, সব মিলিয়ে নরক গুলজার হয়ে রয়েছে জায়গাটা। খবর পেয়ে সি এন এন আর বিবিসির স্থানীয় সংবাদদাতারা বিশাল বিশাল ছাতাওয়ালা ভ্যান নিয়ে এসে হাজির। আস্তে আস্তে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে যাচ্ছে এই সর্বনাশা খবর। আতঙ্কে, ঘেন্নায়, শিউরে উঠে নিশ্বাস বন্ধ করে পৃথিবী অপেক্ষা করছে আরেকটা নৃশংস গণশিশুহত্যার জন্যে, বেসলান আর পেশওয়ারের পর। আরেকটা!!

পুলিশ আর আর্মির সঙ্গে জঙ্গিদের প্রাথমিক আলোচনা ব্যর্থ। তার প্রধান কারণ জঙ্গিরা নির্দিষ্ট করে কিছু চায় না। তারা শুধু দেখাতে চায় আল্লাহর সৈনিকরা কতটা অকুতোভয়, এবং পৃথিবীতে শরিয়ত কায়েম করার জন্যে তারা কত বৃহৎ আত্মত্যাগের নজির রাখতে পারে। স্থানীয় জিরগার এক বৃদ্ধ প্রধানকে ডেকে আনা হয়েছে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার জন্যে। তিনি পুলিশের মাইকে জঙ্গিদের কাছে উচ্চৈঃস্বরে আবেদন জানাচ্ছেন শান্তিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণের জন্যে, ইসলামে নরহত্যার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সুরা আর আয়াত পেশ করছেন, নাবালক শিশুদের প্রাণের জন্যে দোহাই পাড়ছেন, নিজেকে জিম্মি রাখবার প্রস্তাব দিচ্ছেন, বলছেন দরকার হলে তাঁকে ছিড়ে হাজার টুকরো করুক জঙ্গিরা, কিন্তু শিশুদের যেন কিছু না হয়...

উত্তরে মাঝে মাঝে শুধু কিছু বুলেট ছুটে এলে তৎক্ষণাৎ লোকজন নীচু হয়ে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ পরে পরে সেই একই নাটক। জিরগার বৃদ্ধ প্রধান হাউহাউ করে কাঁদছেন, আর শিশুদের জীবনের ভিক্ষা চাইছেন। পুলিশের কাজ আরও শক্ত হয়ে উঠছে বাবাদের জন্যে। জোয়ান আফগান রক্ত, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্যেরই সমান, সবারই দাবি দুটো বন্দুক দিলে তারাই এই শয়তানগুলোকে নিকেশ করে আসতে পারে। হায়রে বাবাদের মন!!!

ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলেন দোয়াহম ব্রিডমান, অর্থাৎ লেফট্যানেন্ট শের আবদুল বারি করিমি। অনেক্ষণ হল খবর পাঠানো হয়েছে ল্যামেগোতে, জার্মানদের মাধ্যমে। কোনো সাড়াশব্দ নেই কেন?

এমন সময় ওনার জিপ থেকে নিজস্ব সর বাজ, অর্থাৎ প্রাইভেট সার্জেন্ট দিলবার নজারি ওয়াকিটকিটা নিয়ে দৌড়ে আসে, সেটাকে কানে চেপে দূরে সরে যান কুশলী ও ধূর্ত লেফট্যানেন্টটি, বলখ প্রদেশের টু হান্ড্রেড নাইন্থ কর্প্সের প্রধান আবদুল করিমি। খানিকক্ষণ পরে মুখে একটা হালকা স্বস্তির ভাব ফুটে ওঠে, ‘ওভার অ্যান্ড আউট’ বলে সিগন্যাল কেটে দেন।

এইবার পালটা লড়াই শুরু।

দ্রুত উনি আর্মি ও পুলিশের কাছে এগিয়ে আসেন, বলেন সামনের দিকটায় আরও অ্যাকটিভিটি বাড়াতে। নেগোশিয়েশন চালিয়ে যেতে বলেন আরও জোরদার। ইতিমধ্যে মাজার-ই-শরিফ আর কুন্দুজের দুই সম্মানীয় বৃদ্ধ ওলেমারা এসে হাজির। তাদেরও হাতে মাইক দিয়ে আরও কিছু সার্চ লাইট জ্বেলে দেওয়া হল। ইতিমধ্যেই বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে জায়গাটা।

স্কুলের সামনের দিকেই ওদের টেনে আনতে হবে। যাতে পেছন দিকটা ফাঁকা থাকে!

এদিকে স্কুলের পিছন দিকের উপত্যকা পাহাড়ের গা ঘেঁষে, স্পেশাল হারনেস বেঁধে টিকটিকির ক্ষিপ্রতায় পাশাপাশি সরে সরে স্কুলের পেছন দিকে পাহাড়ের গায়ে জড়ো হচ্ছে তেরো জন রেঞ্জার্স, যারা প্রত্যেকে

ইউ এস-এর ফোর্ট কারসন, কলোরাডোর স্পেশাল ফোর্সেস মাউন্টেন অপারেশনস স্কুল থেকে বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত। চৌকো চোয়াল শক্ত, ভাবলেশহীন মুখ। প্রত্যেকের পিঠে ঝুলছে পঁচিশ কিলোর অপারেশনস লোড।

প্রত্যেকের কাছে আছে হেকলার অ্যান্ড কোখের দুটো করে হ্যান্ডগান, একটা করে উজি সাবমেশিনগান। মেইন কমব্যাট ইন্সট্রুমেন্ট যদিও সিগ সয়েরের এসজি ৫৪৩ অ্যাসল্ট রাইফেল। এর সবকটাতেই অটোমেটিক সাইলেন্সার লাগানো। পর্যাপ্ত অ্যামুনিশনস পিঠে ও টাইট ব্ল্যাক ইউনিফর্মের বিভিন্ন খাঁজে। আর প্রত্যেকের দুই হাঁটুর কাছে লুকিয়ে আছে দুটি করে গ্লকা বি-ওয়ান ওয়ার নাইফ। শুধু এই ওয়ার নাইফ দিয়ে এই তেরো জন রেঞ্জার্স হ্যান্ড টু হ্যান্ড ক্লোজ লড়াইতে কমসেকম পঞ্চাশ থেকে সত্তর জনের মহড়া নিতে পারে।

সারা মুখ কালো কাপড়ে জড়ানো, শুধু চোখ আর নাক ছাড়া।

সবাই কাছাকাছি পৌঁছতেই মার্টিনহো থুতনির কাছে নেমে আসা সরু স্যাটকমের এলপিআই নেভিগেশনে আদেশ দিলেন ‘মুভ আপ’।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে যেন তেরোটা মাকড়সাই উঠে এল স্কুলের পিছনে ছোট্ট চাতালটায়।

১৫৬০। অগাস্ট। গোয়া

ছোটো নৌকোটা ঘাটে এসে থামতেই একটা মৃদু ধাক্কায় উঠে পরলেন ত্রিলোচন। নৌকো থেকে লাফিয়ে হাঁটুজলে নেমে একটা গাছের শিকড়ের সঙ্গে বাঁধে বিঘ্ননাশ। একটা তক্তা এনে পেতে দেয় নৌকো থেকে ঘাট অবধি, যাতে ঠাকুর নির্বিঘ্নে নেমে আসতে পারেন। ঈষৎ স্খলিত পায়ে সেই তক্তা বেয়ে নেমে আসেন ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণী। কোমরে হাতে দিয়ে দেখে নেন জিনিসটা ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর আশীর্বাদ করেন বিঘ্ননাশকে। মাথা নীচু করে সেই আশীর্বাদ নেয় হতভাগ্য ছেলেটি, আর তারপর ফুঁপিয়ে ওঠে, ‘এই শয়তানগুলোর হাত থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই জ্যেঠঠাকুর?’

প্রশ্নটা তিরের মতন বুকে এসে বেঁধে ত্রিলোচনের। এই বিঘ্ননাশ গায়তোণ্ডেকে ছোটোবেলা থেকে দেখছেন উনি। বিঘ্ননাশের বাবা দার্শিক ছিলেন ত্রিলোচনের বিশেষ প্রিয়পাত্র। তাঁর সামনেই হেসে-খেলে বড়ো হল ছেলে, বিয়ে করল পাশের পালিগাঁওয়ের বাদন্য মালশের মেয়ে জ্যোতিকে। আহা, জোড়ায় জোড়ায় যেদিন দু-জনে এসেছিল রুদ্রভৈরব মন্দিরে, প্রাণভরে ওদের আশীর্বাদ করেছিলেন তিনি।

কিন্তু তার বছর দশেক পরে ভিনদেশি যবনদের উৎপাত যখন আছড়ে পড়ল এই গোয়াপুরি সহ সমগ্র কোঙ্কণ অঞ্চলে, তার প্রথম ঝটকাটা যাদের ওপর দিয়ে গেল, তাদের একজন এই গাইতোণ্ডে পরিবার। বিঘ্ননাশ সৈনিক পুরুষ, আদিল শাহি সেনাদলে ছিল, তার ওপর তার রক্তও কিঞ্চিৎ বেশি গরম। বাজারে এক যবন সৈনিকের সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি হওয়াতে একদিন তারা দল বেঁধে বিঘ্ননাশকে ধরতে আসে। ছোকরা সেদিন কাজে অন্যত্র গেছিল। সেই যবন সৈনিকের দল বিঘ্ননাশকে না পেয়ে তার বাড়িঘরে আগুন দিয়ে দেয়, জোর করে ধরে নিয়ে যায় জ্যোতিকে। চিৎপাবন ব্রাহ্মণের কুলবধূকে বিদেশি যবন সৈন্য প্রকাশ্য রাস্তায় অর্ধউলঙ্গ করে চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, খুব সম্ভবত এই দৃশ্য দেখেই দার্শিক আর তার বউ লজ্জায়, ঘেন্নায় আতঙ্কে মারা যায়, বা হয়তো আত্মহত্যাই করে, সঠিক বলা যায় না। তাদের মরদেহ দুটি সেই ঘরের সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে অবশ্য বেশি দেরি হয়নি।

বিঘ্ননাশ ক্রোধে উন্মাদ হয়ে একটা খোলা তলোয়ার হাতে সেদিনই ছুটে যাচ্ছিল প্রতিশোধ নিতে, তাকে আটকান ত্রিলোচনই। নইলে বন্ধুপুত্রের সেদিনই ইহলীলা সাঙ্গ হত। সেই থেকে গোয়াপুরির আরেক প্রান্তে সঙ্গোপনে একে লুকিয়ে রেখেছেন ত্রিলোচন, এর কাজই হচ্ছে স্থানীয় তৃণমূল স্তরে ছেলেপিলেদের সংগঠিত করা এই বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে। ত্রিলোচনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোকেদের মধ্যে প্রথমেই থাকবে এই অগ্নিবর্ষী যুবা।

প্রিয় অনুচরের মাথায় হাত রাখেন ত্রিলোচন, নিজের হাতটাও সামান্য কেঁপে উঠল কি? ফিসফিস করে বলেন, 'দিন বদলাবে বিঘ্ননাশ, অত্যাচারীর শাসন কখনো একটানা চলতে পারে না। স্বয়ং বেতাল মহারাজ সাক্ষী এই অনাচারের, তিনি সব দেখছেন, সব শুনছেন, তাঁর দরবারে পাপের শাস্তি ভয়াবহ মৃত্যু। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও বিঘ্ননাশ, আবার দেখা হবে।'

এই বলে ঘন অন্ধকারের মধ্যেই পা ফেলেন ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণী। আর দু-ক্রোশ দূরেই কুশস্থলী, ঠিকঠাক হাঁটলে আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া উচিত। ভোরের আলো ফোটার আগেভাগেই পৌঁছতে হবে, আর তারপর কালভৈরব মন্দিরে... নাহ, অনেক কাজ বাকি। দ্রুত হাঁটা লাগান তিনি।

বেশি দূর অবধি অবশ্য যেতে হয় না। আধঘন্টাটাক হাঁটার পরেই রাস্তার পাশে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে ঝোপের আড়ালে আঁধারে মিশে গিয়েছিলেন ত্রিলোচন। কিছুক্ষণ বাদেই মশাল জ্বালিয়ে পুরো এলাকাতে খোঁজ করা শুরু করে দেয় একগাদা যবন সৈন্য। ঝোপের আড়াল থেকে বলির পাঁঠার মতন কাঁপতে থাকা ত্রিলোচনকে খুঁজে বার করতে তাদের কোনই অসুবিধা হয় না। এবং ত্রিলোচন সভয়ে দেখেন উনি একা নন, ধরা পড়েছে বিঘ্ননাশও, এবং তার দু-হাত বেঁধে ঘোড়ার সঙ্গে হাঁটিয়ে আনা হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে যে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তার ওপরে একটা ঝড় বয়ে গেছে, বাঁ-চোখের নীচে কালশিটে, ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, চোখে সব কিছু গুলিয়ে যাওয়া উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। রাতের অন্ধকারে ঝিল্লিমুখর সেই মধ্যরাত্রে যেন এক ঘটতে চলা অশুভ নাটকের মুখ্য চরিত্র হিসেবেই বৃত্তাকারে সাজানো সেই সৈন্যদলের মাঝে দাঁড় করানো হয় ত্রিলোচনকে, সৈন্যদলের অধিপতি লালমুখো বিশালদেহী মানুষটি সামনে এসে ভাঙা ভাঙা কোঙ্কণি ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'এই কালা নেংটি ইঁদুরের বাচ্চা, এই জন্তুটাকে চিনিস?'

সর্বজনশ্রদ্ধেয় বেতালসিদ্ধপুরুষ ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণীকে সমগ্র কোঙ্কণে কেউ এই ভাষায় সম্বোধন করতে পারে, এ ওঁর স্বপ্নেরও অগোচর। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন নীচু হওয়া মাথাটা সামান্য উঁচু করে লাল চোখ মেলে এই যবন সেনাপতিকে দেখছে বিঘ্ননাশ, ঠোঁট থেকে রক্তমেশা লাল গড়িয়ে পড়ল খানিকটা। ভয় পেলেন ত্রিলোচন, নিজের জন্যে না, বিঘ্ননাশের জন্যে। বড়ো মাথাগরম ছেলে, খণ্ডমুহূর্তে প্রলয় বাঁধিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এখন মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার, একদম ঠান্ডা রাখা দরকার। অকম্পিত স্বরে ত্রিলোচন বললেন, 'না চিনি না।' ভারী হাতের একটা থাপ্পড় এসে গালে পড়তেই চোখে অন্ধকার দেখলেন তিনি, হিংস্র শ্বাপদের মতোই গর্জন ভেসে এল, 'একদম মিথ্যা কথা বলবি না নোংরা হিন্দু। এই জন্তুটা একটু আগে তোকে নৌকো করে পৌঁছে দেয়নি?'

অতি কষ্টে চোখ দুটো খুললেন ত্রিলোচন, রাগে, অপমানে মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ক্রোধ সংবরণ করলেন তিনি, শান্তি, শান্তি, শান্তি, তিন বার বিড়বিড় করলেন। তারপর মাথা তুলে দৃপ্ত অথচ মৃদু স্বরে বললেন, 'বৃথাই গায়ে হাত তুলছ বিদেশি। আমি একে চিনি না। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অন্য গাঁয়ে বেদপাঠের আমন্ত্রণে যাচ্ছি। অন্যায় কাজ করা তোমাদের মানায় না, হিন্দুদের শাস্ত্রকর্মে বাধা দিও না।' শব্দ করে ওঁর মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল লোকটা, ঘেন্নায় কুঁকড়ে গেলেন উনি, শিব শিব উচ্চারণ করে শিউড়ে উঠলেন। তারপর চোখ খুলে সেই বিদেশি হানাদারকে কিছু বলার আগে চোখ গেল বিঘ্ননাশের দিকে, আর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। খেপা বাঘের মতোই ফুলে উঠেছে বিঘ্ননাশ গাইতোণ্ডে। ঘাড়টা সামান্য উঁচু করে তীব্র লাল চোখ মেলে সে এক বার এই বিদেশি সেনাধ্যক্ষকে দেখছে, আরেক বার চারিদিকের সৈন্য সমাবেশকে। আরেক বার ভয় পেলেন ত্রিলোচন, ছেলেটা উত্তেজনায় কিছু করে না বসে। আদিল শাহি সৈন্যদলে একটা ছোটোখাটো দলের সর্দার ছিল বিঘ্ননাশ। চিৎপাবন ব্রাহ্মণ হলে কী হবে, সাহসে, শক্তিতে আর দৈহিক ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠতম ক্ষত্রিয় সে, দুর্জয় সাহস এই যুবকের বুকে, আর তলোয়ার চালানোয় তো সে সাক্ষাৎ সিদ্ধপুরুষ।

এত কিছু খেয়াল করেনি সেই বিদেশি। একটানে তলোয়ারটা খুলে তার ডগাটা ত্রিলোচনের বুকে চেপে ধরে, একটানে ছিঁড়ে নেয় উত্তমাঙ্গের উত্তরীয়টি, তারপর ব্যঙ্গের হাসি হাসতে হাসতে খেলাচ্ছলেই সামান্য

চালিয়ে দেয় তলোয়ারটা, ফিনকি দিয়ে সামান্য রক্ত বেরিয়ে আসে দক্ষিণ কোঙ্কণের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজনমান্য পণ্ডিত ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণীর বুক থেকে। একটা অস্ফুট আর্তনাদই কি করে উঠলেন তিনি? আর সেটাই বোধ হয় কাল হল। ঘন গম্ভীর গলায় একটা ধমক ভেসে এল পেছন থেকে, 'নোংরা বিদেশি কুত্তা, দূরে সরে দাঁড়া। তোর সাহস হয় কী করে ওঁর অঙ্গস্পর্শ করার? তোর কী জিজ্ঞাসা করার আছে আমাকে কর। সাহস থাকে তো হাত দুটো খুলে একটা তলোয়ার দে না, তোদের কুকুরের মতো লাথি মারতে মারতে কোপাতে কোপাতে দেশের বাইরে বার করে দিই...'

ধীরেসুস্থে সেদিকে ফেরে সেই বিশালদেহী যবন সেনাপতি, ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'এই তো, পোষা কুত্তার মুখে বুলি ফুটেছে দেখছি...' পাশ থেকে আরও এক যবন সৈন্য একটা নোংরা ফুট কাটে, ভাঙা কোঙ্কণিতেই, 'খুব তেজ দেখছি ছোকরার। তুই সেই হিন্দু জানোয়ারটা না, যার বউকে তুলে এনেছিলাম আর বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছিলাম? তাই ভাবি, কবুতরি বিছানায় এত চেল্লায় কেন, এমন জোয়ান কবুতরের জুড়িদার বলেই না...'

সহসা মহাকালসর্পের মতোই ফণা তুলে দাঁড়ায় সেই মারাঠি যুবক, হিসহিস আওয়াজ করে বলে, 'হাত দুটো খুলে দে না রে বেজন্মার বাচ্চা, তোদের সিধে নরকের রাস্তাটা দেখিয়ে দিই। হারামজাদারা মেয়েদের আর নিষ্পাপ বৃদ্ধদের ওপরেই যত বীরত্ব দেখাতে পারিস দেখছি। কীসের দুধ খেয়ে বড়ো হয়েছিস রে নোংরা কীটের দল, তোদের মায়ের, না জংলি শুয়োরদের?'

হেলেদুলে ধীরেসুস্থে বিঘ্ননাশের দিকে হেঁটে যেতে যেতে একটা কুৎসিত হাসি ভেসে ওঠে সেনাধ্যক্ষকের মুখে, 'শাব্বাস, এমনই তো চাই। যখন তোর বউকে বিছানায় শুইয়ে ভোগ করছিলাম, সেও এরকমই তেজ দেখাচ্ছিল বটে, তবে কিনা সে মাগির গুমোর ভাঙতে বেশ মজাই লেগেছিল। অবশ্য পুরো পল্টনের প্রসাদ হওয়ার পর বেশ্যা মাগিটার অত তেজ ছিল না। শ-খানেকের ভোগ হওয়ার পরেই তো পটল তুললো শালি। আহা, এখন ভাবি অমন চাম্পি মাল বাঁচিয়ে রাখলেও হত, সময়ে সময়ে আমাদের পালা করে সেবা করতে পারত। হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়েগুলো বড়ো নরমসরম...আহা... বেশ্যাগুলো বিছানা গরম করতেও...'

এরপর আর সরেনি সেই কুৎসিত জিহ্বা। বোধ হয় অতি উৎসাহিত হয়েই এক জন সৈন্য ঘোড়ার মাথার কাছে সরে আসে এই সরস আলোচনা শুনতে, যে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল বিঘ্ননাশ গাইতোণ্ডেকে। মুহূর্ত, শুধু একটিমাত্র অসতর্ক মুহূর্ত, দক্ষ তলোয়ারবাজ বিঘ্ননাশ সামান্য ডান দিক ঝুঁকে, দু-হাত বাঁধা অবস্থাতেই সেই অতি উৎসাহী বিদেশি সৈনিকের কোষ থেকে বার করে আনে দীর্ঘ তলোয়ারটি, আর সেই একই ভরবেগের সঙ্গে সমস্ত শরীর ডান দিক থেকে বাঁ-দিকে চালিত করে তরবারিটি গেঁথে দেয় বিদেশি সেনাপতিটির গলা বরাবর। ঘটনাটা ঘটে যায় চকিতের মধ্যে, কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই। অত্যন্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের গলার অর্ধেকটা অবধি গাঁথা তলোয়ারটা দেখতে দেখতে দুম করে মাটিতে পড়ে যায় সেই বিশালদেহী মানুষটি, আর সঙ্গেসঙ্গে একটা বন্দুকের আওয়াজ ভেসে আসে, মাথার অর্ধেকটা উড়ে যায় বিঘ্ননাশ গাইতোণ্ডের। রক্তে, ঘিলুতে, দীর্ণ খুলির ভগ্নাংশে আর টুকরো নরমাংসে ত্রিলোচনের সর্বাঙ্গ ভরে যায়, পুরো দৃশ্যটা এক ভয়ংকরতম অলৌকিক নারকীয়তা নিয়ে তাঁর চৈতন্যে আঘাত করে।

তিনি আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান।

২০১৬। জুলাই। আফগানিস্তান

প্রধান সমস্যাটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোরে ওঠা, সেটা স্কুলের ম্যাপ দেখামাত্র বুঝলেন মার্টিনহো। ইতিমধ্যে ছয় ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি পাতলা ভিজিকম ডিভাইসটা খুলে লোকেশন দেখে নিয়েছেন তিনি ও তাঁর বারো জন খুনে কম্যান্ডো। জিনিসটা স্পেশাল ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক কোনো নতুন মেটেরিয়ালে তৈরি, একটা পাতলা প্যাডের মতন, যেটা বাঁ-বাহুতে জড়িয়ে রাখা যায়, প্রয়োজনে খুলে স্লেটের মতন আকারেও নিয়ে আসা যায়।

ল্যামেগো থেকে এর মধ্যেই ইউ এস-এর ল্যাংলেতে বার্তা পাঠানো হয়ে গেছে। তারই ফলাফল হিসেবে কাছাকাছির মধ্যে থাকা দুটি ড্রোন উড়ে এসেছে ওঁদের সাহায্যার্থে। গ্রাউন্ড লেভেলে কেউ নেই। ওরা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে গেছে ফার্স্ট ফ্লোরে। পেছন দিকে একটা দরজা আছে বটে, কিন্তু তার ওধারে যে সিঁড়িটা আছে, সেটা সোজা উঠে গেছে ফার্স্ট ফ্লোরে এবং তার সামনে অবশ্যই যে এক জন গার্ড আছে সেটা অনুমান করার জন্যে কোনো পুরস্কার নেই।

প্রথমে পরিকল্পনাটা মনে মনে ছকে নিলেন মার্টিনহো। একটু আগে লেফটেন্যান্ট আবদুল করিমির কোডেড মেসেজ পেয়েছেন তিনি, টেররিস্টদের অ্যাটেনশন ড্র করার জন্যে স্কুলের সামনের দিকে মহড়া চলছে খুব। সময় কম, সাত মিনিট কেটে গেছে অলরেডি। ওপরে উঠবে কী করে রেঞ্জার্সরা? কোনো টেকনিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না, বিন্দুমাত্র আওয়াজ করা মানে শুধু এদের নয়, শিশুদেরও ঝুঁকির মধ্যে ফেলা।

প্রত্যেক রেঞ্জার্স তাদের ব্যাগ থেকে একটা করে দেড় ফুট লম্বা পাইপ বার করল প্রথমে, সেগুলো পরস্পর জোড়া যায়। স্পেশাল মিলিটারি গ্রেড ফাইবারের তৈরি ঘাতসহ এবং নমনীয় এই পাইপগুলো বিভিন্ন কাজে লাগে, যেমন ব্লো পাইপ হিসেবে, অথবা অ্যাসল্ট রাইফেলের সামনে ফিট করে লং রেঞ্জ রাইফেল হিসেবে ব্যবহার করতে, অথবা শুধুমাত্র পোল বা লম্বা দণ্ড হিসেবে, এই যেমন এখন ব্যবহার করা হবে। ফটাফট তেরো পিস ফাইবার পাইপ জোড়া লাগিয়ে একটা লম্বা শক্তপোক্ত কিন্তু নমনীয় পোল তৈরি হয়ে যেতেই এক জন তার একপ্রান্ত দু-হাতে ডান দিকে কোমরের কাছে ধরে দেওয়ালের কাছে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। পোলের অন্য দিকটা দু-জন রেঞ্জার্স ধরে রইল। এরপর যেটা ঘটল সেটা স্রেফ ম্যাজিক। প্রথম রেঞ্জার্স পোলটাকে শক্ত করে ধরে খাড়া দেওয়ালে প্রথম পা রেখেই খুব দ্রুত দ্বিতীয় পা রাখল এবং পোলের অন্য প্রান্ত অন্য দুই রেঞ্জার্স চেপে ধরে কৌণিক ভাবে চাপ দিয়ে যেতে লাগল। প্রথম রেঞ্জার্স স্রেফ নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী সেই পোলটাকে ধরে সমতলে হাঁটার মতো করেই খাড়া দেওয়াল বেয়ে তরতর করে হেঁটে উঠে দোতলার বারান্দায় পৌঁছেই বারান্দার পাঁচিলের নীচে মাথা নীচু করে অদৃশ্য হয়ে গেল। লিখতে যতক্ষণ লাগল, তার অনেক কম সময়ে ঘটে গেল এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা, যেটা ঘটতে পনেরো থেকে কুড়ি সেকেন্ডের বেশি লাগেনি!

পরের তিন মিনিটের মধ্যে মার্টিনেজ সহ বারো জন রেঞ্জার্স, পৌঁছে গেল দোতলায়। এক জন রয়ে গেল নীচেই, ছায়ার সঙ্গে মিশে, সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মতন।

দোতলায় পৌঁছেই পরিস্থিতিটা সরেজমিনে বুঝে নিলেন মার্টিনেজ। বারান্দাটা দু-দিকে ছড়িয়ে গিয়ে বাঁক নিয়েছে সামনের দিকে। ভিজিকমে এক বার ম্যাপটা দেখে নিলেন মার্টিনেজ। এই বারান্দাটা পুরো স্কুলের ফার্স্ট ফ্লোরকে ঘিরে রেখেছে। সামনের দিকে একের-পর-এক ক্লাসরুম। আর যেখানে বারান্দাটা সামনের দিকে বাঁক নিয়েছে, সেদিক দিয়ে দুটো সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। তার মানে পেছনের দরজার সামনের সিঁড়িটা ল্যান্ডিং ফ্লোরে এসে মিশেছে। ওইখান থেকে দুটো সিঁড়ি সামনের প্রধান দরজার দিকে গিয়ে মিশেছে। আর মাঝের সিঁড়িটা এসেছে পেছনের দিকে। ঠিক এগারো সেকেন্ড লাগল বাকি এগারো জন রেঞ্জার্সকে বুঝিয়ে দিতে কী করতে হবে। নো সাউন্ড, নো গানশট। সেপারেট দেম আউট অ্যান্ড নিউট্রালাইজ।

ছ-জন বাঁ-দিকের পথ নিল, বাকি ছয় জন ডান দিকের।

মার্টিনেজ প্রথম বাঁকের কাছে পৌঁছে একটু থামলেন। স্কুলের সামনের দিকে প্রচুর আলো আর আওয়াজ, এ তিনি জানতেনই কেন আর কীসের জন্যে। কীভাবে যেন তারই একটা টুকরো আলোর রেখা মার্টিনেজের সামনে এসে পড়েছে। আর সেই আলো-আঁধারির সিল্যুয়েটে একটা মানুষের অর্ধেক ছায়ার ভগ্নাংশ এখন মিশে আছে তাঁর পায়ের কাছে। অর্থাৎ এই সরু বারান্দাপথে কেউ আছে পাহারারত। একটু নীচু হলেন মার্টিনেজ, তাঁর পেছনে দেওয়ালের দু-দিকে কুঁজো হয়ে পজিশন নিয়েছে বাকি পাঁচ জন রেঞ্জার্স, টানটান

ছিলার মতন ভঙ্গি, যেকোনো মুহূর্তে উড়ে গিয়ে প্রলয়কাণ্ড বাঁধাবার জন্যে দৃঢ়চিত্ত। নীচু হয়ে ডান পায়ের হাঁটুর ভাঁজের কাছে যে পকেটটা আছে সেখান থেকে মুঠো করে কী একটা বার করে আনলেন। হাত খুললে দেখা গেল মুঠোর মধ্যে বড়ো সাইজের গুবরেপোকার মতন কী একটা। মার্টিনেজ তালুটা খুলে প্রসারিত করে ওটার তলায় আঙুল দিয়ে একটা সুইচ অন করে হাতটা সামান্য উঁচু করে ধরলেন। সেই যান্ত্রিক কালো ভ্রমরটির মাথার কাছে আট হাজার আর পি এম রেটে ঘুরতে থাকা পাখাটি চালু হতেই সেটি হাতের তালু থেকে উড্ডীন হতে থাকে। এর টেকনিক্যাল নাম সোয়ার্মবটস, রেঞ্জার্সরা ডাকে হাই-মেমস নামে।

সঙ্গেসঙ্গে সবচেয়ে কাছাকাছি উড়তে থাকা মার্কিন ড্রোনটির অপারেটিং কন্ট্রোলের কাছে একটি কোডেড মেসেজ আসে, এবং ল্যাংলেতে বসে থাকা অপারেটরটি ডাবল লেয়ারড আলফানিউমেরিক কোডটি পাসওয়ার্ড হিসেবে এন্টার করে, যেটি তার কাছে ল্যামেগো থেকে আগেই চলে এসেছিল। মার্টিনেজের কানে এল পি আই নেভিগেশন বেয়ে নেমে এল শীতল কনফার্মেশন, 'ব্ল্যাকবার্ড আল্ফা টু, আন্ডার সেন্ট্রাল কমান্ড নাউ।' এইবার শূন্যে স্থির হয়ে থাকা যন্ত্রভ্রমরটি ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে উড়ে প্যাসেজের একদম ওপরে গিয়ে শেষের দিকে তার যন্ত্রমুখ নির্দেশ করে স্থির হল। আর সঙ্গেসঙ্গে দ্রুত বাঁ-হাত সামনে এনে ভিজিকমটা অন করলেন মার্টিনেজ। মার্কিন ড্রোনটির ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সিতে সেই যন্ত্রভ্রমরের যান্ত্রিক চোখ এবং তড়িতাহত নার্ভ থেকে একইসঙ্গে দুটি সিগন্যাল ভেসে আসে, ইনফ্রারেড ইরকন এবং থার্মাল ইমেজিং। শত সহস্র কিলোমিটার ওপরে ভেসে থাকা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের স্যামোস-এনলর-এফ নামের ইলেকট্রনিক রিকনিস্যান্স স্যাটেলাইটটি দুটো সিগন্যালকেই ডিজিটালি প্রসেস করে মুহূর্তের মধ্যে স্ট্রিমিং ভিডিয়োতে ভরে দেয় মার্টিনেজের হাতে ধরা ভিজিকমের স্ক্রিনটা।

দেখা গেল যে মাপা পদক্ষেপে, আফগানি পোশতু পোশাক পরা বিশাল একটি শরীর শ্বাপদের সতর্ক হিংস্রতায় আশেপাশে তাকাতে তাকাতে এদিকেই আসছে। হাতে কালান্তক কালাশনিকভ। কাঁধে আরও দুটি রাইফেল ঝুলছে, সারা শরীরে রয়েছে আরও বিভিন্ন অস্ত্রাদি, তার মধ্যে কিছু আধুনিক কিছু প্রাচীন। যেমন কোমরের বাঁ-দিক থেকে ঝুলছে পুলওয়ার, বিরাশি সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের আফগান তরবারি, যে আফগান নরঘাতক অস্ত্রটির দৌলতে ব্রিটিশ সিংহকে নাকানিচোবানি খাইয়ে দিয়েছিল এই তথাকথিত 'অর্ধসভ্য' পাহাড়ি পোশতু জনজাতি।

লোকটা প্রায় বাঁকের কাছে এসে পৌঁছেছে, মার্টিনেজ সামান্য পেছন ঘুরে দাঁতের ফাঁক দিয়ে একাক্ষরে ঠিক পেছনের রেঞ্জার্সটিকে কি যেন বললেন। সে ঠিক ক্রিকেট মাঠের উইকেটরক্ষকের ভঙ্গিতে দুটি হাতে দুটি হ্যান্ডগান নিয়ে উবু হয়ে বসল আর মার্টিনেজ এল পি আইয়ের নেভিগেশন সিস্টেমে হিসহিস করে উচ্চারণ করলেন শুধু একটি শব্দ, 'ব্লেজ'। মুহূর্তের মধ্যে সেই যন্ত্রভ্রমরের কপালের কাছ থেকে নির্গত হল এক তীব্র অগ্নিদীপ্ত আলোকরেখা, সিধে গিয়ে পড়ল সেই আফগান মুজাহিদিনের দুই চোখে। যত চৌকস যুদ্ধবাজ লোকই হোক না কেন, হঠাৎ করে ওরকম তীব্র আলো চোখে এসে পড়লে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ারই কথা, আর সেই মুহূর্তটারই অপেক্ষায় ছিলেন মার্টিনেজ, ভাঁজ করা ডান পা-টা বাড়িয়ে সাইলেন্সার লাগানো হ্যান্ডগানটা তুলে ঠিক গলা বরাবর পরপর চারটে ফায়ার করেন। মার্ক তেইশ হচ্ছে হেকলার অ্যান্ড কোখের সবচেয়ে সেরা হ্যান্ডগান। তার তিরিশ মিলিমিটারের চার চারটে বুলেটে গলা এফোঁড়ওফোঁড় করে দেওয়ার পরেও দাঁড়িয়ে থাকতে খুব কম লোককেই দেখা গেছে, বিশেষত যদি তার মধ্যে খান দুয়েক বুলেট ঘাড়ের দিকে প্রথম এবং দ্বিতীয় ভার্টিব্রার মধ্যের অংশটা ভেঙে দেয়। চোখে প্রচুর অবিশ্বাস আর মৃত্যুর আতঙ্ক নিয়ে বিশাল দেহটা মেঝের ওপর নেমে আসার আগেই মার্টিনেজ দু-হাত বাড়িয়ে তার পতন রোধ করলেন। তারপর মৃতদেহটি এদিকে সরিয়ে এনে এল পি আই-তে মেসেজ দিলেন মার্টিনেজ, 'ফিফটি থ্রি আলফা হ্যাশ। ওয়ান টার্গেট লিক্যুইডেটেড।' কয়েক সেকেন্ড বাদে সবার কানেই ভেসে আসে আরেকটা কণ্ঠস্বর, সেকেন্ড ছয় জনের দলের টিমলিড আদ্রিয়ানো জবাব দেয়, 'ট্যুয়েন্টি ট্যু ডেল্টা হ্যাশ, অ্যানাদার হিয়ার।' দুটি শয়তান নিকেশ। যন্ত্রভ্রমর উড়ে গেল সামনের দিকে। স্ক্রিনে ট্যাপ করে ভিজিকম অন করলেন মার্টিনেজ।

আস্তে আস্তে সামনের দিকের ছবিটা পরিষ্কার হয়ে আসে। দূর থেকে জ্বালিয়ে রাখা বিশাল সার্চলাইটের আলোতে স্কুলের সামনেটা আলো হয়ে আছে। সামনের বারান্দায় দাঁড়ানো দুই আফগান, স্থির এবং অকম্পিত। তাদের হাতে একটা করে কালাশনিকভ, কাঁধেও তাই আর কোমরে ঝুলছে পুলাওয়ার। এরাও খুব ভালো করেই জানে যে লড়াইয়ের সময় এইভাবে বীরের মতো বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত, এ প্রায় মৃত্যুকে সাদরে ডেকে নিয়ে আসার সমান। যে কোনো দক্ষ স্নাইপার এদের পেড়ে ফেলতে মিনিটখানেকের বেশি সময় নেবে না। কিন্তু ওরাও জানে যে এই মুহূর্তে ওদের দিকে বুলেট দূরে থাকুক, একটা ঢিল ছোঁড়ার সাহসও কারও নেই।

ওদের হাতেই এখন প্রায় এক-শো জন শিশুদের টুঁটি!

আস্তে আস্তে, নিঃশব্দ ঘাতকের মতোই সেই কালো যন্ত্রভ্রমর উড়ে গেল সামনের বারান্দার দিকে, এদিক থেকে ওদিকে। ভিজিকমে নজর বুলিয়ে নিলেন মার্টিনেজ। স্কুলের সমস্ত ক্লাসরুমের মুখ সামনের দিকে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে চারটে ক্লাসরুম, ওপরেও তাই। তার সামনে বারান্দা, যে বারান্দা সারা স্কুলকে ঘিরে রেখেছে বলয়ের মতন। পেছনের দিকটাই অরক্ষিত রেখেছে জঙ্গিরা, ওই খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে কেউ যে স্কুলের দোতলার বারান্দা অবধি উঠে আসতে পারে, একথা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তাদের। একমাত্র এয়ার ড্রপ ছাড়া উপায় নেই, আর সশব্দ হেলিকপ্টারের আওয়াজ কানে আসা মাত্র এক-একটি শিশু জবাই হবে, এ কথাটা খুব স্পষ্ট করেই বলে দেওয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে। সেই ক্ষুদ্র গুবরেপোকার আকারের যন্ত্রটি এপার থেকে ওপারে এক বার পাড়ি দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গে পুরো দৃশ্যটা বুঝতে পারলেন কর্নেল মার্টিনেজ ভাজ। মাঝের দুটি ক্লাসরুমের মাঝখান থেকে একটি সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। স্কুলের সমস্ত শিশুদের ওই মাঝের দুটি রুমেই পণবন্দি বানানো হয়েছে। দুটি রুমেই দু-জন করে লিডার গোছের লোক, তাদের ওপরেই যে অপারেশনের ভার, বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাদের মধ্যে এক জনের সামনে অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট ফোন। আফগান সরকারের সঙ্গে যাবতীয় দরাদরি সেই-ই করছে। সবার পরনে একটি বিশেষ ধরণের পোশাক, এবং তাই দেখেই মার্টিনেজের মনে হল যে এর পেছনে আফগানিস্তানের একটি প্রতিবেশী দেশের ভূমিকা থাকা আশ্চর্যের কিছু না।

আফগানিস্তান প্রাচীন কাল থেকেই তাজিক, পাশতুন, ওয়াজিরি, হাজারা, উজবেগ ইত্যাদি বেশ কিছু মধ্য এশীয় জনজাতির মিশ্রণস্থল। এদের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনা এতই প্রবল যে একমাত্র ধর্ম বাদ দিয়ে যে-যার দেশীয় সংস্কৃতি কঠোরভাবে মেনে চলে, একে যথাসাধ্য অন্যের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে। যে পোশাক সাধারণ আফগানি পুরুষ সচরাচর পরে তাকে বলে সালোয়ার-কামিজ, কিন্তু তারও রকমফের আছে। সাধারণ আফগানি পুরুষ যে সালোয়ার-কামিজ পরে তাকে বলে খেট পার্তুগ। ওপরের অংশকে বলে খেট, নীচেরটাকে বলে পার্তুগ। পাশতুনরা পরে পেরহান আর পাগড়ি। কিন্তু এরা যেটা পরে আছে সেটা উত্তর আফগানিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের এক অত্যন্ত ক্ষুদ্র জনজাতির পোশাক। এই জনজাতিটির উৎস প্রাচীনতম হিন্দু ধর্ম থেকে, এদের অধিকাংশ ধর্মীয় বিশ্বাস এখনও প্রোটো ইন্দো ইরানীয় ধর্মানুযায়ী যার পরের অংশ হচ্ছে বৈদিক হিন্দু ধর্ম। ধবধবে ফর্সা আর নীল চোখের মালিক এরা, অনেকের ধারণা এরাই আদিতম এরিয়ান বা আর্য। এদের গোষ্ঠীগত ধর্মকৃত্য দেখলে এরাই যে আদিতম হিন্দু সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না এদের ওপরে ষাট ও সত্তরের দশকে ইসলামিক জঙ্গিরা রাষ্ট্রীয় মদতে অকথ্য সন্ত্রাস চালিয়েছে, এমনকী এদের বাসস্থানকে কাফিরিস্থান বলত পাকিস্তানের ধর্মান্ধ জনগণ। উগ্র ইসলামিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এই বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে সদ্য এরা মুসলিম হয়েছে। তারপর যা হয়, নিজেকে সাচ্চা মুসলমান প্রমাণ করার তাগিদে, অত্যধিক ইমানি যোশে, এই কাণ্ড ঘটাতে নেমে পড়েছে তাদেরই একাংশ। হয়তো সেই ‘কাফিরিস্তান’-এর অপবাদ ঘোচাতেই ইসলামিক সন্ত্রাস কায়েম করার জন্যে এদের এই অত্যুৎসাহ। সাধারণত উত্তর পাকিস্তানের খায়বার-পাশতুন এলাকার চিত্রাল অঞ্চলেই এরা থাকে, এদের এলাকার শতাব্দীপ্রাচীন আরেকটি নাম আছে, নুরিস্তান! আপাতত এরাই উত্তর আফগানিস্তান আর

উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে সন্ত্রাসের উগ্রতম মুখ হিসেবে উঠে আসছে। যে পোশাক এরা পরে আছে, তাকে স্থানীয় ভাষায় বলে শোউক বা চোগা। এর থেকেই প্রমাণিত যে এই সন্ত্রাসের পেছনে পাকিস্তানের মদত থাকতে বাধ্য।

আর এই জনজাতির নাম হল কলাশ।

১৫৬০। অগাস্ট। গোয়া

অতি কষ্টে চোখ খুলেই আবার বন্ধ করে ফেললেন ত্রিলোচন। সমস্ত শরীরে তীব্র বিষের যন্ত্রণা। চোখটা খুলতে গিয়েই বুঝেছেন যে বাঁ-দিকের চোখটা বিশ্রীভাবে ফুলে আছে। ঘাড়ের কাছটা টাটিয়ে আছে, বোধ হয় পেছন থেকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে কেউ মেরেছিল। তবে সব কিছু ছাপিয়ে যেটা অসহনীয় হয়ে উঠছে সেটা হচ্ছে তেষ্টা, অসম্ভব তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে ত্রিলোচনের। প্রচণ্ড মেরেছে ওরা। বিঘ্ননাশ বেঁচে থাকলে যে অসহনীয় অত্যাচার নেমে আসত তার ওপর, বিঘ্ননাশকে না পেয়ে তারই কিছুটা ত্রিলোচনের ওপর দিয়েই গেছে কাল রাত থেকে। সারা গা যেন ব্যথার বিষে অসাড় হয়ে আছে। কানের পাশ থেকে গলা অবধি একটা ক্ষীণ তরলের ধারা শুকিয়ে এসেছে। ত্রিলোচন জানেন যে ওটা রক্ত। সারা গায়ে দগদগে কালশিটে, না দেখেই বুঝতে পারছেন ত্রিলোচন। চাবুক দিয়ে ওরা নির্মমভাবে পিটিয়েছে, গায়ে থুতু দিয়েছে, অশ্লীলতম কুবাক্য উচ্চারণ করেছে ওঁর পরিবারের মহিলাদের নিয়ে। লজ্জায়, ভয়ে, আতঙ্কে, ঘৃণায় সিঁটিয়ে গেছিলেন ত্রিলোচন, শরীরের ওপর দিয়ে যে ঝড়টা বয়ে যাচ্ছে, তার থেকেও বেশি অভিভূত করে ফেলেছিল অপমানটা। গায়ে হাত তোলা দূরের কথা, আজ অবধি বেতালসিদ্ধ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণীর সামনে কেউ মাথা তুলে কথা অবধি বলত না, এতটাই সম্মানের অধিকারী ছিলেন তিনি। আর আজ! হা ঈশ্বর, গতজন্মের কোন পাপে আজ শাস্তি পেতে হচ্ছে তাঁকে?

তবে যেটা একবারে দিশেহারা করে দিয়েছিল ত্রিলোচনকে সেটা হচ্ছে মহাশক্তিখণ্ডটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। তাঁর কোমরের গেঁজেতে হাত দিয়ে খুব সহজেই ওটা হাতে পেয়ে যায় সৈন্যরা, আর ওই সময়েই, একমাত্র ওই সময়েই তীব্র রোষে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন তিনি, বলেছিলেন, 'আরে মূর্খের দল, হাত দিস না, একদম হাত দিস না ওতে, সর্বনাশ হবে যদি ওই মহাবস্তু অপবিত্র করেছিস তো, নিজের ভালো চাস তো...' আর বলতে পারেননি তিনি, একটা থাপ্পড় আছড়ে পরেছিল তাঁর গালে। আর তারপরেই নেমে এল হিংস্র আক্রমণ। যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল অসহায় মানুষটির ওপর। চড়, থাপ্পড়, লাথির পর শুরু হল চাবুক আর লাঠি দিয়ে পেটানো, লোকে বোধ হয় নিরীহ জন্তুকেও এমন প্রহার করে না। তারই মধ্যে কে একজন পেছন থেকে এসে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মাথার পেছনে সজোরে আঘাত করতেই জ্ঞান হারান ত্রিলোচন।

আহ, বড়ো কষ্ট গায়ে। একটু নড়তে গিয়ে কঁকিয়ে উঠলেন তিনি, আর তখনই খেয়াল করলেন যে তিনি নড়তে পারছেন না, একটা খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে তাঁকে। মাথাটা কাজ করছিল না ওঁর, তবুও বহুকষ্টে চোখ তুলে চাইলেন, আর মূক অপমানে আর বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে গেলেন। একটা গোরুর গাড়িতে বসে আছেন উনি, গাড়ির মাঝখানে একটি দণ্ড দৃঢ়ভাবে পাটাতনের মধ্যে প্রোথিত। আর তার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ওঁকে। ধীরে ধীরে যে গ্রামপথ দিয়ে, যেসব সহস্র স্তব্ধ চোখের সামনে দিয়ে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই পথ, সেই গ্রাম, সেইসব স্তব্ধবাক চোখ, এ সবই উনি আশৈশব চেনেন, বড়ো নিবিড় ভাবে চেনেন।

আমোনা, ওঁর ছেলেবেলার খেলার মাঠ, যৌবনের প্রেম, প্রৌঢ়ত্বের সাধনভূমি, বড়ো প্রেমের আমোনা গ্রামেই আনা হয়েছে ওঁকে। যে গ্রামে উনি সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করতেন, যেখানে ব্রাহ্মণরাও তাঁর রৌদ্রলাঞ্ছিত ছায়ায় শ্রদ্ধায় পা ফেলতেন না, যেখানে গ্রামের পশুরাও তাঁকে দেখে ভালোবেসে মাথা

নীচু করে গা ঘষতে এগিয়ে আসত, সেই আমোনা গ্রামেই তাঁকে আজ সাধারণ চোর ডাকাতের মতন বেঁধে আনা হয়েছে, বেঁধে আনা হয়েছে যেভাবে বনের পশুকে সর্বসমক্ষে পিটিয়ে মারার জন্যে আনা হয়। অর্ধনগ্ন, রক্তাক্ত, সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত এই ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণীকে দেখতে হবে, একথা বোধ হয় আমোনা গ্রাম নিজেও স্বপ্নে ভাবেনি।

কিন্তু আজ তা সত্যি, বড়ো উগ্র, নগ্ন, জান্তব সত্যি! সারা আমোনা গ্রামের লোক আজ বিস্ফারিত চোখে দেখছে যে মানুষটিকে তারা শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় প্রায় দেবতার সম্মান দিয়েছিল, আজ তাকে এই যবন পাপমূর্তিরা প্রায় উলঙ্গ করে বেঁধে নিয়ে আসছে, যেভাবে কার্তিকের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে আমোনার বেতালমূর্তির সামনে বলির জন্যে টেনে নিয়ে আসা হয় অনিচ্ছুক মোষ ও পাঁঠাদের! আজ সমস্ত আমোনা গ্রাম চোখে অনেক কান্না জমিয়ে, অনেকটা ভয় আর আতঙ্ক বুকে নিয়ে, এই যবন শাসকদের আদেশে সাক্ষী হতে এসেছে এক মহা ক্রূর কর্মের।

রাস্তায় যেতে যেতেই এক বার যেন গাড়িটা কার আদেশে থেমে দাঁড়াল, বহুকষ্টে চোখ খুললেন ত্রিলোচন। আর সেই চোখ বন্ধ হল না তাঁর, বুকের মধ্যে সহস্র কাঁটা ফোটার যন্ত্রণা নিয়ে তিনি দেখতেই থাকলেন! তাঁর বাড়ি, তাঁর আশৈশবের বাড়ির সামনে থামতে বলা হয়েছে সেই গো-শকটটিকে। বাড়ি বলে বোধ হয় ভুল বলা হল, বাড়ি বলে যাকে চিনতেন, গাড়ি থামানো হয়েছে সেই ধ্বংসস্তূপটির সামনে। চারিদিকে শুধু আসান গাছের মধ্যে বয়ে যাওয়া হাওয়ার শব্দ, গোরুর গলায় বাঁধা ঘন্টির টুং টুং আওয়াজ আর কোনো কোনো মেয়েলি ফুঁপিয়ে ওঠা, এ ছাড়া এই বিশ্বচরাচরে যেন আর কোনো শব্দ নেই। রক্তক্ষরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণী, তাকিয়েই থাকলেন। তাঁর সেই বড়ো সাধের, বড়ো ভালোবাসার বাড়িটি আজ জ্বলে পুড়ে ছাই। শুধুমাত্র বেড়াটা আর ইতিউতি পড়ে থাকা বড়ো চেনা কিছু আধপোড়া গৃহস্থালীর সামগ্রী ছড়িয়ে আছে। যে বারান্দায় শিশু বয়েসে গাছের ছায়ার নাচন দেখে খিলখিলিয়ে হেসেছেন ত্রিলোচন, তার চিহ্নমাত্র নেই। যে শয্যাগারে নববধূর মুখচুম্বন করে জীবন ধন্য করেছিলেন তিনি, আজ সেই ঘর পোড়া বিধবার মতন দগদগে জ্বলনক্ষত নিয়ে পড়ে আছে। চারিপাশের সেই বাগান, যা তাঁর বাবা সযত্নে তৈরি করেছিলেন, আজ সেখানেই শ্মশানের পোড়া অভিশাপের স্তব্ধতা!

শুধু স্তব্ধতা? শুধুই এই বোধের অতীত জাগতিক স্তব্ধতা? নাকি আরও কিছু নারকীয়তা মিশে ছিল সেই ক্ষণিকের সর্বনাশা দৃশ্যটির মধ্যে?

বোবা চোখ নিয়ে ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণী দেখলেন যে সেই পোড়া ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দু-দিকে দুটি মোটা দণ্ড প্রোথিত, প্রতিটি দণ্ড আসান গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি। আর সেই দুটি গুঁড়িতে সম্পূর্ণভাবে বাঁধা অবস্থায় লটকে আছে দুটি পোড়া মানব শরীর। তাদের প্রায় বুক অবধি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া কাঠের স্তূপ।

জীবন্ত দাহ করা হয়েছে ওঁদের!!

কেউ বলে না দিলেও ত্রিলোচনের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা বলে দিচ্ছিল এই দুটি পোড়া শরীর কার!

ওঁর মা আর বাবার!

অজ্ঞানই হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি, মনে হচ্ছিল যেন তাঁর হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে এসে বোবা কান্নায় আটকে আছে, মনে হচ্ছিল যেন তাঁর মস্তিষ্ক শতসহস্র টুকরোয় ভেঙে ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে কোনো কালো নিয়তির দিকে। তবে এর পরেও যেন এক দৈব ইশারায় তাঁর সেই ঘোলাটে দৃষ্টি চারিয়ে যায় আরও সামনের দিকে।

তাঁর বাড়ির থেকে কয়েক-শো গজ দূরেই সেই বেতালমন্দির। আজ সেই রাস্তার দু-ধারে কালো কালো ছায়া। না ছায়া নয়, চোখটা এক বার বুজেই খুললেন ত্রিলোচন, আমোনা আর আশেপাশের সমস্ত গ্রাম ঝেঁটিয়ে আনা হয়েছে যেন এক নিষ্ঠুর তামাশার সাক্ষী হতে। আর কিছু দূরে দূরে সেই মোটা আসান গাছের গুঁড়ি পোঁতা আছে কম করে ছয় থেকে সাতটি। আর প্রতিটির সঙ্গে লটকে আছে একটি করে হতভাগ্যের পোড়া মৃতদেহ! কারা ওরা? তাঁর নিয়তি আর কোন কোন হতভাগ্যের জীবনে নামিয়ে এনেছে কালরাত্রি?

কার একটা চাপা গলার আদেশ শোনা গেল, টুংটাং আওয়াজ করতে করতে এগিয়ে চললো গোরুর গাড়িটি। তার সঙ্গে মিশেছে সেই গাড়ির চাকার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ, আর জনতা ক্রমে বধির বিস্ময়ে সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে সামনে, আর সেই নারকীয় দৃশ্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ত্রিলোচনের চোখের সামনে।

বাঁ-দিকে এটা কার শরীর? কে ও? যদিও খুব দ্রুতই উত্তর পেয়ে গেলেন তিনি। পুড়ে কাঠ হয়ে যাওয়া শরীরের নীচে বোবা দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে এক উন্মাদিনী, তাকে দেখামাত্র বুঝলেন ত্রিলোচন, এ পুড়ে যাওয়া শরীর কার!

বিরোচন তাম্বে। তাঁর একনিষ্ঠ সেবকদের মধ্যে একজন।

পরের কাষ্ঠদণ্ডটি, চিনতে কষ্ট হল না তাঁর, এই চত্বরে ওই পাহাড়ের মতন বিশাল শরীর আর একজনেরই হতে পারে, প্রভঞ্জন মহাজন! দুর্ধর্ষ এই মারাঠি বীর ফৌজে ইস্তফা দিয়ে এসে চাষাবাদে মন দিয়েছিল, আর ত্রিলোচন গ্রামান্তরে গেলে এই হত তাঁর দেহরক্ষী। একবার এক বন্য নেকড়েকে স্রেফ লেজ ধরে আছড়ে আছড়ে আর গলা টিপে মেরেছিল প্রভঞ্জন। তাকে এরা ধরতে পারল কী করে?

মৃতদেহটা কাছে আসতেই বুঝতে পারলেন তিনি, ওই পোড়া বিশাল শরীরে অজস্র গভীর ক্ষত। মানে অনেকে ঘিরে ধরে বল্লম বা তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে প্রভঞ্জনকে। এই প্রথম দুঃখ হল ত্রিলোচনের, এই প্রথম কোনো কষ্ট অনুভব করলেন তিনি। গলার কাছটা একদলা ব্যাথায় মুচড়ে উঠল তাঁর। শুধুমাত্র তাঁর জন্যে না জানি আর কত নিরপরাধের ঘর আজ শ্মশান হয়ে গেছে, কত অভাগীর সুখের সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এই নিষ্ঠুর যবনের অত্যাচারে। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল তাঁর তিরতির করে। এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে চাইল বসে যাওয়া চোখের কোটর থেকে।

আর ঠিক তখুনি পিছনে গাড়ির ওপরে উঠে এল তিন জন এদেশীয় সেপাই। পাটাতনের মধ্যে যে মোটা খুঁটিটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল ত্রিলোচনকে, তার আশেপাশে গাদাগাদা শুকনো কাঠ এনে জড়ো করতে লাগল। শেষ হলে এইবার তিন জনে মিলে তাঁর বাহুমূল ধরে হ্যাঁচকা টানে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সেই মোটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিল, লোহার বেড়ি দিয়ে। এর মানে বুঝতে বেশি কষ্ট হল না ত্রিলোচনের, যেসব হতভাগ্যের পোড়া লাশ এখনও বিভিন্ন শ্মশানকাষ্ঠে ঝুলছে তাদেরই পরিণতি পেতে চলেছেন তিনি।

তারপর গাড়িটা এগিয়ে চলল বেতালমন্দিরের দিকে।

চোখটা এক বার বুজলেন তিনি। ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করতে লাগলেন বিড়বিড় করে, প্রভুম প্রাণনাথম বিভুম বিশ্বনাথম জগন্নাথ নাথম সদানন্দ ভাজম, ভবদ্ভব্য ভূতেশ্বরম ভূতনাথম... আচ্ছা খুব কি ব্যথা লাগবে পোড়ার সময়? চামড়াগুলো কি গলে গলে পড়ে যাবে? নিজেকে দু-চোখ মেলে দেখতে হবে জ্বলছে নিজের ত্বক, মাংস আর হাড়? নাকি তার আগেই মরে যাবেন উনি? কত তাড়াতাড়ি মরে যেতে পারে একটা মানুষ? যতই ভাবতে লাগলেন ততই যেন মনে হতে লাগল যে সারা দেহে মনে আর কোনো সাড় নেই।

তবুও একটা চিনচিনে স্বস্তির ভাব বুকের মধ্যে খেলা করে যাচ্ছিল তাঁর। যাক, ছেলেটা আর বউটা অন্তত রয়ে গেল, ওরা বেঁচে থাকুক লুকিয়ে। কোথাও যেন একটা স্বস্তির শ্বাস তাঁর উগ্রতপ্ত স্নায়ুগুলোকে সামান্য শান্তি দিল। আর একইসঙ্গে একটা কান্নার দলা যেন পাকিয়ে উঠতে লাগল ত্রিলোচনের গলার কাছটায়। এই ছেলে ত্রিলোচনের প্রাণ, বুকের পাঁজর, সাত রাজার ধন এক মাণিক। বুড়ো বয়সের ছেলে, বেশিক্ষণ তাকে না দেখে থাকতে পারেন না ত্রিলোচন। আর আজ চলে যাওয়ার আগে তাকে একটি বারের মতন দেখতে পাবেন না? বন্ধ চোখ থেকে হু হু করে জল পড়তে লাগল ত্রিলোচনের। আর ঠিক সেইসময়েই গাড়িটা থেমে যায় এবং একটি ভারী কণ্ঠ বলে ওঠে, ‘কী রে শয়তান হিন্দু, কোথায় পালাচ্ছিলি এটা নিয়ে?’ চমকে চোখ খোলেন ত্রিলোচন। দেখেন যে মন্দিরের প্রায় সামনে এসে গেছে তাঁর গাড়ি। সঙ্গেসঙ্গে গোরুটাকে খুলে নিয়ে যায় কেউ। বাকি দেশীয় সেপাইরা আরও গাদা গাদা চেরাই করে রাখা কাঠ এনে দ্রুত গাড়ির মধ্যে ফেলতে থাকে, যাতে সেই স্তূপের উচ্চতা ত্রিলোচনের বুকের সমান উচ্চতায় পৌঁছয়। যদিও এত কিছু খেয়াল করেন না ত্রিলোচন, স্থির চোখে তাকিয়ে থাকেন সামনে।

২০১৬। জুলাই। আফগানিস্তান

গুঁড়ি মেরে মেরে পুরো বারান্দটা পেরিয়ে এলেন মার্টিনেজ, পেছন পেছন বাকি পাঁচ জন। স্পেশাল রাবারাইজড জুতোর সোল, হিংস্র শ্বাপদের থাবার মতোই নিঃশব্দ সে। মোড়টার কাছে এসে কঠিন নৈঃশব্দে বসল সবাই। হাতের ভিজিকমে পরিস্থিতিটা এক বার দেখে নিলেন মার্টিনেজ। সেই দু-জন প্রহরী এখনও কালাশনিকভ হাতে স্থির দাঁড়িয়ে। স্কুল বিল্ডিঙের সামনেটায় অর্ধবৃত্তাকারে কর্ডন করে রাখা হয়েছে বিশাল এলাকা। সেখানে পুলিশ ও মিলিটারি জিপ, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা, দেশি বিদেশি টিভি চ্যানেলের ওবি ভ্যান, বেসামাল জনতায় জায়গাটা লোকারণ্য হয়ে আছে। থেকে থেকে মাইকে পোশতু ভাষায় আবেদন ভেসে আসছে স্থানীয় জিরগার বৃদ্ধ ধর্মীয় নেতাদের। কিন্তু তাতে কেউ কান দিলে তো। তবে যেটা কানে সবার আগে ভেসে আসছে, সেটা হচ্ছে মাঝেমধ্যেই শিশুদের ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার আওয়াজ আর তার প্রত্যুত্তরে ভারী গলার ধমক। আর দলের পাণ্ডাটির আফগান সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাবার অতি উচ্চকিত উগ্রকণ্ঠটি।

এমন সময় কানের কাছে নেভিগেশনে আদ্রিয়ানোর গলা ভেসে আসে 'টোয়েনটি টু ডেল্টা হ্যাশ, অ্যাট দ্য ফ্রন্ট বেন্ড।' হিসহিস করেন মার্টিনেজ, 'ফিফটি থ্রি আল্ফা হ্যাশ, পুল আউট হেল অ্যাভেঞ্জার, নিউট্রালাইজ নিয়ারেস্ট টার্গেট বাই নেক্সট থার্টি সেকেন্ডস।'

এই বলে পিঠের ব্যাগ থেকে একটা অদ্ভুত দর্শন যন্ত্রবন্দুক বার করলেন মার্টিনেজ। সাধারণ বন্দুকের তুলনায় এটি অনেকটা লম্বা, আর গোড়ার দিকটা, অর্থাৎ যাকে বাটস্টক বলে, সেটা এতটাই চওড়া যে মার্টিনেজের কাঁধ থেকে পেট অবধি কভার করে, দেখে মারণাস্ত্র কম, অত্যাধুনিক গিটার মনে হয় বেশি! প্রায় দশ কিলো ওজনের এই অত্যাধুনিক বন্দুকটি মার্কিন মিলিটারির সর্বশেষ সংযোজন, এবং মার্কিন সহযোগী দেশগুলির সর্বোচ্চ স্তরের কমান্ডো ফোর্সকেই এগুলো দেওয়া হয়েছে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যে। এভাবেই খান দশেক এসেছে পর্তুগালে। এসব এখনও নিয়মিত নিয়োগের জন্যে সার্টিফিকেট পায়নি। মার্টিনেজই ভালোবেসে এর নাম দিয়েছেন হেল অ্যাভেঞ্জার! বেশ কয়েক বছর আগে অ্যামোস গোলান নামের এক ইজরায়েলি কমান্ডার তৈরি করেন এক অদ্ভুতদর্শন বন্দুক, নাম কর্ণারশট। এই বন্দুকের মাঝামাঝি থেকে বাকি অংশটা অনুভূমিকভাবে নব্বই ডিগ্রি ডান দিকে বা বাঁ-দিকে বাঁকানো যায়। বন্দুকের ট্রিগার যেখানে থাকে তার ওপরেই, অর্থাৎ যাকে অপটিক মাউন্ট বলে, সেখানে রাখা থাকে ছোট্ট ভিডিয়ো ইউনিট। এতে আপনি কোনো দেওয়ালের এক কোণায় দাঁড়িয়েও বন্দুকের মাথাটা নব্বই ডিগ্রি কোণে বাঁকিয়ে দেওয়ালের অন্যদিকে থাকা শত্রুকে নিকেশ করতে পারেন, ঝুঁকি নিয়ে শত্রুর সামনাসামনি হওয়ার দরকারই নেই! এই আইডিয়ার সঙ্গেই মার্কিন মিলিটারির গবেষণা বিভাগ যোগ করে আরও এক মারাত্মক মারণক্ষমতা। মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ! মাইক্রোওয়েভ বন্দুক বা ম্যাগনেট্রন, যা কিনা বন্দুকের বদলে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মারাত্মক ইলেক্টোম্যাগনেটিক ওয়েভ নিক্ষেপ করে শত্রুদের উদ্দেশ্যে, তার তুল্য নিঃশব্দতম ঘাতক আজ অবধি আবিষ্কার হয়নি মারণাস্ত্রের ইতিহাসে। চার্জ করার সঙ্গেসঙ্গে প্রথমেই টার্গেট অনুভব করে সারা শরীরে হাজার ডিগ্রির জ্বলনযন্ত্রনা। আর তারপরেই সেই কয়েক-শো কিলোওয়াটের বিকিরণ আঘাত করে টার্গেটের মস্তিষ্কে, টার্গেট বুঝতেই পারে না কোথা থেকে কে তাকে আক্রমণ করল। বিনা প্রতিরোধে, বিনা শব্দে সে ঢলে পড়ে জ্ঞানহীনতার কোলে। তৎক্ষণাৎ মরে না যদিও, তার জন্যে সিক্রেট সার্ভিসের ঘাতকবাহিনি সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর যাবতীয় উপকরণ নিয়ে প্রস্তুত থাকে ইন্টারোগেশন চেম্বারে!

এই ম্যাগনেট্রন প্রযুক্তি জোড়া হয়েছে কর্ণারশটের সঙ্গে। কোণা থেকে অদৃশ্য হয়ে বিন্দুমাত্র আওয়াজ না করে শত্রুনিপাত করতে এর তুলনা নেই। সিক্রেট আর্মস সার্কেলে এর সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম হচ্ছে প্লাজমা ফায়ারফোর্স! তৈরি হয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেই হেল অ্যাভেঞ্জারের সামনের ফ্রন্ট সাইটটা নব্বই ডিগ্রি

বাঁকিয়ে মাজলটা নিঃসাড়ে দেওয়ালের ওদিকে ঘুরিয়ে দিলেন মার্টিনেজ। তারপর এল পি আই নেভিগেশনে ফিসফিস করে বললেন, 'ফিফটি থ্রি আল্ফা হ্যাশ, ডেথ বিউটি ইন অ্যাকশন।' ওধার থেকে জবাব ভেসে এল, 'টোয়েনটি টু ডেল্টা হ্যাশ, অ্যায় অ্যায় ক্যাপ্টেন।'

আঙুল দিয়ে ভিজিকমের রেজোলিউশন আরও বাড়ালেন মার্টিনেজ। সেই দুই প্রহরী একই ভাবে স্থির। ভেতরের দুটো ঘর থেকে উত্তেজিত চেঁচামেচি ভেসে আসছে পোশতু ভাষায়, বোঝা যাচ্ছে দরকষাকষির খুবই উত্তেজক পর্ব চলছে। যন্ত্রভ্রমরে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি শিশুর মুখে অব্যক্ত আতঙ্কের ছাপ। প্রত্যেকে বেঞ্চে তারা বসে আছে যেন মোমের নির্বাক পুতুল বসিয়ে রাখা আছে সারিসারি। মার্টিনেজের দিকের ক্লাসরুমেই দলের পাণ্ডাটি বসে। সে পায়চারি করছে ক্রমাগত আর স্যাটেলাইট ফোন কানে নিয়ে চেঁচিয়ে আফগান কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে যাচ্ছে যে আল্লাহর নামে, ইসলামের নামে, পবিত্র জিহাদের নামে শিশু জবাই করা কতটা শরিয়তসসম্মত, বিশেষত যাদের যৌনকেশ সদ্য উদ্গত হয়েছে!

ঠিক এইসময়ে সামনের বেঞ্চের এক বছর দশেকের শিশু আর সহ্য করতে না পেরে কেঁদে উঠল হাউহাউ করে, কান্না জড়িত গলায় তার দাবি, সে তার মায়ের কাছে যাবে! তৎক্ষণাৎ সেই বিশালদেহী পাণ্ডাটি সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল শিশুটির গালে। হতভম্ভ ছেলেটির মাথা পাশে সামান্য নীচু হয়েই সোজা হল আবার, চোখে আহত অপমানের দৃষ্টি নিয়ে সেই অবোধ শিশুটির ঠোঁট ফুলে উঠল অভিমানে, আর সেই ঠোঁটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল শিশুটির নিষ্পাপ রক্ত!

আর সহ্য হল না মার্টিনেজের, নেভিগেশনে আদেশ দিলেন, 'ফায়ার'। সঙ্গেসঙ্গে তাঁর হেল অ্যাভেঞ্জারের সামনের বাঁকানো নব্বই ডিগ্রি অংশটি সচল হয়ে ওঠায় কয়েক-শো কিলোওয়াটের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ধেয়ে গেল বারান্দায় পাহারা দেওয়া দুই বীরপুরুষের দিকে। দু-জনে প্রথমে বুঝতেই পারল না কোথা থেকে কোন সর্বনাশা মৃত্যু এসে তাদের আঘাত করল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাদের শরীরের চামড়া আগুন ছাড়াই জ্বলে উঠল প্রায় হাজার ডিগ্রির কাছাকাছি তাপমাত্রায়, সেই হতভম্ভ ভাব কাটাবার আগেই তাদের মস্তিষ্কে এসে আঘাত করল ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক চৈতন্যহীনতার আবেশ। দু-জনেই কোমরসমান উঁচু পাঁচিলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, জ্ঞান হারাতেই দু-জনেই পাঁচিল টপকে ঝরে পড়ল নীচে, নীচ থেকে শোনা গেল ধুপ ধুপ করে দুটি আওয়াজ।

এইবার দলের পাণ্ডা আর অন্য ক্লাসরুমে পাহারা দেওয়া তার শাগরেদের নজর এল এদিকে। চাপা গলায় আগে তারা সঙ্গীদের নাম ধরে স্যাটেলাইট নেভিগেশনে ডাকাডাকি করল খানিকক্ষণ। তারপর তাদের সাড়া না পেয়ে ব্যর্থতার আক্রোশে দু-জনেই আগে কালাশনিকভ বার করে বাইরের দিকে এলোপাথাড়ি বন্দুক চালিয়ে দিল পাঁচমিনিটের জন্যে। স্কুলের সামনে জড়ো হওয়া জনগণ সঙ্গেসঙ্গে আশ্রয় নিল মিলিটারি ব্যারিকেডের পেছনে।

তারপর কিছুক্ষণের ভয়ার্ত নৈঃশব্দ! এইবার দু-জনে নীচু হয়ে গুঁড়ি মেরে বাইরে আসে, দু-জনেরই হাতে দুই শিশুর ভয়ার্ত শরীর, তাদের গলায় ধরা ছুরি! টেনশনের ছাপ সেই দুই মূর্তিমান শয়তানের সর্বাঙ্গে।

বাঁকা হাসলেন মার্টিনেজ, এতই যাদের মৃত্যুভয়, তারা নাকি শাহাদত বরণ করে স্বর্গে যাওয়ার জন্যে এতই উতলা। নেভিগেশনে ধীরে আদেশ দিলেন তিনি, 'ফিফটি থ্রি আলফা হ্যাশ, কম্যান্ড টু টোয়েনটি টু ডেল্টা হ্যাশ, এনগেজ হেলবয় অ্যাট ইয়োর এন্ড, টেক নিয়ারেস্ট টার্গেট ডাউন।' আদ্রিয়ানো ধীরে পেছনে সরে গেলে তার জায়গা নিল গুস্তাভো, এই ইউনিটের হেলবয়। তিরিশ ফুট দূর থেকে যেকোনো সাইজের ছুরি, বা ব্লো পাইপ দিয়ে শত্রুকে শায়েস্তা করতে গুস্তাভো এক্সপার্ট, প্রতিটি প্ল্যাটুনে একটি করেই হেলবয় থাকে। এদের ভুলচুক হয় না একেবারেই, সে টার্গেট স্থির হোক বা চলমান। আর নিক্ষিপ্ত বস্তুটি হৃদপিণ্ড বা কণ্ঠনালী বা অন্য প্রাণঘাতী স্থান ছাড়া অন্য কোথাও বেঁধে না।

গুস্তাভো পেছনে সামান্য মাথা হেলিয়ে কী একটা বলল, সঙ্গেসঙ্গে আদ্রিয়ানো ক্রিকেট মাঠের উইকেট কিপারের মতো হাতের চেটো দুটিকে সামনে সামান্য পেতে বসলো। এরপর যেটা ঘটল সেটা শুধু ম্যাজিক।

গুস্তাভো নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই দু-বার জগিং করার ভঙ্গিতে অল্প লাফিয়ে তৃতীয়বারে একটু জোরে লাফায়, আর সঙ্গে সঙ্গে আদ্রিয়ানো গুস্তাভোর গোড়ালিদুটো আলতো করে ধরে সামনের দিকে শুধু উড়িয়ে দেয়, যেভাবে শৌখিন পুরুষ উড়িয়ে দেয় পোষা লক্কা পায়রা!

যেদিকে মার্টিনেজ ছিলেন তার উলটোদিকের কালাশ সন্ত্রাসবাদীটির হঠাৎই তাক লেগে যায় তার চোখের সামনে এক আজব দৃশ্য দেখে। যেন হঠাৎই, শূন্য থেকে তার চোখের সামনে চাকার মতন ঘুরতে ঘুরতে উড়ে আসে এক মানুষপাখি, তার শরীর জলপাই রঙের, মাথাটা বিলকুল কালো। অবাক হওয়া সরিয়ে সেই মানুষপাখির দিকে কালাশনিকভ তাক করার আগেই একটি গ্লকা বি ওয়ান ছুরি তার কণ্ঠনালীতে আমূল বিঁধে যায়। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে সেই সন্ত্রাসী যোদ্ধা, কিন্তু বেশিক্ষণ সময় পায় না, পর পর দুটো ছোটো ছুরি তার দুটো চোখের মণিতে এসে বিঁধে তাকে অন্ধ করে দেয়, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে বারান্দায়। বিশাল শরীরটা যেন খানিকটা অবাক হয়েই বারান্দায় ধপ করে পড়ে এবং কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করতে থাকে!

পুরো ঘটনাটা ঘটতে লাগে ঠিক একচল্লিশ সেকেন্ড!



এই প্রথম শব্দ হয় পুরো অপারেশনে, মৃতপ্রায় সন্ত্রাসবাদীটির হাতে ধরা শিশুটি অত রক্ত দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে এবং ঘটনার অভিঘাতে অজ্ঞান হয়ে যায়। দলের নেতাটি এবার ক্ষিপ্র হায়েনার মতন পিছনে ফিরে দেখে তার সঙ্গীর ছটফটানি, আর গলা থেকে ভলকে ভলকে বেরিয়ে আসা রক্ত। তখনই সে মেজাজ হারিয়ে চিৎকার করে গালি দিয়ে ওঠে। তার সামনে তখন তার সঙ্গীর দেহ ছাড়াও এক অজ্ঞান শিশু, আর বারান্দার শেষে দাঁড়ানো খাটো চেহারার এক কম্যান্ডো শরীর, ইতিমধ্যেই যার দু-হাতে উঠে এসেছে দুটি হ্যান্ডগান। সে দ্রুত তার হাতে ধরা শিশুটিকে কাছে টেনে আনে ঢাল হিসেবে, আর তার সঙ্গেই চেষ্টা করে তার কালাশনিকভ তুলে এই কাফেরের বাচ্চাটাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়ার, কিন্তু তার আগেই তিন তিনটি বুলেট পেছন থেকে তার মাথা ফুঁড়ে দেয়, গুলিগুলো তার মাথা ফুটো করে মেঝেতে পড়ে ঠনঠনান আওয়াজ তোলে। অবিশ্বাস্য মৃত্যুর অভিশাপ চোখে নিয়ে লোকটা সামনে দুম করে পড়ে যায় মেঝের ওপর। পেছনে দাঁড়ানো সিগ সয়্যারের অ্যাসল্ট রাইফেলটা নামিয়ে রাখেন মার্টিনেজ। তারপর তাঁর চোখের ইশারায় গুস্তাভো আর ক্লদিও দ্রুত গিয়ে দুটো ক্লাসরুমে ঢুকে শিশুদের দায়িত্ব নেয়। মার্টিনেজ বাকি টিমকে আদেশ দেন বিল্ডিঙের প্রতিটি কোণা খুঁজে দেখার জন্যে। এরপর নেভিগেশনে সেন্ট্রাল কম্যান্ডকে বলেন সোয়ার্মবটসটিকে তাঁর হাতের কাছে এনে দেওয়ার জন্যে। সেটিকে তালুবন্দি করে শান্তস্বরে খবর দেন, ‘অল টার্গেটস লিক্যুইডেটেড। অল কিডস আর সেফ, নো ক্যাজুয়ালটি, নো মেজর ইনজুরি। এনটায়ার পেরিমিটার বিইইং স্যানিটাইজড।’ ওপার থেকে একটা ভারী গলা ভেসে আসে, ‘গুড জব কমান্ডার, ওয়েল ডান।’

* * *

রাতে পার্টি হচ্ছিল ক্যাম্পে, সবার সঙ্গে মিশে আনন্দ উপভোগ করছিলেন মার্টিনেজ। জেরেনিমো চমৎকার মিমিক্রি করে। হাতে একটা ভদকার পেগ নিয়ে তাই দেখে হেসে কুটোপাটি হচ্ছিলেন তিনি। যেহেতু রেঞ্জার্সদের প্রকাশ্যে মুখ দেখানো নিষিদ্ধ, তাই তাঁদের ক্যামেরার সামনে আনা হয়নি। দ্রুত একটি টয়োটার এসইউভিতে তুলে ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা করে দেওয়া হয়। তবু মার্টিনেজের মনে আছে তাঁদের গাড়ি ঘিরে ধরে আফগান বাবা-মায়েদের আকুল কান্না, গাড়ির বনেটে আর জানালায় পাগলের মতন চুমু খাওয়া। দরিদ্র আফগান মায়ের কৃতজ্ঞতার অশ্রুর দাগ বোধ হয় সেই গাড়ির বনেটে এখনও খুঁজলে পাওয়া যাবে। আসার সময় সাইড ভিউ মিররে দেখছিলেন মার্টিনেজ, তাঁদের গাড়ির টায়ারের দাগের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়া মানুষের আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদাহ করা। মার্টিনেজদের মঙ্গলপ্রার্থনায় উর্ধ্বাকাশে উত্থিত সেই প্রার্থনার হাতগুলিকে ভোরের সূর্যমুখীর মতোই পবিত্র মনে হয়েছিল মার্টিনেজের।

মনটা খারাপ হয়ে গেল তাঁর। কবে যে ধর্মের বিষচক্র থেকে এই সরল দরিদ্র মানুষগুলির মুক্তি ঘটবে!

এমন সময় একজন রেঞ্জার্স দৌড়ে আসে তাঁর কাছে, মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁর কানের কাছে ফিসফিস করে, ‘আর্জেন্ট কল ফ্রম ল্যামেগো কমান্ডার, ফর ইউ।’

একটু ভাবিতই হয়ে পড়েন মার্টিনেজ। আবার কোথাও কোনো জঙ্গি হামলা নাকি? ভেবেই শরীরটাকে শক্ত করে নেন তিনি, হলে হবে, কমান্ডার ডাকলে যেতে হবে বই কী! ডিউটি ইজ ডিউটি। লোরান সিস্টেমের সিকিওরড চ্যানেলে ভিডিয়ো স্ক্রিন অন হতেই সামনে সিটিওই-র সর্বাধিনায়কের চৌকো খুনি মুখটা ভেসে ওঠে, ‘টোয়েনটি নাইন ল্যামডা কাপা, এই মুহূর্তে একটা কমব্যাট হেলিকপ্টার নিয়ে কাবুল চলে আসুন কর্নেল। সেখানে আপনার জন্যে সুপারসোনিক আর্মি জেট তৈরিই আছে। ইউ নিড টু রিচ লিসবন বাই নেক্সট টেন আওয়ার্স।’ অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে ওঠে মার্টিনেজের, ‘ফিফটি থ্রি আল্ফা হ্যাশ, এনিথিং রং চিফ? এনিথিং সিরিয়াস দেয়ার?’ চিফের ভাবলেশহীন মুখটা কি একটু অপ্রস্তুত দেখায় ক্ষণমুহূর্তের জন্যে?

সামান্য গলা নামিয়ে বলেন, 'তিয়াগো ইজ সিরিয়াসলি ইল মার্টি। ডক্টরস আর ফাইটিং আ রিয়্যাল টাফ ব্যাটল। কাম শার্প অ্যান্ড মিট তিয়াগো। হি ইজ লুকিং ফর ইউ ফ্র্যানটিক্যালি।'

মার্টিনেজের সামনে পুরো দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে এল।

১৫৬০। আগস্ট। গোয়া

মন্দিরের চাতালের ওপর দুই যবন, এবং তাঁদের সাজপোশাক দেখলে বোঝাই যায় যে তাঁরা যথেষ্ট উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। এক জন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়, আরেকজন খর্ব। যদিও এই খর্বকায় ব্যক্তিটিই যে প্রধান সে নিয়ে সন্দেহ নেই। লোকটির দাঁড়ানোর মধ্যেও এক কর্তৃত্বব্যঞ্জক দৃঢ়তা আছে, যা বাকি লোকগুলির মধ্যে নেই। কথাটা এসেছে ওই খর্বকায় মানুষটির গলা থেকেই, উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, ডান হাত সামনে তোলা, আর সেই হাতেই ধরা সেই মহাবেতাল শক্তিখণ্ডটি। এত দুঃখ, কষ্ট, নির্যাতন, আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া, তার মধ্যেও একটা মহাভয়ের শিরশিরে হিমেল স্রোত তাঁর অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দিল।

আমোনার মহাবেতাল মন্দিরের পুরোহিতরা পুরুষানুক্রমে পুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত হন না। তাঁরা নিজেদের উত্তরাধিকারী খুঁজে নেন। শ্রদ্ধায়, নিষ্ঠায়, প্রতিভায়, নিয়মানুবর্তিতায় এবং সর্বোপরি মন্ত্রগুপ্তিতে সিদ্ধ এমন ব্রাহ্মণ যুবককেই উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করা হয়। তার কারণ একটিই, প্রলয়ংকরী শক্তির উৎস এই আধারটিকে রক্ষা করা এবং সর্বসাধারণের নজর থেকে লুকিয়ে রাখা। ত্রিলোচনের গুরু এবং পূর্ববর্তী পুরোহিত আচার্যশ্রেষ্ঠ প্রথমেশ যেদিন অভিষেক করেন ত্রিলোচনের, সেদিনই এই শক্তিপীঠটি তাঁর হাতে অর্পণ করেছিলেন। দেখিয়ে দিয়েছিলেন গুপ্ত প্রকোষ্ঠটি, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সেটি খোলার কলাকৌশল। নইলে খালি চোখে দেখে ওই গুপ্তপ্রকোষ্ঠ আবিষ্কার করা বা সেটি খুলতে পারা স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষেও অসম্ভব!

সেইদিনই ধীরে ধীরে এর মাহাত্ম্য ত্রিলোচনের সামনে উন্মোচন করেছিলেন প্রথমেশ। সৃষ্টির আদিতে নাকি পাতাল থেকে উঠে এসেছিল এই শক্তিপিণ্ডটি। বলা হয় একাদশ রুদ্রের তেজ আর মহাকালের ক্রোধ একত্রিত হয়ে এই শক্তিখণ্ডটির উদ্ভব। যে বস্তুতে এই আধারটি নির্মিত তা পার্থিব কোনো উপাদান নয়, শত সহস্র নীহারিকাপুঞ্জের ওপারের কোনো অলৌকিক অপার্থিব মায়ারাজ্যের উপাদান। সপ্তসমুদ্রের প্রচণ্ডমূর্তি, বা লক্ষকোটি ঝঞ্ঝাবর্ত এই শক্তিখণ্ডটির ক্ষমতার সামনে শিশুতুল্য। পাতালের শতসহস্র উগ্রতেজা আগুনখেকো রাক্ষসের চণ্ডরোষ আর মেরুপ্রদেশের অযুত অর্বুদ মহাবলশালী তুষারদৈত্যদের সম্মিলিত তেজ দিয়ে এই মহাবেতালপীঠটির মজ্জা তৈরি। আর স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের ত্রিনয়নের আগুনে এর শোধন। অশুভ শক্তির হাতে পড়লে এই শক্তি মুহূর্তে প্রলয় ঘটাতে পারে, লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে এই জগৎ ও সৃষ্টি। মহাবেতাল ছাড়া আর কেউ এই শক্তিখণ্ডটির ধারণের উপযুক্ত নয়, তাই এই দিয়েই মহাবেতালের হৃদয় গড়েছেন দেবাদিদেব, আর দিয়েছেন অমিত প্রতাপের অধিকার। এই মহাবেতাল তাই মহাশক্তিধর, মহাপ্রলয়ংকর। মৃত্যুভয়ের অতীত, ভূতপ্রেতাদির একচ্ছত্র অধীশ্বর। স্বয়ং যম এঁর সামনে প্রণত থাকেন...

'কি রে কালো জন্তু, চিনতে পারছিস এটা?' বিদ্রুপের সুরে বলে ওঠা কথাটা শুনে হুঁশে ফেরেন ত্রিলোচন। আর তীব্র ক্রোধে এই প্রথম কুবাক্য উচ্চারণ করেন তিনি, 'আরে মূর্খ, যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে দে। অপবিত্র পশুর দল, কী জিনিস নিয়ে ছেলেখেলা করছিস সেটা বোঝা তোদের পশুবুদ্ধির অগম্য। যদি নিজেদের সর্বনাশ না চাস, এখুনি ফিরিয়ে দে ওটা।'

চোয়ালটা শক্ত হয়ে ওঠে সেই যবন রাজপুরুষটির, লাল চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ত্রিলোচনের দিকে। তারপর হিসহিস করে ওঠেন, 'ব্রিং হিজ সন অ্যান্ড ওয়াইফ। পুট দেম টু ফায়ার, বাই প্যাপাল অর্ডার।'

এতক্ষণ খেয়াল করেননি ত্রিলোচন, ধীরে ধীরে তাঁর দুইপাশে আরও দুটি হাতে টানা গাড়ি এসে থামে। সেখানেও গাড়ির পাটাতনে গাঁথা মোটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা দুটি মানুষ। তাদের দেহের অর্ধাংশ ইতিমধ্যেই শুকনো আসান কাঠে ঢাকা।

অতি কষ্টে ডান দিকে ঘাড়টা ঘোরাতেই যেন ত্রিলোচনের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে পায়ের পাতা অবধি একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল!

মালতী, ওঁর স্ত্রী আরেকটি খুঁটির সঙ্গে বাঁধা! তার মানে ধরা পড়ে গেছে ওরাও!

মাথার চুল কেটে ফেলা হয়েছে মালতীর, গায়ে যেটুকু কাপড় আছে তাতে কোনোমতে লজ্জা নিবারণ হয়! হাত দুটো ওপরে খুঁটির সঙ্গে লোহার বেড়ি দিয়ে বাঁধা। সারা গায়ে নির্যাতনের চিহ্ন স্পষ্ট, থেকে থেকে রক্ত জমাট বেঁধে আছে সারা শরীতে। ঠোঁটের কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে লালা ও রক্ত। এখানে ওখানে আগুনের ছ্যাঁকা দেওয়ার দাগ। যেটুকু চুল রয়েছে, তারাও হাওয়ায় উড়ছে অভিশাপের মতন। মালতীও চেয়ে আছে এদিকে, চোখে পাগলের মতন উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'অনেক রাত হল, খেতে বসবে না?'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণী। হিমশীতল কি একটা যেন তাঁর মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল। এই উন্মাদিনীকে কি তিনি চেনেন? এই কি তাঁর বড়ো আদরের, বড়ো ভালোবাসার স্ত্রী? মালতী আরও এক বার চারিদিকে তাকালেন উদ্ভ্রান্তের মতন, তারপর হাউহাউ করে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও, উঃ, খুব লাগছে, ও গো তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে আর মেরো না, মা গো, আর পারছি না...'

গায়ের সমস্ত রোম শিউরে উঠল ত্রিলোচনের, ক্রোধে, ক্ষোভে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। তাঁর সমস্ত চেতনা অবলুপ্ত হয়ে শুধু এক বিন্দুতে সংহত হতে লাগল। সমস্ত মস্তিষ্ক, সমস্ত স্নায়ু, শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু শুধু একটি শব্দ ধ্বনিত করে তুলল, প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ! চাই সেই ভয়ংকরতম অভিশাপ, যা একমাত্র বেতালমন্দিরের পুরোহিতরাই জানেন গত সহস্রবছর ধরে। যে শাপের মূর্তি ধরে স্বয়ং ঈশ্বরীয় ত্রাসদল তাড়িয়ে বেড়ান সেই মহাপাতককে! যে শাপ থেকে সৃষ্টির শেষ অবধি অভিশপ্তের মুক্তি নেই!

নরকবেতালশাপ!

এইবার ধীরে ধীরে ঘাড়টা বাঁ-দিকে ঘোরালেন ত্রিলোচন। আর লালচোখ মেলে শুধু চেয়ে রইলেন, চেয়েই রইলেন।

বীরভদ্র, তাঁর সদ্যকৈশোরোত্তীর্ণ সন্তান। তাঁর বুকের পাঁজর, চোখের মণি, সাত রাজার ধন এক মাণিক! সেও একই ভাবে বাঁধা বটে। তবে তার সারা শরীরে একটি বই আর কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। অবশ্য আঘাতের আর দরকার কি? কারণ যেভাবে সে ঘাড় মটকে আছে তাতে বোঝা যায় যে তার শরীরে বিন্দুমাত্র প্রাণও আর অবশিষ্ট নেই। আর না থাকার কারণ সারা শরীরের সেই একমাত্র আঘাতটি!

শিশুপুত্রের যে বুকে চুমু খেয়ে স্বর্গসুখ অনুভব করতেন ত্রিলোচন, যেখানে কান পেতে হৃদস্পন্দন শুনে হৃদয় জুড়োতেন, আজ সেই সন্তানের বুকে একটি বড়ো গর্ত। হ্যাঁ, গর্ত। সাধারণ আঘাত নয়, এক পাঞ্জা চওড়া, বুক ফেড়ে দেওয়া গভীরতম ক্ষত। আর সেইজন্যই বোধ হয় সোনার বরণ ছেলের সারা বুকে রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। ছেলের পায়ের কাছে পড়ে তার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটি। মানেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না ত্রিলোচনের। জীবিতাবস্থাতেই ছেলের বুক থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে তার হৃদয়টি!

মাথাটা সোজা করে সেই খর্বকায় যবন রাজপুরুষটির দিকে তাকালেন ত্রিলোচন। তখনও উদ্ধত ব্যঙ্গের হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে ত্রিলোচনের দিকে তাকিয়ে আছে সেই মূর্তিমান পাপ। বিড়বিড় করতে করতে হঠাৎ করে থেমে, চোখটা এক বার মাত্র বুজেই ধক করে খুললেন ত্রিলোচন, আর সেই অভিজাত যবন, মনসেইনর রেভারেন্ডো, গোয়ার ভাইকার জেনারেল শয়তানশ্রেষ্ঠ মিগুয়েল ভাজ যেন একটা শক্ত শীতল পাথরে ধাক্কা খেয়ে থেমে যান।

চোখ কোথায়? এ তো দু-খানা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো জ্বলছে এই পুরোহিতের অক্ষিকোটরে! সেই চোখের দিকে তাকানো যায় না, এতই ভয়ানক সেই অশুভ আগুনে দৃষ্টি। তার সঙ্গেই এই ব্রাহ্মণের সমস্ত দেহ জুড়ে শুরু হয় এক সূক্ষ্ম কম্পন, যেটা অভিজ্ঞ ক্রিশ্চান ধর্মকর্তার চোখ এড়ায় না।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অপার্থিব গোঁ গোঁ আওয়াজের সঙ্গে হঠাৎ করে তাঁদের ঘিরে, শুধু তাঁদেরই ঘিরে মহাসর্পের মতন মাথা তুলে দাঁড়ায় একটা ঘূর্ণিঝড়! মিগুয়েল দেখছিলেন যে পাঁচ-শো গজ দূরে মাঠের ওইপাশের গাছগুলোর একটি পাতাও নড়ছে না, কিন্তু এদিকে যেন এক সর্বগ্রাসী মহাসর্বনাশী ঝড় তার বিষধর কালফণা তুলেছে দংশন করবে বলে। এরই সঙ্গে এক ভয়াল অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারিদিক, কর্কশ আওয়াজ করে কতগুলো শকুন আর কাক উড়তে থাকে সবার মাথার ওপরে। অনির্দেশ্য নিয়তির মতন ওই ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডটি জুড়ে ঘনিয়ে আসে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাজি, অকস্মাৎ কড়কড়াৎ শব্দে বিকটভাবে ফেটে পড়ে একটা বাজ।

কী হচ্ছেটা কি? ভয়মিশ্রিত একটা ফাঁকা আতঙ্ক বুকে চেপে বসে মিগুয়েল ভাজের। তিনি একজন ইউরোপশ্রেষ্ঠ এক্সরজিস্ট, অতিপ্রাকৃত ঘটনার লক্ষণগুলি তাঁর থেকে ভালো চেনে এমন লোক ইউরোপে কমই আছে। কিন্তু তাঁরও মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ভয়ের হিমশীতল স্রোত নেমে যায়। এর প্রতিকার তাঁর ক্ষমতার পক্ষে অসাধ্য!

বিড়বিড় করতে করতে তিন দিকে তিন বার থুতু ছিটিয়ে দেন ত্রিলোচন। এবার শব্দগুলো আরও স্পষ্ট ও উচ্চকিত হয়, যদিও অপার্থিব সুরেলা উচ্চারণে গাওয়া সেই অর্থহীন হ্রূং ক্লিং ফট স্বাহা সমন্বিত শব্দসমষ্টি কারোরই বোধগম্য হয় না।

প্রবল আতঙ্কে ভীত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন মিগুয়েল ভাজ, ‘পুট দেম টু ফায়ার, ক্যুইক।’ তৎক্ষনাৎ ঝপাঝপ করে তিনটি কাঠের স্তূপে জ্বলন্ত মশাল এসে পড়ে বেশ কয়েকটা। ইতিমধ্যে পাগলের মতন মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে থুতু ফেলতে ফেলতে দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ করতে শুরু করেছেন ত্রিলোচন, সেই অনৈসর্গিক পাগলামির সুরে বিদেশীয় সৈনিকদের মুখের রেখায় ভয়ের ছায়া পড়ে। এদেশীয় প্রাজ্ঞরা জানেন এ কোন অশনিসম্পাতের চিহ্ন, তাঁরা ততক্ষণে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়েছেন বেতালমন্দিরের দিকে মুখ করে। বেসামাল হাওয়ায় টুপি সামলে রাখা দায় হয় দুই যবন রাজপুরুষেরই।

আর কোথা থেকে হঠাৎ করে একটা পচা মৃতদেহের কটু গন্ধ ঘিরে নেয় সমস্ত স্থানটিকে। তারপর সেই দুর্গন্ধ দ্রুত বেড়ে ওঠে অনেকগুন, আর অলৌকিক খলখল হাসির শব্দে ভরে চারিদিক। যেন হাজারে হাজারে স্খলিতমাংস, গলিতদেহ প্রাচীন মৃতদেহের সারি পাতালের হিম অন্ধকার থেকে উঠে এসে এই স্থানটিকে ঘিরে নাচতে থাকে। তাদের হাড়ের খট খট শব্দ মিশে যায় ঝোড়ো ঘূর্ণি হাওয়ার ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে।

শুকনো কাঠ আর ঝোড়ো হাওয়া, তিনটি স্তূপই জ্বলে উঠতে সময় নেয়নি বেশি। আর সেই দাউদাউ আগুনের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসে মহাবেতালসাধক, অঘোরীতন্ত্রশ্রেষ্ঠ ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণীর স্বর। সেই জ্বলে ওঠা আগুন পেরিয়ে, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভেদ করে, উত্তাল ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যে দিয়ে মিগুয়েল ভাজের দিকে ভেসে আসে একটা অতিলৌকিক কর্কশ কণ্ঠস্বর, ‘শোন রে পাপাত্মা হানাদার যবন, আমি ত্রিলোচন ক্ষেমকল্যাণী, আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুলের নামে, স্বর্গ ও নরকের নামে, ত্রিলোক ও একাদশ রূদ্রের নামে, অভিশাপ দিচ্ছি যে তোদের পরিবারের প্রতিটি প্রথম সন্তান অশেষ কষ্ট পেয়ে মৃত্যুর মুখ দেখবে, যেভাবে তোরা কষ্ট দিয়ে মেরেছিস আমার একমাত্র সন্তানকে। সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত তোর উত্তরপুরুষদের তাড়া করে ফিরবে নিয়তি, ততদিন পর্যন্ত এই শাপ থেকে তোদের মুক্তি নেই নেই নেই...’

২০১৬। জুলাই। লিসবন

লিসবন শহরের সবচেয়ে অভিজাত পল্লিটির নাম পার্খে দাস নাসোয়েস। তার শেষ প্রান্তে যে বাদামি রঙের প্রাসাদোপম বাড়িটি পর্যটক মাত্রেরই সম্ভ্রম এবং পর্তুগালের ধনীতম ধনীদের ঈর্ষামিশ্রিত তারিফের উদ্রেক করে, তার নাম ভাজ পালাসেতে, অর্থাৎ ভাজ প্যালেস।

এক বিষণ্ণ বিকেলে সেই প্রাসাদের দোতলার ঘরে একটি ছোটো ভিক্টোরীয় গোলটেবিলের দু-পাশে বসেছিলেন দুই পুরুষ, এক জনের বয়েস সত্তরের কোঠায়, আরেকজনের বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। খুব ভোর বেলায় লিসবনের আমাডোরা মিলিটারি এয়ারবেসে মার্টিনেজকে নিয়ে এসে ল্যান্ড করে পর্তুগাল সেনাবিভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ সুপারসোনিক জেটটি। মাটিতে পা রেখেই তাঁর জন্যে অপেক্ষারত ল্যান্ড ক্রুজারের সিটে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন মার্টিনেজ এবং পর্তুগালের জনবহুল রাস্তা ধরে সেই ল্যান্ড ক্রুজার প্রায় উড়েই যায়। উড়ে যায় লিসবনের, শুধু লিসবন কেন, সমগ্র পর্তুগালের শ্রেষ্ঠতম হাসপাতাল মিজেরিকর্দিয়া দে এভোরার দিকে।

ভাজ পরিবারের টাকার অভাব নেই বললে কম বলা হয়। গত সাত-শো আট-শো বছর ধরে পর্তুগালের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে এই পরিবার। রাজনীতি, যুদ্ধক্ষেত্র, ধর্মীয় পরিমণ্ডল সর্বক্ষেত্রে ভাজ পরিবারের অঙ্গুলিহেলনে পর্তুগালের রাজপাটের পটপরিবর্তন হত। এমনকী এক কালে রাষ্ট্রীয় টাঁকশাল এবং ব্যাঙ্ক, দুটিই নিয়ন্ত্রণ করত এই পরিবার। শুধু তাই নয়, মন্ত্রীপরিষদ নিয়োগ থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ পদটিতে কাকে বসানো হবে সেসবও ঠিক হত এই ভাজ পালাসেতে থেকে। এই ওয়াই-ফাই যুগেও পর্তুগালের ক্ষমতার অলিন্দে ভাজ পরিবারর দাপট অপ্রতিহত।

আর সেই বিপুল প্রতাপশালী ভাজ পরিবার, যার কুবেরীর্ষিত সম্পদ সমগ্র ইউরোপে এখনও প্রবাদের মতন, তার একমাত্র উত্তরাধিকারী কর্নেল মার্টিনেজ ভাজ আজকে সকালে মিজেরিকর্দিয়া হাসপাতালের সবচেয়ে সেরা কেবিনটির কাঁচের দরজার সামনে পথের ভিখিরির মতন বসে হাউহাউ করে কাঁদছিলেন। ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম কম্যান্ডোদের মধ্যে একজন তিনি, সমগ্র ইউরোপ এবং ইউ এস এ জুড়ে কঠিনতম কম্যান্ডো ট্রেইনিং সেশন পরিচালনা করতে যাঁর সর্বাগ্রে ডাক পড়ে, সেই তীক্ষ্ণাগ্রবুদ্ধি, কম্যান্ডোবিক্রমে অতুল কীর্তির অধিকারী যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ মার্টিনেজ ভাজ আজ একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারী বাবার মতন চিকিৎসকের হাত জড়িয়ে ধরে তিয়াগোর প্রাণভিক্ষা চাইছিলেন।

যদিও পর্তুগালের সেরা চিকিৎসকরা কোনো আশ্বাসবাণীই শোনাতে পারেননি। শোনানো দূরস্থান, তাঁরা এখনও বুঝতেই পারেননি যে অসুখটা কি! দুরন্ত ছেলে দিব্যি খেলছিল পালাসেতের বাগানে, একাই। সন্ধে নামার সময় হঠাৎ অত্যন্ত ভয়ার্ত মুখে দৌড়তে দৌড়তে উঠে আসে ঠাকুরদার কাছে। ঠাকুরদা ফার্নান্দো তখন দোতলার বারান্দায় আরামকেদারায় বসে খুবই মনোযোগ সহকারে সোনার জলে লেখা, মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একটি প্রাচীন বই পড়ছিলেন। তাঁর কাছে এসে তিয়াগো উত্তেজনা আর ভয়ে মেশামেশি আরক্তিম চোখ আর রক্তাভ মুখ নিয়ে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলে 'হি হ্যাজ কাম, হি হ্যাজ কাম', আর তারপরেই মুখে গ্যাঁজলা তুলে অজ্ঞান হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ ফার্নান্দোর আর্তচিৎকারে যাবতীয় কর্মচারীরা জড়ো হয় দোতলার বারান্দায়। তিনি সমগ্র পালাসেতে দ্রুত তল্লাশির আদেশ দেন, আর এমারজেন্সি কল দেন পারিবারিক ডাক্তারকে। এমনিতেই জনা চারেক প্রশিক্ষিত কম্যান্ডো দুটি ভয়ালদর্শন রটওয়েলার নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই পাহারা দেয় এই প্রাসাদ। রটওয়েলার দুটি অত্যন্ত হিংস্র ও মানুষখেকো। শোনা যায় তারা একবার ভাজ পালাসেতেতে ভুল করে ঢুকে পড়া এক ছিঁচকে চোরকে ঘন্টাখানেকের মধ্যে ছিঁড়ে খেয়ে উদরস্থ করে। আর তা ছাড়া ভাজ পরিবারের অত্যাধুনিক নিজস্ব সুরক্ষা ব্যবস্থা তো আছেই। ফলে কেউ এখানে ঢুকে কিছু একটা অপকর্ম করে নিরাপদে পালিয়ে যাবে এরকম হতে পারে না। কিন্তু কোথাও কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু বাগানের এক কোণে একটা তীব্র মড়াপচা গন্ধ সার্চপার্টির নাকে এসেছিল বটে, তবে সেই দুর্গন্ধ উবে যেতে বেশি সময় নেয়নি। নাহ, সেই গন্ধের উৎস অনেক খুঁজেপেতেও পাওয়া যায়নি।

আর হ্যাঁ, সেই যমদূতের মতন রটওয়েলার দুটি পোষা খরগোশের মতন জবুথবু হয়ে বসেছিল তাদের কেনেলে, অতি কষ্টেও তাদের বাগানের দিকে আনা যায়নি, কিছুতেই না!

ভাজ পরিবারের পারিবারিক ডাক্তার এসে পৌঁছোন এগারো মিনিটের মাথায়। তাঁরই পরামর্শ মতন অচৈতন্য তিয়াগোকে আধঘন্টার মধ্যে ভরতি করা হয় মিজেরিকর্দিয়াতে। ডাক্তাররা চিকিৎসার ত্রুটি করেননি বলাই বাহুল্য। প্রথমে বিভিন্ন রকম প্রাথমিক স্টিমুলাস দিয়ে সাড়া না পেয়ে শরীরের অত্যন্ত সংবেদনশীল জায়গায় আঘাত করে দেখা হয়। তারপর এক্স রে, আল্ট্রাসাউন্ড, ইসিজি, এম আর আই, সিটি স্ক্যান, থেকে শুরু করে ইএমজি, মায়েলোগ্রাম, নিউরোসোনোগ্রাফি যাবতীয় ভাবে তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে ওই দশ বছর বয়সি শিশুটির শরীর। ইতিমধ্যেই পর্তুগালের ইন্সতিতুতো নাসিওনাল দে এমার্জেন্সিয়া মেডিকা থেকে উঠিয়ে আনা হয়েছে দেশের সেরা ট্রমা বিশেষজ্ঞ ডক্টর ওরল্যান্দো হার্নান্দেজকে। তিনি অনেক চেষ্টা করেও সাড়া না পেয়ে জানান যে ইতিমধ্যেই সেই হতভাগ্য শিশু আচ্ছন্ন হয়েছে গভীর কোমাতে! ফল, দ্রুত আই সি ইউ-তে স্থানান্তরণ!

কিন্তু না, তিনিও বলতে পারলেন না, কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার বলি হল এই নিষ্পাপ প্রাণোচ্ছল বালক!

বলা বাহুল্য এরপর লন্ডন থেকে ইউরোপের সেরা পেডিয়াট্রিশিয়ানকে উড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই তিয়াগোর জন্যে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড আমেরিকার জন হপকিন্স, বস্টন চিলড্রেন্স হসপিটাল এবং সেইন্ট জুড চিলড্রেনস হসপিটালের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ফার্নান্দো আর মার্টিনেজ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। বাইরে একটা জ্যাকারান্ডা গাছের ডালে অনেকক্ষণ ধরে একটা উডকক পাখি বিষন্ন সেই দুঃখবিকেলের সঙ্গে মানানসই ক্লান্ত একঘেয়ে সুরে ডেকে যাচ্ছিল। তার পর সে উড়ে গেলে নৈঃশব্দ ভেঙে প্রথম কথা বললেন ফার্নান্দো, 'আমি সত্যিই দুঃখিত মার্ট। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না।'

থমথমে মুখ তুলে তাকালেন মার্টিনেজ, গলা ঝেড়ে বললেন, 'জানি পাপাই, ডাক্তাররাও যখন কিছু বুঝতে পারছেন না...'

আবার বেশ কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর যেন অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে ফার্নান্দো বললেন, 'একটা কথা ছিল মার্ট। অনেকদিন ধরে তোমাকে বলব বলব ভেবেও চেপে রেখেছি। তোমার মা অবশ্য অনেক আগেই তোমাকে জানিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আমি ঠিক সাহস পাইনি। কিন্তু নিয়তিকে আর ক-দিন ঠেকিয়ে রাখা যায় বল? আজই সেইদিন, আজই যদি তোমাকে সব খুলে না বলি, একটা বড়ো অঘটন হয়তো আর এড়ানো যাবে না।' অবাক বিস্ময়ে মুখ তুলে নিজের বাবার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন মার্টিনেজ। কিছু বলতে হল না, ওই নজরেই প্রশ্নটা লেখা ছিল স্পষ্টাক্ষরে।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন ফার্নান্দো, তারপর গলা ঝেড়ে বললেন, 'মার্ট, এই মুহূর্তে এই কথাটা বলার জন্যে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু তোমার কি মনে আছে, সিসিলিয়া মারা যাওয়ার পর আমরা তোমাকে আরেক বার বিয়ে করতে বলেছিলাম?'

একটু বিরক্তই হলেন মার্টিনেজ, 'পাপাই, এখন কি এসব আলোচনা করার সময়? আমি তো বলেইছিলাম তখন, আমি চাই না অন্য কোনো মহিলাকে মা বলে মানিয়ে নিতে তিয়াগোর কোনো সমস্যা হোক। বার বার একই কথা বলে, তাও এইসময়ে...'

হাত তুলে মার্টিনেজকে থামালেন ফার্নান্দো, 'আমি জানি মার্ট, সেটুকু ঔচিত্যবোধ তোমার বাবার আছে বলে বিশ্বাস রাখতে পার। এই শোকের আবহের মধ্যেও এই কথা বলছি তোমাকে, নিশ্চয়ই তার পিছনে কারণ আছে?'

ফার্নান্দোর স্বরে এমন কিছু একটা ছিল যে মার্টিনেজ সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর চোখে সেই কম্যান্ডোসুলভ খরদৃষ্টি ফিরে এল, 'কী বলতে চাইছ পাপাই? স্পষ্ট করে বলতো।'

জানালার বাইরে দিয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে দেন ফার্নান্দো। এই রাজসিক প্রাসাদের অনেক বাইরে নাগরিক লিসবনের জীবনযাত্রা অখণ্ড স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। সেই প্রবহমান চঞ্চল উচ্ছলতার মধ্যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে জেগে আছে এই বাড়ি, আর সেই বাড়ির চারিদিক জুড়ে কালই নেমে এসেছে এক বিষাদের অমঙ্গলছায়া। কে জানে, কবে তার থেকে পরিত্রাণ মেলে এই ক-টি জীবন্মৃত প্রাণীর!

ফিরে তাকান ফার্নান্দো, তারপরে নীচু অথচ স্পষ্টস্বরে বলেন, 'তোমার কি রডরিগো'র কথা মনে পড়ে মার্ট?'

মুহূর্তে যেন কেউ হ্যাঁচকা টান মেরে মার্টিনেজকে তাঁরই নিজের অমলিন শৈশবের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। মুহূর্তে কয়েক দশক পিছনে চলে গেলেন তিনি।

রডরিগো ছিল মার্টিনেজের সহোদর বড়ো দাদা, এবং একইসঙ্গে ফ্রেন্ড ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড। পাঁচ বছরের বড়ো এই দাদাটিকে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসতেন মার্টিনেজ। পর্তুগালের সেরা স্কুল সেইন্ট ডোমিনিকে পড়ত রডরিগো, গত কয়েক বছর ধরে ওখানেই পড়াশুনা করে আসছে ভাজ পরিবারের ছেলে-মেয়েরা। সেখানেও অল্পবয়সেই শিক্ষকদের নজর কেড়েছিল রডরিগো। পড়াশোনায় যেমন তুখোড় ছেলে ছিল সে, খেলাধুলায় তেমনই অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। স্কুলের যাবতীয় ক্যুইজ কম্পিটিশন জেতা থেকে শুরু করে অ্যাক্টিং ক্লাসে অসামান্য অভিনয় প্রতিভা দেখিয়ে সবার তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সে। তার ওপর তার আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটস ক্লাসের নৈপুণ্য দেখে শিক্ষকরাও ব্যোমকে যেতেন।

বড়ো দাদাটিকে হিরো জ্ঞানে প্রায় পুজোই করতেন মার্টিনেজ। দু-জনে মিলে প্ল্যান করতেন বড়ো হলেই একটা বড়ো জাহাজ চুরি করে নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করতে বেরিয়ে পড়বেন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, বার্থালোমিউ দিয়াজ আর ভাস্কো দি গামার পর মহাপরাক্রান্ত সমুদ্রজিৎ হিসেবে অক্ষয় হয়ে থাকবে এই দুই ভাইয়ের নাম। প্ল্যান করতেন ফাইটার প্লেন চালানোর। কত বিকেল, কত সন্ধে দুই ভাইয়ের কেটেছে ক্রুসেডার বা নাইট টেম্পলার সেজে লড়াই করার মধ্যে দিয়ে...

রডরিগোর ষোলো বছরের জন্মদিন উদ্যাপন করতে সবাই মিলে গেছিল লিসবনের সবচেয়ে অভিজাত বিপণীপল্লি অ্যাভেনিদা দে লিবারদাদে। সেদিন কিছু হুল্লোড় হয়েছিল বটে। অভিজাততম রেস্তরাঁতে পার্টি, নাচ, গান, শ্যাম্পেন, কেক, পাপাইয়ের স্নেহমিশ্রিত প্রশ্রয়ে রডরিগোর প্রথম বার কিঞ্চিৎ স্কচ পান, তারপর ডিনার, কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। সেই ডিনারের মাঝখানেই এক বার 'এক্সকিউজ মি' বলে উঠে ওয়াশরুমের দিকে চলে গেছিল রডরিগো। আধঘন্টা বাদেও সে না ফেরায় ভাজ ফ্যামিলি ত্রস্ত হয়ে রেস্তরাঁতে শোরগোল তুলে ফেলেন, এবং খোঁজাখুঁজি করতে করতে সেই রেস্তরাঁর পেছনে রাস্তার ওপরে পাওয়া যায় রডরিগোর মৃতদেহ।

মৃতদেহে কোনো আঘাতের দাগ বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন, কিছুই পাওয়া যায়নি। দামি ট্যুইডের শার্ট যেমনকার সাফসুতরো টিপটপ থাকার কথা, ঠিক তেমনই ছিল। কোথাও একফোঁটা রক্ত গড়ায়নি, কোনো গুলির শব্দ শোনা যায়নি। ওয়ালেট বা দামি ঘড়ি অথবা সোনার চেন কিছুই খোয়া যায়নি। শুধু মৃত কিশোরটির চোখে এক মরণান্তিক আতঙ্কের ছায়া গাঢ় করে আঁকা ছিল। সেই ভয়ের ছবি চাইলেও এড়ানো যায় না। মার্টিনেজ এখনও দুঃস্বপ্নে রডরিগোর সেই ভয়ে, আতঙ্কে বেঁকে যাওয়া মুখখানি দেখেন, এখনও তাঁর বমি উঠে আসে!

সন্ধে সাতটার সময় জনবহুল লিসবন শহরের মধ্যিখানে এমনকী ভয় পেল এক ষোলো বছরের কিশোর যে সে হার্ট ফেইল করে মরেই গেল? ডাক্তাররা তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো কারণ বার করতে পারেননি। শরীরের বাকি সমস্ত অর্গ্যান সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, অথচ কি থেকে কী হয়ে গেল কেউই বুঝতে পারেনি। যেমন এটাও কেউ বুঝতে পারেনি, যে ওয়াশরুমে থেকে রেস্তরাঁর পেছনের রাস্তায় রডরিগো গেল কী করে? সেখান দিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তাই নেই। ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে সেই রাস্তায় যেতে গেলে রেস্তরাঁর মধ্যে দিয়েই যেতে হবে, আর সেখান দিয়ে বেরোলে পরিবারের বাকিরা তো দেখতেই পেত!

বলা বাহুল্য, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পর্তুগালের পুলিশ বা পোলিজিয়া কিছুই সমাধান করে উঠতে পারেনি। 'আনসলভড মিস্ট্রি' বলে কেস ফাইল ক্লোজ করে দেয় তারা, বাড়ি বয়ে এসে ফার্নান্দোর কাছে টুপি খুলে ক্ষমা চেয়ে যায়। মার্টিনেজের বয়েস তখন এগারো বছর, সেই বিভীষিকাময় আতঙ্কের দিনগুলি কাটাতে অনেক সময় লেগেছে তাঁর। মাঝেমধ্যে তাঁর নার্ভাস ব্রেকডাউন হতে শুরু করে, তাঁর জন্যে রীতিমতো ব্যক্তিগত মনোবিদ নিয়োগ করতে হয় ফার্নান্দোকে।

ক্লান্ত ম্লান স্বরে কথা বলেন মার্টিনেজ, 'আবার রডসির কথা এখন কেন পাপাই?'

প্রশ্নটার কোনো সিধে জবাব দেন না ফার্নান্দো, শুধু মাথা নীচু করে একই স্বরে ফের প্রশ্ন করেন, 'আমার দাদা ফ্রান্সিসকোর কথা কিছু শুনেছ মার্ট?'

না, ফ্রান্সিসকোর কথা মার্টিনেজ বিশেষ কিছু শোনেননি, শুনে থাকার কথাও নয়। কারণ মার্টিনেজের জন্মের অনেক আগেই, মানে প্রায় উনিশ-শো উনষাট বা ষাট সাল নাগাদই অত্যন্ত কিশোর বয়সে ফ্রান্সিসকো মারা যান। কানাঘুষোয় শুনেছেন সেই মৃত্যুও খুব একটা স্বাভাবিক না। এখন কথা হচ্ছে যে এসব পারিবারিক কথা মার্টিনেজের জানা উচিত ছিল। কিন্তু রডরিগোর মৃত্যুর পর পরই মার্টিনেজকে খানিকটা জোর করেই এক রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ভরতি করে দেওয়া হয়। সেই থেকে শুরু করে যৌবনের অনেকটা কাল অবধি পরিবারের খুব একটা কাছাকাছি আসেননি মার্টিনেজ। কোথাও যেন মা-বাবার সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয় তাঁর, কোথাও যেন তাঁর মনে হত যে তাঁর বাবা বা মা চাইলেই রডরিগোর মৃত্যু আটকাতে পারতেন! নিয়তি যেন মার্টিনেজ তাঁর ও তাঁর পরিবারের মধ্যে অভিমানের একটা দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল তুলে দিয়েছিল। তাই এসব পারিবারিক গল্পগাছা তিনি বিশেষ কিছুই শোনেননি। অবশ্য সিসিলিয়াকে বিয়ে করার পর থেকে পরিস্থিতি অনেক পালটায়। অভিজাত পরিবারের এই বুদ্ধিমতী মেয়েটি ব্যাপারটি বুঝতে বেশি সময় নেয়নি, এবং অনেক যত্ন ও ধৈর্যের সঙ্গে ফার্নান্দোর ও মার্টিনেজের সুসম্পর্ক আবার ফিরিয়ে আনে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মার্টিনেজ, হায় সিসিলিয়া, দেখ তোমার একমাত্র সন্তানকে কোন অযোগ্য বাবার হাতে দিয়ে গেলে। হঠাৎই খুব অসহায় বোধ করতে থাকেন তিনি। তাঁর শীত করতে থাকে।

'ফ্রান্সিসকোর মারা যাওয়াটাও এইরকমই অদ্ভুতুড়ে ছিল মার্ট', সেই নীচু চাপা স্বরে বলে যেতে থাকেন, 'আশা করি তুমি যথেষ্ট ভালো করে পর্তুগালের ইতিহাস পড়েছ। আমাদের কলোনিগুলো কোথায় কোথায় ছিল নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার। এর মধ্যে আফ্রিকাতে সবচেয়ে বড়ো কলোনি ছিল গিনি অ্যান্ড কেপ ভার্দ, অ্যাঙ্গোলা আর মোজাম্বিক।'

এতটা বলে একটু থামলেন ফার্নান্দো। মার্টিনেজ চুপ করে রইলেন। তিনি তাঁর বাবাকে চেনেন, এবং এও জানেন যে পর্তুগালের গৌরবময় অতীতের প্রতি ফার্নান্দোর একটা চোরা টান আছে। মার্টিনেজেরও সেই টান ছিল কিশোর বয়সে। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা পালটে যায় পরবর্তীকালে, মানে কৈশোর ও যৌবনের প্রাক্কালে। মার্টিনেজ প্রথম যৌবনে যে মেয়েটির প্রেমে পড়েন সে ছিল পারতিদো কম্যুনিস্তার, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ সমর্থক। তার কাছেই সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের কথা শোনেন মার্টিনেজ। শোনেন সোভিয়েতের বিপ্লবের গল্প, পারী কমিউনের আখ্যান। সেই থেকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি মোহ কেটে যায় মার্টিনেজের। না, তিনি কোনোদিনই কমিউনিস্ট হয়ে যাননি, কারণ সেই সূত্রেই তিনি জানতে পারেন গুলাগের কথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানি ও পোল্যান্ডে রেড আর্মির অমানুষিক অত্যাচার আর অগণিত ধর্ষনের কথা। তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের গণহত্যার বীভৎস ছবি তো কৈশোরে তিনি নিজেই দেখেছেন। সেই থেকে তিনি রাজনৈতিক দিক থেকে মধ্যপন্থা নিয়ে চলেন। সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার প্রতি তাঁর সুতীব্র ঘৃণা আছে, সে জাতীয়তার নামেই হোক কী কোনো আদর্শের নামে। মুশকিল হচ্ছে ফার্নান্দো বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে এসব নিয়ে তর্ক করতে আর ইচ্ছে করে না মার্টিনেজের।

ফের শুরু করেন ফার্নান্দো, 'উনিশ-শো উনষাট সালে একটা অঘটন ঘটে যায়। পশ্চিম আফ্রিকাতে আমাদের কলোনি ছিল গিনি বিসও। বিসও এর প্রধান পোর্ট ছিল জেবা নদীর মোহনায়, পোর্ট অফ বিসও।

তবে লোকে চিনত পোর্তো পিদজিগুইতি বলে।'

মার্টিনেজ জানেন এরপর কীসের কথা আসবে, তবুও চুপ করে রইলেন তিনি।

'ঘটনার বছর তিনেক আগে গিনি ও কেপ ভার্দে একটি পর্তুগিজ বিরোধী বিদ্রোহী বাহিনী তৈরি হয়, আফ্রিকান পার্টি ফর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ গিনি অ্যান্ড কেপ ভার্দ, ছোটো করে বলতে গেলে পাইজিসি। এই পাইজিসির প্ররোচনায় ওই বছর পোর্তো পিদজিগুইতির ডক শ্রমিক ও মজদুররা মজুরি বাড়ানোর দাবিতে ধর্মঘট করে। ব্যাপারটা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু তার বদলে যা করা হয় তা অত্যন্ত লজ্জাজনক।' এতটা বলে ফার্নান্দো ফের থামেন, একটু জল খেয়ে নেন। তারপর ভুরু কুঁচকে কী যেন ভেবে নিয়ে ফের শুরু করেন 'তুমি তো জানোই আমাদের বাবা চাকরি করতেন পুলিশে। তখন তিনি ছিলেন একটি বিশেষ পুলিশবাহিনীর, যার নাম পি আই ডি ই, তার অন্যতম কর্তাব্যক্তি। এখন আর এর অস্তিত্ব নেই, তখনকার প্রধানমন্ত্রী অলিভিয়েরা সালাজার বিশেষ আদেশবলে এই বাহিনী তৈরি করেন। ওই ধর্মঘটের সময় বাবা তখন পিদজিগুইতিতে পোস্টেড। তার এক সপ্তাহ আগেই তিনি ওখানে গেছেন, সঙ্গে ফ্রান্সিসও। আমি মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে আছি, ভিয়েনাতে। আচমকাই পিদজিগুইতির পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। দিনটা ছিল তেসরা আগস্ট। পাইজিসির নেতারা এই ধর্মঘটের পিছনে মদত দিচ্ছে জেনে লিসবনের পি আই ডি ই-র হেডকোয়ার্টার থেকে আদেশ যায় যেকোনো মূল্যে ধর্মঘট ভাঙতে। বাবা আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু লিসবন শুনতে রাজি ছিল না। বাবা বাধ্য হয়ে গুলি চালানোর আদেশ দেন।' এরপর দু-জনেই চুপ করে থাকেন। এতটা বলার দরকারই ছিল না মার্টিনেজকে, এসবই জানেন তিনি। পিদজিগুইতি ম্যাসাকার পর্তুগালের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এই গুলিচালনার ফলে সেদিন কমপক্ষে পঞ্চাশ জন ডক শ্রমিক মারা যান। মার্টিনেজ খুব ভালো জানেন তাঁর ঠাকুরদার কী ভূমিকা ছিল সেইদিন। এখনও মাঝেমধ্যে পর্তুগালের রাজনৈতিক আলোচনার আসরে এই গণহত্যার কাহিনি উঠে আসে, চুলচেরা বিশ্লেষণ হয় সেই নিয়ে।

কিন্তু তার সঙ্গে ফ্রান্সিসকোর মৃত্যুর কী সম্পর্ক?

এইবার ঘোলাটে চোখ তুলে তাকালেন বৃদ্ধ, 'সেই দিন রাতেই মারা যায় ফ্রান্সিস। বাবা ওকে কোয়ার্টারে রেখে গেছিলেন, সঙ্গে শুধু এক জন আফ্রিকান মহিলা অ্যাটেন্ডেন্ট ছিলেন। মধ্যরাত্রে বাবা ক্লান্ত শরীরে টলতে টলতে ফিরে দেখেন দরজা খুলছে না কেউ। শেষে দরজা ভাঙতে হয়। দরজার কাছেই সেই মহিলা অ্যাটেনডেন্টের মৃতদেহ পড়ে ছিল, আর রান্নাঘরের সামনে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিল ফ্রান্সিস। বাবার কোলে মাথা রেখেই মারা যায় সে, তার আগে অত্যন্ত কর্কশ ও অপরিচিত গলায় শুধু বলে যায়, ''পাপের বেতন মৃত্যু, চাবুকের বেতন রক্ত।'' তারপরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আমার দাদা।'

এইবারে সোজা হয়ে বসেন মার্টিনেজ, স্পষ্টতই ফ্রান্সিসকোর মৃত্যু আর তিয়াগোর অসুস্থ হওয়ার ঘটনা দুটোর মধ্যে আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য আছে। কিন্তু... যেন মার্টিনেজের মনের কথা জেনেই বলে যেতে থাকেন ফার্নান্দো, 'সেবারেও কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, না ফ্রান্সিসের শরীরে, না সেই মহিলা। দু-জনের মুখই অজানা আতঙ্কে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে ছিল। আর একটা বিশ্রী পচা গন্ধ অনেকক্ষণ সেই ঘরে রয়ে গেছিল।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকেন মার্টিনেজ। এর মানে কী?

এরপর এক অদ্ভুত ভৌতিক স্বরে ফিসফিস করে বলে ওঠেন ফার্নান্দো, 'আমি জানি তুমি কী ভাবছ মার্টিনেজ। আজ তোমাকে সব বলব বলেই ডেকেছি। জানি না তুমি জানো কি না, বা লক্ষ করেছ কি না, আমাদের ফ্যামিলিতে কারও কোনো বড়ো ছেলে বাঁচে না। কোনো-না-কোনো অপঘাতে মারা যায়। শুধু অপঘাত নয়, প্রতিটিই ব্যাখ্যাহীন দুর্ঘটনা। সেই থেকে আমাদের পরিবারে অলিখিত নিয়ম দুটি সন্তানের জন্ম দেওয়া, সে ছেলে হোক বা মেয়ে। আমরা জেনেই এসেছি যে আমাদের জ্যেষ্ঠ সন্তানটিকে হারাতে হবে, এবং তার কোনো কারণ থাকবে না। সেইজন্যই যখন একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে সিসিলিয়া মারা গেল,

তোমাকে আরেকটা বিয়ে করতে বলেছিলাম। কারণ আমি জানতাম, তোমার মা-ও জানত যে তিয়াগো বাঁচবে না, বাঁচতে পারে না।'

মার্টিনেজ শুনলেন, কিন্তু কিছুই বুঝলেন না। শক্ত মানুষ তিনি, বীরশ্রেষ্ঠ, কম্যান্ডোশাস্ত্রে মহারথী। তিনিও এর কোনো থই পেলেন না। চোয়াল শক্ত করে খরদৃষ্টি মেলে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এইবার ফার্নান্দোর মুখে যেন সারা শরীরের রক্ত এসে জমা হল। কোনো এক অব্যক্ত উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইল সেই বৃদ্ধের সমস্ত শরীর, এবার যখন তিনি মুখ খুললেন মনে হল ফার্নান্দো ভাজ নয়, যেন এক অলৌকিক দৈবীস্বর কথা বলে উঠল, 'তোমাকে কখনো বলিনি মার্ট, কারণ তুমি এসবে বিশ্বাস কর না। কিন্তু তবুও বলছি শোনো, আমাদের পরিবারের ওপর একটি অতি প্রাচীন অভিশাপ আছে, প্রায় পাঁচ-শো বছরের পুরোনো অভিশাপ। পুরুষানুক্রমে আমরা সেই অভিশাপের ব্যাপারে জেনে এসেছি এবং তার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছি। এই অভিশাপের জন্যে আমাদের পরিবারের কোনো জ্যেষ্ঠ সন্তান বাঁচে না।'

মুহূর্তের জন্যে চুপ করেন তিনি, দম নিয়ে ফের শুরু করেন। স্থাণুবৎ বসে থাকেন মার্টিনেজ।

'ইট ওয়াজ অ্যারাউন্ড ফিফটিন সিক্সটি। ইন্ডিয়াতে যখন আমরা কলোনি স্থাপন করছি, মোস্ট স্পেসিফিক্যালি গোয়াতে। সেখানকার ভাইকার জেনারেল ছিলেন আমাদেরই এক পূর্বপুরুষ, মিগুয়েল ভাজ। তিনি পোপের আদেশে একটি অসামান্য শক্তিশালী রিলিজিয়াস আর্টিকেল দখল করতে গিয়ে একটি ঘোর অন্যায় করেন। ইনকুইজিশনের আশ্রয় নিয়ে কোনো এক হিন্দু প্রিস্টকে খুন করেন। শুধু তাই নয়, খুন করার আগে তাঁর সামনে তাঁর স্ত্রী আর একমাত্র সন্তানকে খুন করে জ্বালিয়ে দেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই পুরোহিত ছিলেন একজন অসামান্য শক্তিধর অকাল্টিস্ট। তিনি মারা যাওয়ার আগে আমাদের, সমগ্র ভাজ পরিবারের আত্মাকে অভিশপ্ত করে যান, বলে যান যে আমাদের পরিবারের কোনো জ্যেষ্ঠ সন্তান বাঁচবে না। এবং সেই থেকে এই পরিবারের কোনো জ্যেষ্ঠ সন্তান বাঁচেনি। তিনি এও বলে যান শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত এই অভিশাপ আমাদের তাড়া করে ফিরবে, এর থেকে আমাদের মুক্তি নেই।'

এতটা একসঙ্গে বলে সামান্য হাঁপাতে থাকেন ফার্নান্দো। মার্টিনেজ শুনছিলেন। এতক্ষণ, এবার প্রশ্ন করেন, 'সাউন্ডস রাবিশ! ইজ দিস সিরিয়াস, পাপাই?'

'ড্যাম সিরিয়াস মার্ট।'

'আমি এসবে বিশ্বাস করি না পাপাই। কো ইন্সিডেন্স হতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, হাজারো একটা কারণ হতে পারে...'

'সব জেনারেশনেই অ্যাক্সিডেন্ট আর কো ইন্সিডেন্স মার্ট? প্রতিটি মৃত্যুর কোনো এক্সপ্লানেশন নেই। আজ অবধি একটি মৃত্যুরও কোনো সুরাহা হয়নি। কোন কারণ হতে পারে মার্ট?'

'তার কারণ নিশ্চয়ই ঠিক ভাবে তদন্ত হয়নি তাই। পাপাই, খুব স্পষ্ট করে বলছি এসবে আমি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না...'

ঝুঁকে পড়ে ছেলের হাতটা খপ করে ধরেন ফার্নান্দো, 'তোমার বিশ্বাস করা না করায় কিছু এসে যায় না মার্টিনেজ। গত পাঁচ-শো বছর ধরে আমাদের পরিবারের প্রতিটি জ্যেষ্ঠ সন্তান মারা গেছে, আজ অবধি এর অন্যথা হয়নি। এবং প্রতিবারেই, আই রিপিট, প্রতিবারেই কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। সব আমাদের পারিবারিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, তোমাকে কোনোদিন এসব বলতে পারিনি, তার কারণ... কারণ... দশ বছর বয়েস থেকেই তুমি বাড়ির বাইরে মানুষ হয়েছ। তোমার মা ও চাননি তোমাকে সব কথা বলতে। কিন্তু আজ বলতে খারাপ লাগছে মার্ট, তিয়াগোর জন্যে আমি কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না।'

আকাশের দিকে তাকান মার্টিনেজ। বিজ্ঞান আর যুক্তির বাইরে আর কিছু ভাবতে পারেন না তিনি, ভাবা উচিতও নয়। কিন্তু মিজেরাকর্দিয়ার আই সি ইউ কেবিনে শুয়ে থাকা একটা ছোট্ট অসহায় শরীর তাঁর মানসিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দিয়েছে। ফার্নান্দো যা বলছেন তাতে ভুল নেই, অথচ মেনে নিতেও মন চায়

না। তিয়াগো... তিয়াগোর জন্যে সব করতে পারেন মার্টিনেজ। সত্যিই যদি তাই হয়? ফার্নান্দো যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়েই থাকে...তাহলে?

ঝুঁকে আসেন মার্টিনেজ, স্টিলের মতন শক্ত এবং শীতল স্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'যদি তোমার কথা সত্যি হয় পাপাই, তাহলে আমাকে বল এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আছে কিছু?'

চুপ করে থাকেন ফার্নান্দো, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে থাকেন, 'একটা উপায় আছে মার্ট, আমরা আগে জানতাম না আছে বলে। আমি সারাজীবন চেষ্টা করে গেছি এর কোনো প্রতিকারের জন্যে। নানা জায়গায় ছুটে গেছি, হাজারো লোকের সঙ্গে আলোচনা করেছি, কয়েক হাজার বই ঘেঁটেছি। এত পরিশ্রমের পর সদ্য, এই মাস দুয়েক আগে হয়তো একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। জানি না কতটা ঠিক, আর তার থেকেও বড়ো কথা হল যে তার মতন শক্ত আর কঠিন কাজ কিছু নেই।'

চোখ সরু করে নৈর্ব্যক্তিকস্বরে জিজ্ঞেস করলেন মার্টিনেজ, 'সেই রাস্তা নিলে কি তিয়াগোকে বাঁচানো গেলেও যেতে পারে?'

'আ-আই বিলিভ সো। কিন্তু তার দাম বড়ো কড়া মার্ট। প্রায় অসম্ভব সেই উপায়, অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন সে রাস্তা...'

'প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট ইট।'

'আমি তোমাকে হারাতে চাই না মার্ট। ভেবে দেখো, তুমি ছাড়া আর কেই বা আছে আমার?' চোখ ছলছল করে ওঠে সেই বৃদ্ধের, গলা বুজে আসে।

'পাপাই, প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট দ্য ওয়ে।'

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন ফার্নান্দো। তারপর গলা খাঁকড়ে পরিষ্কার করে বলেন, 'ওকে। লেট মি শো ইউ সামথিং। কী সেই অসাধারণ পাওয়ারফুল রিলিজিয়াস আর্টিকেল।'

এই বলে ধীরে ধীরে উঠে নিজের ঘরের দিকে যান ফার্নান্দো। পাথরের মতন শক্ত মুখ করে বসে থাকেন মার্টিনেজ। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাটলাররা এসে বারান্দার আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। এতক্ষণ ধরে বাবা কি করছেন না জেনে মার্টিনেজ উশখুশ করেছিলেন। বারান্দার পাশেই ফার্নান্দোর শোবার ঘর। খানিকক্ষণ পরেই সেখান থেকে একটা মৃদু ঘটাংঘট শব্দ মার্টিনেজের কানে আসতে উনি বিস্মিত হয়ে উঠলেন।

ফার্নান্দোর একটি গোপন দেরাজ আছে। ফার্নান্দোর বললে ভুল বলা হবে, এই পরিবারের কর্তাদের। মানে যিনিই এই পরিবারের কর্তৃত্ব হাতে পেয়েছেন, তিনিই ওই বিশাল মাস্টার বেডরুমের অধিকার পেয়েছেন, এবং সেইসঙ্গে তাঁর ওপরেই দেওয়ালে গাঁথা গোপন দেরাজটির মালিকানা ন্যস্ত হয়েছে। বাড়ির কর্তাব্যক্তি না হওয়া ইস্তক ভাজ পরিবারের কারো পক্ষে সে দেরাজে হাত দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই দেরাজে এমন কিছু জিনিস আছে যা অমূল্য, মানে আক্ষরিক অর্থেই তার কোনো দাম হয় না। তার দ্বিতীয় জোড়া থাকা তো সম্ভবই নয়, আর ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ধর্মীয় বা সামাজিক দিক থেকেও সেসব জিনিসের অভিনবত্ব বা স্বাতন্ত্র্য অদ্বিতীয় বললে কম বলা হয়। ফার্নান্দো একবার মার্টিনেজকে বলেছিলেন এর কথা। এখানে এমন দুটি প্রামাণ্য পুঁথি আছে যার জন্যে ক্রিশ্চিয়ানিটির ইতিহাস সম্পূর্ণ পালটে দিয়ে নতুন করে লেখা যায়। রয়েছে কাপড়ের ওপর চারকোল আর বিভিন্ন জৈব রঙে আঁকা এমন একটি পোর্ট্রেট যা বোধ হয় প্রভু যিশুর, খুব সম্ভবত মেরি ম্যাগদালেনের আঁকা। সেখানে যিশুর চুল কোঁকড়া কালো, নাক থ্যাবড়া, কপাল উঁচু আর দু-চোখে আশ্চর্য মায়াময় দৃষ্টি। অথবা মধ্যপ্রাচ্যের অসামান্য প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক ইবনে সিনা বা আভিসেন্নার নিজের হাতে লেখা চিকিৎসাবিদ্যার ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ বই, যার কথা আজও কেউ শোনেনি। মার্টিনেজ সেদিন কোনোই উৎসাহ দেখাননি। কিন্তু আজকের মার্টিনেজ সেই সেদিনের মার্টিনেজ নয়। সকালে মিজেরাকর্দিয়াতে আই সি ইউ-এর সামনে কাটানো কয়েকটা ঘন্টা লোকটাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। তিনি আজ তিয়াগোকে বাঁচাবার জন্যে দরকার হলে বুজরুকিতেও বিশ্বাস করতে রাজি!

ফার্নান্দো এসে সামনের চেয়ারে বসলেন। তারপর একটা লাল রেশমে জড়ানো চৌকোনা কিছু একটা রাখলেন টেবিলের ওপরে। রেশমের কাপড় খুলে বেরোলো একটি হাতির দাঁতে তৈরি বাক্স, যার গায়ের অসামান্য অলংকরণ দেখলে এর দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। সেই হাতির দাঁতের বাক্সের ডালা খুলে বাক্সটা মার্টিনেজের দিকে ঘুরিয়ে দেন ফার্নান্দো, 'কথা ছিল মিগুয়েল এইটা হস্তগত করে তখনকার পোপ ''তৃতীয় জুলিয়াসের'' হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু যখন ওই ঘটনা ঘটে তার কয়েক বছর আগেই পোপ মারা যান। মিগুয়েল আর কোনোদিন জিনিসটা পোপের হাতে তুলে দিতে পারেননি, তার অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল', বলে সাময়িকভাবে চুপ করেন ফার্নান্দো।

ততক্ষণ ধরে নিবিষ্টমনে বাক্সের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত বস্তুটিকে দেখছিলেন মার্টিনেজ। তাঁর সেই একাগ্রদৃষ্টি দেখে বোঝার উপায় ছিল না তাঁর কানে ফার্নান্দোর কথাগুলো যাচ্ছে, না যাচ্ছে না!

এই তাহলে সেই?? এর জন্যেই তাঁর পরিবারের ওপর রক্ত আর অশ্রুর ডানা মেলে আছে এক পাঁচ-শো বছরের প্রাচীন অভিশাপ? এর জন্যেই তাঁর তিয়াগো আজ কোমাতে? খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গেই চুপ করে তাকিয়ে ছিলেন তিনি।

জিনিসটা মুঠোর মধ্যে ধরা যায় এমন একটা পাথুরে কিছু। আকারটা ডিমের মতন গোলাকার, তাও একটু অদ্ভুত। আর কালো, মানে কুচকুচে কালো। এমন স্ফটিককালো মসৃণ পাথর আর দেখেননি মার্টিনেজ। না শুধু কালো নয়। আরও একটা কিছু আছে ওর মধ্যে, মনে হল মার্টিনেজের। হিরের থেকে যেমন উজ্জ্বল দ্যুতি বার হয়, এই কালো পাথরটা থেকেও যেন তেমনই একটা ঘনকৃষ্ণ উজ্জ্বল অন্ধকার বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আহা, কালোরও যে এত মনোহারি ঔজ্জ্বল্য হয়, অন্ধকারেরও যে এমন চোখ ধাঁধানো রূপ হয় সে মার্টিনেজ আজ অবধি কখনো দেখেননি। তিনি নির্নিমেষে এর দিকে চেয়েছিলেন, তাকিয়ে ছিলেন মোহগ্রস্তের মতন।

ডান হাত বাড়িয়ে তিনি জিনিসটাকে হাতে তুলে নিলেন, এবং সঙ্গেসঙ্গে দুটো জিনিস অনুভব করে সামান্য শিউড়ে উঠলেন। এক, জিনিসটা তার আকারের তুলনায় ভারী। শুধু ভারী নয়, একই আকারের লোহার তুলনায় কম করে চার থেকে পাঁচ গুণ ভারী। এবং দুই, বস্তুটি শুধু ভারী নয় শীতলও বটে, এমনকী হিমশীতল বললেও কম বলা হয় তাকে। এতদিন ধরে হাতির দাঁতের বাক্সে বন্দি হয়ে দেওয়ালে গাঁথা দেরাজে থেকে ওই শৈত্য সম্ভব নয়। স্পর্শ মাত্রেই এই কঠিন শৈত্য চৈতন্যে অশরীরী বোধ জাগ্রত করে। জিনিসটা হাতে তুলে চোখের আরও কাছাকাছি আনলেন মার্টিনেজ। আর তখনই আরও তিনটি জিনিস লক্ষ্য করে আশ্চর্য হলেন তিনি। এই মুঠোর মধ্যে ধরতে পারা বস্তুটির গা মসৃণ। বোধ হয় বলা ভুল হল, মসৃণ নয়, অবিশ্বাস্য রকমের মসৃণ। পর্তুগালের সেরা কম্যান্ডো নেতা হওয়ার খাতিরে মার্টিনেজকে আরও বিবিধ কৃত্রিম পদার্থের কার্যকারিতা ব্যবহার করে দেখতে হয়, সেসব সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু মার্টিনেজ হলফ করে বলতে পারেন যে এই বস্তুটি তাঁর অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণভাবে নতুন। আর দ্বিতীয়টি হল, যেটাকে তিনি ঘনকৃষ্ণ কালো বলে মনে করছিলেন, কাছে আনলে দেখা যাচ্ছে যে তার সারা গা জুড়ে বিদ্যুতের মতন খেলে যাচ্ছে এক রক্তলাল আভা। খুবই সূক্ষ্ম সেই লাল রঙের আলোর নাচন, কিন্তু এই প্রথম মার্টিনেজের মনে হল জিনিসটা জ্যান্ত! ওর মধ্যে প্রাণ আছে, আর এই তড়িদ্গতি বিদ্যুৎশিখাই তার চিহ্ন। সামান্য শিউড়ে উঠে জিনিসটা রেখেই দিতেন মার্টিনেজ, এমন সময় তিনি এর আকারটি লক্ষ্য করলেন। আর তাঁর মনে হল যেন এই আকার বা আকৃতি তিনি আগে কোথাও দেখেছেন। কোথায় দেখেছেন উনি? ভুরু কুঁচকে ভাববার চেষ্টা করলেন। 'কংখ শেল', যেন মার্টিনেজের মনের কথা ভেবেই বলে উঠলেন ফার্নান্দো, 'হিন্দুরা বলে শঙ্খ, হিন্দুদের কাছে পবিত্রতম ধর্মীয় বস্তুগুলির মধ্যে একটি। এই স্পেশ্যাল বস্তুটি এক্স্যাক্টলি একটি শঙ্খের আকারের। এবং শুধু তাই নয়, এর একটি স্পেশ্যালিটি আছে, এর মাথাটা চোখের সামনে ধর।'

বাবার কথা মতন তাই করলেন মার্টিনেজ, প্রথমে কিছু বুঝলেন না। তারপর চোখ সয়ে আসতে ব্যাপারটা উনি ঠাহর করতে পারলেন। প্রায় আসল কংখ শেলের মতোই এই বস্তুটিরও একটি স্পাইরাল আছে। এবং

যে লাল রঙের সূক্ষ্ম বিদ্যুৎপ্রভা উনি দেখেছিলেন আগে, সেগুলো যেন খেলে যাচ্ছে স্পাইরালের ভাঁজ বরাবর। সামান্য বিচলিত মুখ তোলেন উনি, 'ইয়েস পাপাই, আই ক্যান সি দ্য স্পাইরাল।' এই বলে জিনিসটা আইভরি বাক্সে রেখে, বাক্সটা বন্ধ করলেন মার্টিনেজ। তারপর সেটা বাবার দিকে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ পাপাই, কী যেন বলছিলে?'

ততক্ষণে তাঁদের সামনে উৎকৃষ্ট কফি এনে হাজির করেছে পরিচারক। তাতে একটা চুমুক দিয়ে শুরু করলেন ফার্নান্দো, 'মিগুয়েল তখন দেশে ফিরে এসেছেন, তখন পোপ চতুর্থ পায়াস। ইনি একটু গুছিয়ে বসেই গোপন এত্তেলা পাঠান মিগুয়েলের কাছে, জিনিসটা তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু পোপ যেটা অসম্ভব ভেবেছিলেন, তাই হল। মিগুয়েল প্রথমে পোপের আদেশ এড়িয়ে গেলেন কয়েক বার। শেষে আরও চাপ বাড়লে মিগুয়েল এটি পোপের হাতে তুলে দিতে সরাসরি অস্বীকার করেন। স্বাভাবিক ভাবেই পোপ চতুর্থ পায়াস এবার পর্তুগাল সম্রাটের দ্বারস্থ হন। পোপের ব্যক্তিগত সচিব পোপের চিঠি নিয়ে স্বয়ং হাজির হন সম্রাটের দরবারে। সালটা ১৫৬৫, তখন পর্তুগালের শাসক বালক সম্রাট প্রথম সেবাস্তিয়ান।

সম্রাট সেবাস্তিয়ানের লাইফটা খুব অদ্ভুত, জানো মার্ট। ইনি তিন বছর বয়সেই রাজা হন এবং নাবালক রাজার রিজেন্সি বা রাজপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বভার নেন তাঁর ঠাকুমা, অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত হ্যাপ্সবার্গ রাজবংশের মেয়ে রানি ক্যাথরিন।

ক্যাথরিন অত্যন্ত ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন, জেসুইটদের কথায় উঠতেন ও বসতেন। পোপ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে রানির আদেশ না মেনে মিগুয়েলের উপায় থাকবে না। কিন্তু দেখা গেল যে মিগুয়েলও কূটনীতিতে কম প্রতিভাধর ছিলেন না। তিনি রানির সঙ্গে গোপনে দেখা করে এমন জিনিস উপঢৌকন হিসেবে দিলেন যে পুরো ঘটনার মোড় ঘুরে গেল।

রানি ক্যাথরিন সমগ্র ইউরোপে কালেক্টর বা সংগ্রাহক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। কথিত আছে অন্য অনেক অদ্ভুত জিনিসের সঙ্গে তাঁর সংগ্রহে নাকি একটি ইউনিকর্নের শিং-ও ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহই এই সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের প্রথম কুন্সটক্যামার।'

'কি? কুন্স হোয়াট?' শেষ শব্দটা ভালো করে বুঝতে পারলেন না মার্টিনেজ।

'কুন্সটক্যামার, শব্দটা জার্মান। ওর মানে হচ্ছে ক্যাবিনেট অফ কিউরিওসিটি বা ক্যাবিনেট অফ ওয়ান্ডার। এই ধরণের ব্যক্তিগত কুন্সটক্যামার বা কুন্সটকাবিনেট থেকেই পরে মিউজিয়ামের ধারণা আসে।' ব্যাখ্যা করেন ফার্নান্দো। একটু দম নিয়ে ফের বলতে থাকেন, 'কিন্তু বিশেষ করে যে জিনিসের বিপুল সংগ্রহের জন্যে রানি ক্যাথরিন ইউরোপের নজর কেড়ে নিয়েছিলেন তা হচ্ছে চীন থেকে আনা পোর্সিলিনের বাসনপত্র এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য। এ ব্যাপারে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং তাঁর কাছে এই পোর্সেলিনের শিল্পদ্রব্যের সম্ভার পর্তুগালের রাজবৈভবের প্রতীক ছিল। আর এইখানেই বোঝা গেল মিগুয়েলের বুদ্ধিমত্তা।

তুমি নিশ্চয়ই জানো যে এশিয়াতে আমাদের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল গোয়া। গোয়া ছাড়াও, পনেরো-শো সাতান্ন নাগাদ আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বন্দরশহর দখল করি এশিয়াতে। উনিশশো নিরানব্বই অবধি আমাদের অধিকারে ছিল সে শহর।'

'ম্যাকাও', বলে ওঠেন মার্টিনেজ। বাণিজ্যবন্দর হংকং এর কাছে ছোট্ট দ্বীপ ম্যাকাও। ক্যাসিনো এবং বিলাসের স্বর্গরাজ্য, বছর দেড়েক আগে সেখানে একবার গেছিলেন বটে মার্টিনেজ। মৃদু হাসেন ফার্নান্দো, 'চীনে তখন মিং রাজবংশের শাসন, পোর্সেলিন শিল্পের রমরমা সময়। গোয়া থেকে চলে আসার আগে মিগুয়েল প্রচুর পোর্সেলিনের ভাস আর অন্যান্য জিনিসপত্র ম্যাকাও থেকে আমদানি করেন ও সেইসব নিয়ে পর্তুগাল চলে আসেন। সেই অসামান্য কারুকার্যখচিত পোর্সেলিনের সম্ভার নিয়ে মিগুয়েল সোজা রানি ক্যাথরিনের কাছে হাজির। আর রানিমাও গলে জল! ফলে যা হওয়ার তাই হল, পোপের সচিবকে খালি হাতেই রোমে ফিরতে হল। রাজদরবারে মিগুয়েলের প্রতিপত্তি বেড়ে দ্বিগুণ হল। এরপরেও রোমের পক্ষ থেকে অনেক চেষ্টা হয়েছে এই জিনিসটি উদ্ধার করার। অন্য কোনো পরিবার হলে হয়তো এতদিনে

জিনিসটা ভ্যাটিকানের গোপন প্রকোষ্ঠে শোভা পেত। কিন্তু পর্তুগালের বুকে দাঁড়িয়ে ভাজ পরিবারের হাত থেকে কোনো জিনিস কেড়ে নেওয়া কতটা অসম্ভব সে তুমিই জানো।'

একটা খটকা মার্টিনেজের মনে রয়েই গেল, 'কিন্তু পোপের হাতে তুলে দিতেই বা কী অসুবিধা ছিল? মানে মিগুয়েল হঠাৎ এটা ফেরত দিতে অস্বীকার করলেনই বা কেনো? পোপকে দেবেন বলেই তো দখল করেছিলেন ওটা।'

চশমাটা খুলে দু-আঙুলে দুই চোখের সংযোগস্থলটা একটু চেপে ধরেন ফার্নান্দো, ফের চশমাটা পরে নেন। তারপর ধীর এবং অনুচ্চ গলায় শুরু করেন, 'এই কথাটা বলার জন্যেই এত বিশদে ঘটনাগুলো তোমাকে জানাচ্ছি মার্ট। মিগুয়েলের একটি ডায়েরি আমি উদ্ধার করি কয়েক বছর আগে। তার সঙ্গে আর একটি গোটানো ডিক্লারেশন পাই, লিওনার্দো বলে আমাদেরই এক পূর্বপুরুষের লেখা একটি ঘোষণাপত্র। রডরিগো মারা যাওয়ার পর বাকি সারাজীবন ধরে আমি এই অভিশাপ ও তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুঁজে ফিরেছি। তুমি তো জানোই আমার নিজেরই উৎসাহ আছে এই বিষয়ে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি মাত্র উপায়ই আছে, এবং তা কোনো অলৌকিক আধিদৈবিক উপায়। সাধারণ মানুষী উপায়ে এর কোনো সমাধান সম্ভব নয়। সে যাই হোক, এই করতে করতে শেষতক বছর পাঁচেক আগে আমাদেরই পারিবারিক লাইব্রেরিতে দেওয়ালের মধ্যে গাঁথা একটি গুপ্ত দেরাজ থেকে মিগুয়েলের ডায়েরি উদ্ধার করি।

সেই ডায়েরিতে অনেক কথা লেখা আছে। সব তোমাকে বলার দরকার নেই। মিগুয়েল দেশে ফিরে শোনেন তাঁর বড়ো ছেলের দৈব দুর্বিপাকে মারা যাওয়ার খবর। ছেলের শোকে মিগুয়েলের স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। বড়ো ছেলের পরেও মিগুয়েলের আরও একটি ছেলে ও মেয়ে ছিল, তাঁদের তিনি বহু পরিশ্রমে মানুষ করেন। ছেলে মারা যাওয়ার খবর শুনে মিগুয়েলের মনে ভয় এবং অনুশোচনা, দুইই ঢোকে। তিনি ভেবেছিলেন যে করেই হোক তিনি ইন্ডিয়া ফিরে গিয়ে যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন। ফলে পোপের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা তাঁকে নাকচ করতে হয়। তার থেকেও বড়ো কথা, বস্তুটি হাতে নিয়ে মিগুয়েলের মনে এক আশ্চর্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সৃষ্টি হয়। কোনোমতেই তিনি এটা হাতছাড়া করতে চাননি। মিগুয়েলের সেই বেঁচে থাকা ছেলেটির নাম ছিল আলমাও। আলমাওয়ের দুটি সন্তান হয়, বড়োটি মেয়ে, নাম বেথানিয়া। নিজের বিয়ের দিন সম্পূর্ণ অলৌকিক উপায়ে জ্বলে গিয়ে বেথানিয়া মারা যান। এই ঘটনাটা এতই অবিশ্বাস্য, যে তোমাকে না বলে পারছি না। ভাজ পরিবারের বড়ো মেয়ের বিয়ে। রাজপরিবার থেকে শুরু করে সারা দেশের গণ্যমান্যরা উপস্থিত, বিদেশাগত অতিথিও কম নেই। স্বয়ং রাজা বিশেষ আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন, উপহার দিয়েছেন বহুমূল্য হিরের নেকলেস। লিসবনের সবচেয়ে পুরোনো এবং বড়ো ক্যাথিড্রাল সে দে লিসবোয়ার আর্চবিশপ স্বয়ং নিজে বিয়ে দিতে উপস্থিত। দামি গাউন পরে বেথানিয়া চার্চের আইল ধরে হেঁটে এসেছেন এইমাত্র, আর্চবিশপ মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। শপথ নেওয়ার ঠিক সেই স্মরণীয় মুহূর্তে হাসিমুখে বেথানিয়া সলজ্জ ভঙ্গিতে বলবেন, 'ইয়েস আই ডু', এমন সময় হল ভরতি লোকের সামনে, সম্পূর্ণ অলৌকিক ভাবে বেথানিয়া সমস্ত কাপড়চোপড় নিয়ে দপ করে জ্বলে ওঠেন। মানে একটুখানি আগুন লেগে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়া নয়, যেখানে দূরদূরান্ত অবধি কোথাও আগুনের চিহ্নমাত্র ছিল না সেখানে পুরো মানুষটাই দপ করে একসঙ্গে জ্বলে ওঠে। যেন তুলোভরা কাগজের পুতুল কেউ আপাদমস্তক পেট্রোলে ভিজিয়ে তার ওপর দেশলাইকাঠি ছুঁড়ে মেরেছে! এই বুদ্ধির অতীত, ব্যাখ্যার অতীত অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখে উপস্থিত মহিলারা আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে যান, আর্চবিশপও তাই। বর বেচারির হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে সেখানেই মারা যায়। বেথানিয়ার মরণপণ আর্তনাদ, জ্বলন্ত গাউন নিয়ে দৌড়াদৌড়ি, পোড়া মাংসের গন্ধ, বাচ্চাদের কান্নার শব্দে জায়গাটা প্রায় নরক হয়ে ওঠে। সমস্ত অতিথিরা হুড়োহুড়ি করে পালাতে থাকেন, তাতে আবার মন্ত্রীপরিষদের দু-এক জন সদস্য সামান্য চোটও পান। অত বড়ো

ক্যাথেড্রালের দামি কার্টেনে আগুন লেগে যায়। সামনের সারির কিছু বেঞ্চও পুড়ে যায়, পুড়ে কালো হয়ে যায় পূর্ব দিকের দেওয়ালের মিকেলেঞ্জেলোর অনুকরণে আঁকা বিশাল মুরাল।

প্রভাবশালী হওয়ার জন্যে অনেক কষ্ট করে হলেও প্রচুর টাকা ছড়িয়ে ভাজ পরিবার এই ঘটনা ধামাচাপা দেয়। নইলে সে দে লিসবোয়া তো প্রথমে দাবিই তুলেছিল যে ভাজ পরিবার শয়তানি কালাজাদু প্র্যাকটিস করে, তারা খ্রিস্টবিরোধী। ভাজ পরিবারকে দেশছাড়া করা হোক।'

ধৈর্য হারাচ্ছিলেন মার্টিনেজ। তাঁর কাছে সময় বড়ো অল্প, তিয়াগো আজ মৃত্যুশয্যায়, এবং তাকে বাঁচানোর জন্যে তিনি নিজের শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু অবধি আজ খরচ করতে রাজি। এত সব গালগল্প কি এখন না শুনলেই না? একটু রূঢ়ভাবেই বললেন, 'পাপাই, সব বুঝলাম, এখন প্লিজ বলবে তিয়াগোকে বাঁচাবার জন্যে ঠিক কী কী করতে হবে?'

থমকালেন কি ফার্নান্দো? সন্তানের রূঢ়ভাষা কি কোনোভাবে আঘাত করল তাঁকে? হয়তো করল, কিন্তু তিনি মার্টিনেজের এই উদ্ভ্রান্ত উদ্বেগ বুঝলেন, হাজার হোক, তিনিও যে বাবা, মার্টিনেজেরই বাবা! রডরিগোর সময়ে তিনি নিজেও কি এমন উদ্ভ্রান্ত, এমন অধৈর্য হননি?

'সবই বলছি মার্ট। সব কথা যতটা সম্ভব খুলে না বললে তোমার পক্ষে হয়তো পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া অসুবিধা হয়ে যাবে। এরপর যা বলব তার প্রতিটি শব্দ শুনবে, মন দিয়ে শুনবে, ওকে? নাউ লিসন...' তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা, দেওয়ালে খেলতে থাকা দুটি ছায়া আরও নিবিড় হয়ে ঝুঁকে বসল পরস্পরের দিকে। জুলাই মাসের আশ্চর্যরকম পরিষ্কার আকাশ। বৃশ্চিকরাশি স্পষ্টতই যেন চোখ মেলে তাকাল এই পিতাপুত্রের দিকে, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র তার সবটুকু আলো ঢেলে দিতে চাইল সেই গোলটেবিলটি ঘিরে। পাঁচ-শো বছর ধরে আবর্তিত এক বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলের চলন ধীর হয়ে আসতে লাগল।

'আগেই বলেছি বেথানিয়ার ঘটনা ঘটার সময় মিগুয়েল যথেষ্ট বৃদ্ধ। অনুতাপের আগুনে পুড়তে পুড়তে তিনি ভাবলেন যে এটা তিনি যেখান থেকে এনেছিলেন সেখানেই ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন। কিন্তু তখনই তাঁর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তিনি বুঝতে পারছিলেন যে আরেকটা লম্বা সমুদ্রযাত্রার ধকল তাঁর শরীর আর নিতে পারবে না। তা ছাড়া ফেরত কাকে দেবেন? কীভাবে দেবেন? এসব প্রশ্নও তাঁকে বিচলিত করছিল খুবই। আর তার থেকেও উদগ্র হয়ে উঠছিল তাঁর জিজ্ঞাসা, জিনিসটা আসলে কী? এমন কী জিনিস যার জন্যে খ্রিস্টধর্মের সর্বোচ্চ পদাধিকারী এত উতলা? কী সেই জিনিস যার জন্যে তাঁর পরিবারের ওপর নেমে এসেছে এই চরম অভিশাপ?'

এইখানে ফের থামলেন ফার্নান্দো। তারপর খানিকটা ইতস্তত করে বললেন, 'জানি তুমি এসবে বিশ্বাস কর না, তবুও বলি, গ্রিমোয়ার শব্দটা শুনেছ মার্ট?'

শব্দটা অবশ্যই শুনেছেন মার্টিনেজ। গ্রিমোয়ার মানে ব্ল্যাক আর্ট বা ব্ল্যাক ম্যাজিক সম্পর্কিত বই। বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র, তাবিজকবচ, শত্রুর ওপর অভিশাপ বর্ষণ, কারও আত্মাকে ডাকা, এসব সংক্রান্ত বই। এসব বইয়ে লেখা মন্ত্র উচ্চারণ করে নাকি দেবদূত, পরী, অপদেবতা বা স্বয়ং শয়তানকে ডেকে এনে বা নিজের অনুগত করে কার্যসিদ্ধি করা যেত। চার্চের চোখ এড়িয়ে এইধরনের বই চিরকালই পাওয়া যেত। আর গুটেনবার্গ ছাপার যন্ত্র বানাবার পর তো এই ধরনের বইতে ইউরোপ ছেয়ে গেছিল। তারপর যা হয়, ধর্মান্ধ জনগণের একাংশ চার্চের বারণ সত্ত্বেও নির্জনে বা একান্তে এইসব প্র্যাকটিস করতে শুরু করে। এইসব বিষয়ে অনেক অবিশ্বাস্য কাহিনি এখনও ইউরোপের পুরোনো পাবগুলোতে কান পাতলে শোনা যায়। মার্টিনেজ যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণেই এসবে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আজ সেসব নিয়ে তর্ক করার দিন নয়। তিনি নির্নিমেষ চোখে তাঁর বাবার দিকে চেয়ে রইলেন।

'আজ অবধি আমরা যেসব গ্রিমোয়ারের খোঁজ পেয়েছি, তার প্রায় বেশিরভাগই জাল। সবই সেযুগের অনামি কোনো-না-কোনো লেখকের উদগ্র কল্পনার ফসল। যদিও সেসব কল্পনার তারিফ করতে হয়, কিন্তু

দিনের শেষে সেসবই জাল গ্রিমোয়ার। আসল গ্রিমোয়ার বেশিরভাগই চার্চের কড়া তত্ত্বাবধানে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মিগুয়েলের সময় এইসব বিভিন্ন জাদুমন্ত্রের বইতে ছেয়ে গেছিল ইউরোপের প্রতিটি শহর।

বিবেকের দংশনে মিগুয়েল তখন জর্জরিত। প্রায়শ্চিত্তের জ্বালায় ছটফট করা আর নিজের বংশধারাকে অভিশাপের হাত থেকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর সেই বৃদ্ধ এই অভিশাপ থেকে বাঁচতে বিভিন্ন গ্রিমোয়ারের শরণাপন্ন হলেন। এইখানে বলে রাখা ভালো যে আজ অবধি যেসব গ্রিমোয়ারের কথা আমরা জানি বা শুনি, তার মধ্যে বেশিরভাগই জাল হলেও সব নয়। অন্তত তার কয়েকটির প্রাচীনত্ব নিয়ে তো সন্দেহের কোনো কারণই নেই। তারমধ্যে অন্যতম প্রাচীন গ্রিমোয়ারটির নাম হল দ্য কি অফ সলোমন, বা ক্ল্যাভিস সলোমনিস।'

ততক্ষণে বেশ রাত হয়ে এসেছে। ডিনারের সময় হয়ে এল প্রায়। নীচে বাগানের কোনো এক কোণা থেকে রটওয়েলারের চাপা গরগর আওয়াজ ভেসে এল, কিছু একটা দেখেছে বোধ হয়। আশ্চর্য উজ্জ্বল আকাশ আজকে, ঠান্ডাটা আজকে বোধ হয় একটু বেশি। হঠাৎ একটু শিউড়ে উঠলেন মার্টিনেজ, কোনো কারণ ছাড়াই।

'দাবি করা হয় যে এই কি অফ সলোমন নামের গ্রিমোয়াটি মহান রাজা সলোমনের নিজের হাতে লেখা। তিনি পৃথিবীর সর্বকালের জ্ঞানী রাজা বলে খ্যাত, ওয়াইজ অফ দ্য ওয়াইজেস্ট। সলোমনের লেখা হোক না হোক, বইটি প্রাচীন হিব্রু এবং তৎকালীন মধ্যপ্রাচ্যের আরব উপজাতিদের প্রাচীনতম তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে পরিপূর্ণ। বলা হয় যে এই বইয়ে উল্লিখিত কালাজাদু প্র্যাকটিস করতে পারলে স্বয়ং শয়তানকে বশ করা যায়, তাকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু হ্যাঁ, তার আগে নিজের সমস্ত কৃত পাপ স্বীকার করে শুদ্ধ হতে হবে।

কিন্তু যতটা সহজ ভাবা গেছিল, কাজটা ততটা সহজ নয়। বাজার ছেয়ে আছে জালি বইতে। শেষে মিগুয়েল খোঁজে পেলেন যে সিরিয়াতে এক আর্চবিশপের কাছে আসল বইটি আছে। এই আর্চবিশপের বাবা ছিলেন একজন শখের অভিযাত্রী, বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক জিনিস খুঁজে বার করতে তাঁর বিপুল উৎসাহ ছিল। অনেকদিনের পরিশ্রমের পর তিনিই প্রথম খোঁজ পান বইটির এবং সেইটিই বহু রৌপ্যমুদ্রা ব্যয়ে মিগুয়েল হস্তগত করেন। আর্চবিশপের ছেলে অবশ্য অনেক পরে তার একটি সংস্করণ বাইরে প্রকাশ করে, অবশ্যই আসল মন্ত্রগুলো বাদ দিয়ে। সেটাকেই আজ লোকে ক্ল্যাভিস সলোমনিস বলে চেনে।

যাই হোক। পনেরো-শো নব্বই সালের এক শনিবার, অমাবস্যার রাত। লিসবনের উপকণ্ঠে এক পরিত্যক্ত চার্চ সংলগ্ন প্রাচীন গোরস্থানে মিগুয়েল সেই ক্ল্যাভিস সলোমনিস নিয়ে শয়তানের সাধনায় ব্রতী হলেন। বইয়ের কথা অনুযায়ী যাবতীয় কর্তব্যকর্ম করে শেষ মন্ত্রটির উচ্চারণ করা মাত্র তিনি শয়তানের দর্শন পেলেন।'

'হো...হোয়াট?' নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না মার্টিনেজ। গোঁড়া এবং প্র্যাকটিসিং না হলেও ধর্মে ক্রিশ্চান তিনি। শয়তানের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা তিনি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। 'আর ইউ সিরিয়াস পাপাই? মিগুয়েলের সামনে শয়তান এসেছিল? স্যাটান হিমসেল্ফ?'

মাথা নাড়লেন ফার্নান্দো, 'নিজের ডায়েরিতে যা লিখে গেছেন মিগুয়েল, হুবহু তাই বলছি মার্ট। আমারও প্রথমে তোমার মতোই কথাটা বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু শয়তানের আগমন থেকে শুরু করে তারপর তার সঙ্গে মিগুয়েলের কথোপকথন যে হয় তা লিখে রাখা আছে। মিগুয়েলের ডায়েরির বিবরণ মতো শেষ মন্ত্রটির উচ্চারণ মাত্র উল্কাপাতের মতোই একটি আগুনে গোলা মিগুয়েলের সামনে এসে সশব্দে আছড়ে পড়ে এবং মিগুয়েল ছিটকে পড়ে যান। তারপর উঠে দেখেন যে তাঁর সামনে একটা আগুনের পিণ্ড মানুষের আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে, সেই শয়তান।'

'তারপর?' আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন মার্টিনেজ।

'তারপর যেটা লিখেছেন মিগুয়েল সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের। শয়তানের সঙ্গে ঠিক কী কথা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি দেননি। তার বদলে যেটা উনি লিখেছেন...দাঁড়াও তোমাকে পড়াচ্ছি।'

এই বলে উঠে যান ফার্নান্দো। বারান্দায় চুপ করে বসে থাকেন মার্টিনেজ।

এই তো কয়েক দিনের কথা। সেদিনই তো জন্মালো ছেলেটা। সারা বাড়িতে আনন্দের হুল্লোড় খেলে গেছিল। কমান্ডান্ট নিজে এসেছিলেন ছেলেকে দেখতে, স্বরাষ্ট্রসচিব স্বয়ং অভিনন্দন বার্তা পাঠান। আর সিসিলিয়া, আহা এখনও চোখ বন্ধ করলেই তার মুখের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পান মার্টিনেজ।

বুকের মধ্যে একটা প্রায় ভুলে যাওয়া ব্যথা তিরের মতোই এসে বিঁধল মার্টিনেজের বুকে। সিসিলিয়া মারা যাওয়ার পর দিশেহারা হয়ে গেছিলেন মার্টিনেজ। ভেবেছিলেন চাকরি ছেড়ে দেবেন। হাজার হোক জীবনধারণের জন্যে ভাজ পরিবারের কোনো ছেলেকে কোনোদিন ভাবতে হয়নি। কিন্তু চাকরি তাঁকে ছাড়েনি, কোনো মূল্যেই এমন সুদক্ষ কম্যান্ডোকে ছাড়তে সেনাবাহিনী রাজি ছিল না। সিসিলিয়াকে হারাবার দুঃখ ভুলতে মার্টিনেজ তিয়াগোকে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরেন, আর শিশু তিয়াগো মার্টিনেজকে। বুক ফেটে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মার্টিনেজের। আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর হু হু করে কেঁদে ফেললেন কম্যান্ডো সার্কেলে ইউরোপের ইস্পাত বলে খ্যাত মার্টিনেজ ভাজ।

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে দ্রুত চোখ মুছে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। পরক্ষণেই সামনের চেয়ারে এসে বসলেন ফার্নান্দো। ফার্নান্দো নিজেও খুব উত্তেজিত ছিলেন, নাহলে একটু চেষ্টা করলেই হয়তো ছেলের চোখের জল দেখতে পেতেন। কে জানে, হয়তো দেখতে পেয়েছিলেন, দেখেও দেখেননি। নিজের সন্তানের চোখে জল কে-ই বা দেখতে চায়?

একটি প্রাচীন ঝুরঝুরে বই নিয়ে এসে বসলেন ফার্নান্দো। তারপর অতি সন্তর্পণে কয়েকটা পাতা খুললেন। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'শোনো, কী লিখছেন মিগুয়েল।

'শয়তান অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ যাহা করিয়াছিস ইহা অতি উত্তম। ভোগ, লালসা, হিংসা এসবই আমার বড়ো প্রিয়, বড়োই ঈপ্সিত। তবুও কেন প্রায়শ্চিত্তের অগ্নিতে জ্বলিতেছিস? শোন মূঢ়, মৃত্যুর ওপর কাহারও অধিকার নাই, আমারও নাই, তোর পূজ্য ঈশ্বরেরও নাই। তবুও কেন উত্তরাধিকারীদের জীবনাকাঙ্ক্ষা হেতু এ-মতো বিচলিত হইতেছিস? তুই মূর্খ, তবুও তোর আরাধনা আমার সবিশেষ প্রীতিবর্ধন করিয়াছে, তাই তোর বাঞ্ছা পূরণ করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছি। শোন রে মন্দবুদ্ধি, যাহাকে তুই সপরিবারে হত্যা করিয়াছিস, তিনি তোর ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছিলেন। তুই তোরই ঈশ্বরের প্রীত্যার্থে তাহারই সেবককে হত্যা করিয়াছিস। মূর্তিভেদে কি ঈশ্বরভেদ হয় রে পাপমতি? তোদের ক্রুশও কি একটি মূর্তি নহে? এখন শোন, যে অভিশাপের কৃষ্ণচ্ছায়া তোর ও তোর পরিবারের ওপর উদ্যত হইয়াছে, উহা হইতে পরিত্রাণের কোনোই উপায় নাই। নিজ সন্তানের প্রতি অসীম স্নেহসঞ্জাত ক্রোধ হইতে সেই গাঢ়কৃষ্ণ অভিশাপের উৎপত্তি। আরেক পিতার নিজ সন্তানের প্রতি অসীম স্নেহসঞ্জাত সাহস ও আত্মবলিদান হইতেই একমাত্র ইহার নিবৃত্তি হইলেও হইতে পারে। কিন্তু উহা সহজ নহে, সেই শাপমোচনের পথ অতি দুরূহ, শানিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুরতিক্রম্য এবং দুর্গম।

শোন রে হীনমতি, এই শাপমোচন অত সহজ নহে। পাপের পূজায় বলিদান আবশ্যক, এই কর্মে তোর বংশধরদের অন্তত আরও তিন জনকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। শুধু আত্মোৎসর্গ নহে, জাগাইতে হইবে মৃতদের জগত, মহাক্রোধী দেবতাকে পূজার্চনার দ্বারা প্রসন্ন করিতে হইবে, অলৌকিক শক্তি দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে হইবে। উত্তরের হিমাঞ্চলাবৃত দেশের এক প্রাচীন সৌধের মৃত্তিকাগর্ভে এক লোহিত চর্মাবৃত মহাযোগী শেষ শয়ানে সমাহিত আছেন। আজ হইতে প্রায় দুই শত বৎসর পর তোর পরিবারে এক অতিসাহসী তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবে। তোর সেই উত্তরপুরুষ অসামান্য মন্ত্রসাধন দ্বারা সেই ক্রূরশ্রেষ্ঠ মহাযোগীকে মৃত্যুর অপর পার হইতে আহ্বান করিয়া আনিতে সমর্থ হইবে। সেই মহাযোগী পথ নির্দেশ করিয়া দিবেন এবং তদন্তে সেই মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষের প্রাণহরণ করিবেন। আজ হইতে আনুমানিক অর্ধসহস্র

বৎসর পর এই অভিশাপ প্রত্যাহৃত হইবে। তৎকালে মৃত্যুর সম্রাট তোর পরিবার হইতে শেষ শিকারটি সংগ্রহ করিয়া উর্ধ্বে নক্ষত্রলোকে প্রত্যাগমন করিবেন। সেইদিন তোর পাপের অন্তিম নিবৃত্তি হইবে।''

আমি ভীত হইয়া করজোড়ে বলিলাম, ''প্রভো, তিনটি আত্মোৎসর্গের উল্লেখ করিলেন, একবার উত্তরের হিমাঞ্চলাবৃত দেশে, আর এক বার অভিশাপ খণ্ডনকালে। কে সেই হতভাগ্য তৃতীয় জন?''

মহামহিম শয়তান যেন সহসা সহস্রাক্ষ হইয়া, তাঁহার সমস্ত ভীতিপ্রদ অগ্নিভ রূপ লইয়া ক্রূর হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, ''কেন, তুই!'' '

১৭৫৫। সেপ্টেম্বর। স্বিনভান লেকের ধার, হোলার, আইসল্যান্ড

সেপ্টেম্বর মাসের হিমশীতল সন্ধে। সমগ্র উত্তর গোলার্ধ যখন শীতের চাদর গায়ে টেনে নিচ্ছে, তখন পৃথিবীর এই প্রান্তে শীত যে শুধু জাঁকিয়ে বসেই আছে তাই নয়, তার কামড় মাংস ভেদ করে হাড়ে রীতিমতো কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে।

হবেই, মনে মনে ভাবলেন জর্জিনহো। উত্তর গোলার্ধ হলে কী হবে, জায়গাটা দরকারের থেকে অনেক বেশিই উত্তরঘেঁষা। আর তার ওপর এখন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এক হ্রদের ধারে। হ্রদের হিমশীতল জল ছুঁয়ে আসা বাতাস তাঁর যাবতীয় পোশাকের স্তর ভেদ করে তাঁর অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

দেশটার নামই আইসল্যান্ড, আক্ষরিক অর্থেই বরফের দেশ, হিম তুষারের রাজ্য। এখানকার আকাশের বুকে খেলে বেড়ায় বিচিত্র সব আলোর ভুলভুলাইয়া ম্যাজিক, লোকে তার নাম দিয়েছে অরোরা বরিয়ালিস। তার ওপর জায়গাটা আইসল্যান্ডের আরও উত্তরে, উত্তরমেরুর আরও কাছে। মে থেকে আগস্টের মাঝামাঝি অবধি এখানে সূর্য অস্ত যায় না। জর্জি অনেক ভেবেচিন্তেই সেপ্টেম্বর মাসটা বেছে নিয়েছে। এসব কাজ অন্ধকার ছাড়া হয় না, আগস্ট অবধি এই এলাকা আলোয় আলোকময়। তার ওপর সবে গ্রীষ্ম ঋতু শেষ হয়েছে, ফলে হ্রদে এখনও জল আছে, এই সেপ্টেম্বর মাসে এখনও নাব্য সেই হ্রদ, কিন্তু শীতের তীক্ষ্ণ নখরের তীব্রতা আরও বেড়ে উঠেছে সেই জল ছুঁয়ে আসা হাওয়ার কামড়ের থেকে।

জর্জিনহোর পিছনে ছিল লিওনার্দো। এই প্রবল ঠান্ডায় লিওনার্দোর দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার শব্দ শুনে সামান্য কৌতুক বোধ করছিলেন জর্জিনহো। ভাইটা আর মানুষ হল না! নেহাত দাদার তন্ত্রমন্ত্রের শক্তির ওপর অপার শ্রদ্ধা আছে তাই। নইলে পরিবারের সবার চক্ষুশূল এই কালাপাহাড়ি বড়ো দাদাটির এত ন্যাওটা হয়ে পড়ত না লিওনার্দো।

দু-জনের পরনেই শীতরোধক পোশাক, তবে তাতে শীত খুব একটা আটকাচ্ছে বলে দু-জনের কারোরই মনে হচ্ছে না, ওই মন্দের ভালো আর কী। অবশ্য দিনের এই সময়টাও শীতের কামড় শুরু হওয়ার মুখে, প্রায় সন্ধে হওয়ার কাছাকাছি। ক্ষীণ সূর্যের আলো এখনও রয়ে গেছে আকাশে। গ্রীষ্মের পর ছ-মাস এই এলাকা ডুবে থাকবে আঁধার রাত্রিতে। সেই আলো-আঁধারিতে লেকের অন্য পাড়ে এক প্রাচীন সৌধের অবয়ব দেখা যাচ্ছে। জর্জিনহো জানেন ওটা কি, ওখানে যাওয়ার জন্যেই তাঁর এখানে আসা।

হোলার চার্চ। মানে প্রাচীন হোলার চার্চ, এখন পরিত্যক্ত। নতুন হোলার চার্চ শহরের আরও মাঝখানে তৈরি হয়েছে। এই চার্চটি পরিত্যক্ত কেন হল সেটা জর্জিনহো জানেন, ভালো করেই জানেন। এবং সেইজন্যই সেদিকে আজকে যেতে চাইছেন তিনি। আর সঙ্গী করেছেন নিজের ভাইকে।

লিওনার্দো। নিজের থেকে প্রায় দশ বছরের ছোটো এই দুর্বল ভীরু ভাইটির প্রতি প্রায় অপত্যস্নেহ বোধ করেন জর্জিনহো। আজ ওকে আনা হয়তো ঠিক হয়নি। আজ হয়তো ও এমন অনেক কিছু দেখবে যা ওর দেখা উচিত নয়। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না জর্জিনহোর। আর কাকেই বা নিজের থেকে বেশি ভরসা করতে পারেন জর্জিনহো? এই দুনিয়ায় সেই জিপসি রমণী ছাড়া আর কাকেই বা এত ভালো বেসেছেন তিনি? আর এ ছাড়া আরও একটি কারণ আছে।

একদম ভেতরের জামার বুকপকেটে কতগুলো কাগজ এখনও সযত্নে রাখা আছে জর্জিনহোর। তাঁরই নিজের হাতে লেখা কতগুলো পাতা। কপি করা, বহু কষ্টে খুঁজে পাওয়া তাঁরই এক পূর্বপুরুষের লেখা ডায়েরির কয়েকটা পাতা থেকে কপি করা কয়েকটা পাতা। সেগুলো এক বার ছুঁয়ে মনটা স্থির করলেন তিনি। তারপর আড়চোখে এক বার লিওনার্দোর দিকে তাকালেন জর্জিনহো। যদি তাই হয়, ডায়েরিতে যা লেখা আছে যদি তাই-ই সত্যি হয়, তবে লিওনার্দোকে দেখেই মরতে চান জর্জিনহো, পৃথিবীতে আর কারও ওপর অত টান নেই তাঁর।

তা ছাড়া সেই জিপসি রমণী বলে দিয়েছিল না, জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য পালন করতে যাওয়ার দিনে নিজের ছায়াকে সঙ্গে রাখতে? লিও ছাড়া আর কে-ই বা আছে তাঁকে ছায়ার মতন অনুসরণ করে?

ছোট্ট নৌকোটা লেকের পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে লুকোনো ছিল। দুইজনে টেনে বার করলেন সেটা, তারপর জলে ভাসিয়ে চেপে বসলেন। তারপর দুইজনেই বইঠা ফেললেন জলের বুকে। সামনে জর্জিনহো ভাজ, পেছনে লিওনার্দো ভাজ।

২০১৬। ৬ অক্টোবর, পঞ্চমী, শুক্রবার। মুম্বাই

মুম্বাইতে নেমেই যেটা সবচেয়ে বিরক্তিকর লাগল মার্টিনেজের, সেটা হচ্ছে গরম আর আর্দ্রতা। এই অক্টোবর মাসেও উত্তর গোলার্ধের কোনো শহরে যে এত গরম আর বাতাসে এত জলীয়বাষ্প থাকতে পারে, ভাবতেই পারেননি মার্টিনেজ। যদিও তিনি অনেক আগেই শুনেছেন মুম্বাইয়ের কুখ্যাত ভিড় আর গরমের কথা, তবে শোনা কথা এক, আর তাকে প্রত্যক্ষ করা আরেক। ভুরু কুঁচকে এক বার ভারতবর্ষের প্রখর সূর্যের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর অ্যাভিয়েটর সানগ্লাসটা পরে নিলেন।

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জ ছাড়িয়ে একটু বাইরে আসতেই দেখলেন প্ল্যাকার্ড হাতে কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে, তারই মধ্যে এক খর্বকায় ভারতীয়ের হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'মিস্টার মার্টিনেজ ভাজ। ওয়েলকাম টু ইন্ডিয়া।' নীচে পর্তুগাল কনসুলেটের নাম। যাক, বেকার অপেক্ষা করতে হল না, স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন মার্টিনেজ। ভারতীয় লোকটি দৌড়ে এসে মার্টিনেজের লাগেজ নিয়ে নেয়। আগে এসবে অস্বস্তি হত মার্টিনেজের, পরে বুঝেছেন এই উপমহাদেশে বা তার আশেপাশের অঞ্চলে এটাই শিষ্টাচার। তার পেছন পেছন পার্কিং-এ এলেন তিনি। তারপর লোকটি একটি কালো রঙের মার্সিডিজের বুটস্পেসে লাগেজ রেখে পেছনের দরজা খুলে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়াল, অর্থাৎ সাহেব, পদার্পণ করুন! মার্টিনেজ ভেতরে আরাম করে বসতেই লোকটি চট করে ড্রাইভারের সিটে বসে স্টিয়ারিং-এ হাত দিল।

মুম্বাইয়ের কথা অনেক শুনেছেন মার্টিনেজ, যেকোনো পর্তুগিজ শিশুকেই তাদের ইতিহাসের কথা, প্রাক্তন সাম্রাজ্যের কথা পড়তেই হয়। এককালে পূর্বে পর্তুগিজ উপনিবেশের পত্তনের সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই শহর। ব্রিটিশদের সঙ্গে দু-এক-বার যুদ্ধও হয় পর্তুগিজদের, এই বন্দরনগরীর দখল নিয়ে। শেষে ষোলো-শো একষট্টি নাগাদ ব্রিটেনের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সঙ্গে পর্তুগালের রাজকুমারী ক্যাথারিন ডি ব্র্যাগাঞ্জার বিয়ে হলে সেই বিয়ের যৌতুকস্বরূপ মুম্বাইনগরী ব্রিটিশদের উপহার দেওয়া হয়। সামান্য হাসলেন মার্টিনেজ, এখন না হয় নাম হয়েছে মুম্বাই, এই শহরের পুরোনো নাম বম্বে, সেও পর্তুগিজদেরই দেওয়া। বম— বেইম, নিজের মনেই আওড়ালেন তিনি, পর্তুগিজে এর অর্থ ভালো উপসাগর। ভালো হোক, সবার ভালো হোক এই শহরে। ভালো কিছু করার জন্যেই তো এসেছেন মার্টিনেজ এখানে। ভালো হোক তিয়াগোরও। তিয়াগোর কথা মনে আসতেই বুকের বাঁ-দিকটা চিনচিন করে উঠল মার্টিনেজের।

বেঁচে আছে সে। এখনও। যদিও না বেঁচে থাকার মতোই। কোমাতে লোকজন বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে, মার্টিনেজকে তাই বলেছেন ডাক্তার, বেঁচে থাকবে ভেজিটেটিভ স্টেটে! ভেজিটেটিভ স্টেট, কথাটা মনে পড়তেই রাগ, অসহায়তা আর ক্ষোভ মিলে যেন বুকটা মুচড়ে দিল তাঁর। তাঁর সাগরছেঁচা ধন,

সাত রাজার ধন এক মাণিক, চোখের মনি তিয়াগো নিঃসাড় জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকবে তাঁর সামনে? তিনি বাবা হয়ে অসহায়ের মতন দেখবেন? চলে ফিরে বেড়াবেন, আনন্দ করবেন, হাসবেন, খাবেন ঘুরবেন? হয় না। এ কিছুতেই হয় না। ডাক্তাররা যা করার করুক, নিজে একটা চেষ্টা করবেনই মার্টিনেজ, দরকার হলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও। যা হয় হোক, নিজের ছেলেকে ওই অবস্থায় কিছুতেই দেখতে পারবেন না মার্টিনেজ, কিছুতেই না। মরতে হলে মরবেন, কিন্তু শেষ চেষ্টাটুকু করতে ছাড়বেন না। তাতে অন্তত ওপারে গিয়ে সিসিলিয়ার সামনে দাঁড়াতে পারবেন, ক্ষমা ভিক্ষা করার জায়গাটুকু অন্তত তাঁর থাকবে। বলতে পারবেন যে হ্যাঁ শেষ চেষ্টা তিনি করেছিলেন, নিজের সবটুকু দিয়েই করেছিলেন।

ফার্নান্দোর কাছে যদিও তিয়াগোর এতদিন বেঁচে থাকাটা শুভ সংকেত বলেই মনে হয়েছে, সে হোক না জীবন্মৃত অবস্থাতেই। 'আজ অবধি কেউ এতদিন বাঁচেনি মার্ট', এয়ারপোর্টে মার্টিনেজকে ছাড়তে এসে কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন তিনি। 'যখনই মৃত্যু নেমে এসেছে আমাদের ওপর, এসেছে কেউটের ছোবলের মতো, বাজপাখির ছোঁ-এর মতন। কাউকে মুহূর্তকাল সময় দেয়নি সে। সেখানে তিয়াগোর এতদিন বেঁচে থাকাটা খুবই ভালো কিছু ঈঙ্গিত দিচ্ছে। আমার মন বলছে তুমিই সেই লোক মার্ট, যার কথা লিওনার্দোর ডিক্লারেশনে আছে। ভাজ ফ্যামিলিকে তুমিই হয়তো রক্ষা করবে মার্টি।' বলে চুপ করে ছিলেন ফার্নান্দো। মার্টিনেজ জানেন কেন। সত্যিই যদি মার্টিনেজ সেই চিহ্নিত লোকটি হন, তবে এই হয়তো ফার্নান্দোর সঙ্গে মার্টিনেজের শেষ দেখা।

লিওনার্দোর ডিক্লারেশনে এমন একজনের উল্লেখ আছে যিনি অসমসাহসী, বীর যোদ্ধা এবং নিজ কর্মফল হেতু বিপুল পুণ্যের অধিকারী। তিনিই নাকি কোনো এক প্রাচ্যদেশীয় মহাপুরুষের সহায়তায় সেই অত্যন্ত দুরূহ কাজটি সমাপন করবেন, ভাজ পরিবারকে সেই মহাশাপ থেকে উদ্ধার করবেন। সময়টাও প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু তার বিনিময়ে সেই ভাজ বংশাবতংসকে উৎসর্গ করতে হবে নিজের প্রাণ! হালকা চালেই জিজ্ঞেস করেছিলেন মার্টিনেজ, 'কিন্তু পাপাই, আমার তো তেমন কোনো ভালো কর্মফল নেই। এমন কোনো পুণ্যকাজ করেছি বলে তো মনে পড়ে না আমার।' 'সে কি মার্ট? লোকের কোনো পুণ্য করোনি তুমি আজ অবধি? তাই বলতে চাও? এই যে এখানে আসার আগে অতগুলো শিশুর প্রাণ বাঁচিয়ে এলে তুমি, তার মতন পুণ্য কিছু আছে? খুন করলে ঈশ্বরের দরবারে তার শাস্তি আছে, আর অতগুলো প্রাণ বাঁচালে তার পুণ্যফল বলে কিছু থাকে না?'

জবাব ছিল না মার্টিনেজের কাছে। কিছুক্ষণ পর যখন চোখ তুললেন ফার্নান্দো, তখন তাঁর দু-চোখ জলে ভেজা, ধরা গলায় বললেন, 'আর যদি সেই বেতালের মুখোমুখি হওয়ার দুর্ভাগ্য তোমার হয় মার্ট, তবে তাঁকে প্রশ্ন করতে ভুলো না, এত মৃত্যু, এত কষ্ট, এত প্রায়শ্চিত্তের পরেও কি আমাদের দুর্ভোগ শেষ হয়নি? কতদিন থাকে পূর্বপুরুষের পাপের উত্তরাধিকার? কেন বইতে হবে আমাদের এই অভিশাপের জের? আমি চাই তুমি কাজ শেষ করে সুস্থ সবল ফিরে এসো মার্ট। আর যদি ফিরে নাও আসো, আমার কোনো দুঃখ থাকবে না। আমি জানব আমার ছেলে মহৎ কাজের জন্যে আত্মবলিদান দিয়েছে। আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ মার্ট। অ্যান্ড রিমেম্বার, আই লাভ ইউ।'

১৭৫৫। সেপ্টেম্বর । স্বিনভান লেক, হোলার, আইসল্যান্ড

নিস্তরঙ্গ হ্রদের জলে বইঠার ছপাছপ আওয়াজ ছাড়া আর বিশেষ কোনো আওয়াজ নেই এই বিশ্বচরাচরে। শুধু মাঝেমধ্যে মাথার ওপর উড়ে যাওয়া পাখিদের কর্কশ আওয়াজ ছাড়া। সন্ধে হয়ে এল, ওরা বাসায় ফিরছে। প্রায় হ্রদের মাঝামাঝি চলে এসেছেন দু-জনে, সন্ধে নেমে এসেছে অনেকটাই। ওপারের চার্চের প্রায় পুরোটাই দেখা যাচ্ছে এখন। মাথার উপর তারাভরা বিশাল আকাশ, আর তার সামনে নিশ্ছিদ্র নিরন্ধ্র জমাট অন্ধকার পাহাড়ের মতোই দিগন্তের অনেকটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে সেই চার্চ।

'জর্জি, কথাগুলো সত্যি, মানে এখনও অবধি যা যা বলেছ, সবই কি সত্যি?'

'আমি এ বিষয়ে একদম নিশ্চিন্ত লিও', দৃঢ়স্বরে উত্তর দেন জর্জিনহো, 'আর এতদিন ধরে এ বাড়িতে আছ, তোমার তো এগুলো আমার থেকে বেশি জানার কথা। প্রতিটি পুরুষে প্রথম সন্তানের মৃত্যু তো আর আজগুবি হতে পারে না। আশা করেছিলাম এটুকু তুমি বুঝবে।'

'কিন্তু... কিন্তু সেগুলো তো দুর্ঘটনাবশতও হয়ে থাকতে পারে জর্জি, বা দুর্ভাগ্যজনক সমাপতন। হতে পারে না?' যেন সমস্ত ব্যাপারটা থেকে কোনোভাবে যাবতীয় অলৌকিক ছোঁয়াচ অস্বীকার করতে পারলেই বাঁচে লিওনার্দো, এমনই আকুতি তার গলায়। হেসে ফেলেন জর্জিনহো, 'না লিও। এতগুলো ব্যাখ্যাতীত মৃত্যু কোনোভাবেই সমাপতন হতে পারে না। আর সে ব্যাপারে পাক্কা প্রমাণ আমার কাছে আছে। সেই প্রমাণ হাতে আসার পরই আমি এই কাজে নেমেছি।'

'কী প্রমাণ জর্জি?'

'মিগুয়েলের ডায়েরি।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকে দুই ভাই। গলানো সিসের মতন কালো হ্রদের জলে বইঠার ছপছপ আওয়াজ তুলে এগিয়ে যেতে থাকে ছোট্ট নৌকাটি।

মিগুয়েলের ডায়েরি এ পরিবারে প্রায় প্রবাদের মতন। সবাই জানে ডায়েরিটার ব্যাপারে, কিন্তু সেটা কোথায় আছে কেউ জানে না। শুধু জানে যে মিগুয়েলের সময় থেকেই ভাজ পরিবারের প্রথম সন্তানের নিহত হওয়ার দুর্ভাগ্যজনক কাহিনিটি শুরু হয়। মৃত্যুর আগের দিন মিগুয়েল ভাজ বলে যান যে তাঁর ডায়েরিতে এই অভিশাপ থেকে মুক্তির উপায় লেখা আছে, এবং তিনি এটি বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে রেখে যাচ্ছেন, যাতে কি না 'একমাত্র উপযুক্ত সময়েই ইহা ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকাশিত হয় এবং উপযুক্ত অধিকারীর পথপ্রদর্শক হইতে পারে।' ছোটবেলা থেকেই এ নিয়ে খোঁজখবর শুরু করে জর্জিনহোই। তখন থেকেই তার ব্ল্যাক ম্যাজিক, তন্ত্রমন্ত্র, অপদেবতার আরাধনা, গ্রিমোয়ার এসব নিয়ে প্রবল উৎসাহ। বলা বাহুল্য গোঁড়া ক্রিশ্চান ভাজ পরিবারে কেউই এসব ভালো চোখে দেখত না। কিন্তু অসম্ভব জেদি ছেলেটি তার লক্ষ্য থেকে একচুলও সরেনি। ধীরে ধীরে কৈশোরেই তার মধ্যে বেশ কিছু অতিপ্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশ ঘটে। সামান্য খ্যাপাটে, মুখচোরা এবং অসম্ভব গম্ভীর ছেলেটিকে এড়িয়ে চলতে থাকে সহপাঠীরা এবং কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষকরাও। এতে করেও চলে যাচ্ছিল যাহোক নাহোক। কিন্তু এক ক্রিসমাসের ছুটি হওয়ার আগের দিন তাদের এস্কোলা বা স্কুলে একদিন যা কাণ্ড ঘটায় সে, ভাবলে লিওনার্দো এখনও শিউরে ওঠে। তার পরেই ঘর ছাড়তে হয়ে জর্জিনহোকে, সেইদিনই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যায়।

লিওনার্দো তখন অনেক নীচু ক্লাসে পড়ে, জর্জিনহোর পড়ে সেকুন্দারিয়া, মানে উঁচু ক্লাসে, তখন তার বয়েস ষোলো।

সব ক্লাসেই কিছু বখাটে গুন্ডা গোছের ছেলে থাকে, কিন্তু জর্জিনহোর ক্লাসে এমন তিন জন ছিল, তাদের মূর্তিমান শয়তান বললে কম বলা হয়। রাস্তায় মারপিট করা থেকে শুরু করে গোপনে মাদক সেবন করা, পতিতালয়ে রাত কাটানো এসবই তাদের কাছে ছিল জলভাত। আর তাদের প্রিয় ব্যসন ছিল নিরীহ ছেলে ছোকরাদের একলা পেলে হেনস্থা করা। মারধোর থেকে শুরু করে জঘন্য মানসিক নির্যাতন, কিছুই বাদ যেত না। এমনকী নতুন শিক্ষকরা অবধি এদের সমঝে চলতেন। এদের বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি নালিশ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়লেও কোনোই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, কারণটা অবশ্য সহজেই অনুমান করা যায়। তিন জনের বাবাই ছিলেন শহরের বিত্তশালী ব্যবসায়ী বা প্রভাবশালী সরকারি কর্মকর্তা।

সারা স্কুলে শুধুমাত্র একটি ছেলেকেই সমঝে চলত তারা, জর্জিনহো। যদিও জর্জির সঙ্গে এদের কোনোদিন সেভাবে কথাকাটাকাটিও হয়নি। কিন্তু জর্জি নিজেও একে ভাজ পরিবারের ছেলে, তার ওপর প্রেত যত শয়তানই হোক না কেন, ওঝাকে সে সমঝেই চলে সচরাচর। জর্জির ভাই বলেই লিওর ওপরেও এরা

কখনো তেমন চড়াও হয়নি। লিওনার্দোও জর্জির পরামর্শ মতন এদের ত্রিসীমানায় থাকত না। কাণ্ডটা ঘটে ক্রিসমাসের ছুটি শুরু হওয়ার আগের দিন।

স্বাভাবিক ভাবেই স্কুল সেদিন প্রায় ফাঁকাই ছিল। এক জন শিক্ষক, এক জন অশিক্ষক কর্মচারী, দু-জন অভিভাবক আর গুটিকয় ছাত্র ছাড়া কেউই ছিল না। জর্জি স্কুলে গেছিল ধর্মতত্ত্ব আর জ্যোতির্বিদ্যার ওপর লাইব্রেরি থেকে দু-একটা বই আনতে। লিওনার্দোও যথারীতি দাদার সঙ্গী হয়। লিও স্কুলচত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আপনমনে। এমনসময়ে স্কুলের একদম পেছনের কোণার দিকে ক্লাসরুমটা থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ শুনে নেহাত কৌতূহল বশতই সেদিকে এগিয়ে যায় সে। ক্লাসরুমটার দরজা বন্ধ দেখে, এবং গোঙানির আওয়াজটা বাড়ছে শুনে একেবারে পেছনের দিকে জানালায় উপস্থিত হয় লিও, প্রায় টিকটিকির মতন দেওয়াল বেয়ে বেয়ে। জানালাটা সামান্য ফাঁক করে যে দৃশ্য দেখে লিও, সে দৃশ্য এখনও মাঝে মাঝে তার দুঃস্বপ্নে হানা দেয়। দেখে যে ওরই প্রিয় বন্ধু ভিসিয়েন্তেকে মাটিতে উপুড় করে পেড়ে ফেলেছে সেই মূর্তিমান তিন শয়তান। ভিসিয়েন্তের নিম্নাঙ্গের বস্ত্রটি ঘরের এককোণে লুটোচ্ছে, তার দুই হাত ধরে আছে সেই তিন শয়তানের এক জন, আরেকজন ভিসিয়েন্তের চুলের মুঠি ধরে মুখে কিছু একটা গুঁজে দেওয়ার চেষ্টারত। আর তৃতীয় জন? তারও নিম্নাঙ্গের বস্ত্র নেই, সে ভিসিয়েন্তের উলঙ্গ পশ্চাদ্দেশের ওপর ঝুঁকে বসে সেখানে কিছু একটা সজোরে প্রবিষ্ট করার চেষ্টা করছে! ভিসিয়েন্তের চোখে যে অসহায় কষ্টের দৃষ্টি দেখেছিল লিও, সেই দৃষ্টি শুধুমাত্র ডুবে মরার আগের মুহূর্তে মানুষের চোখে-মুখে দেখা যায়। কোনোরকমে, ঘাড়টা এদিকে বাঁকানোর ফলে লিওকে দেখতে পায় সে, আর ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরতে চায় তেমনই শরীরের শেষ শক্তি জড়ো করে লিওনার্দোর নাম ধরে চেঁচিয়ে ওঠে সে। আর সঙ্গেসঙ্গে সেই তিন মূর্তির মাথা এদিকে ফেরে। সেই তিন জনের চোখে ক্রূর জিঘাংসার যে অমানুষিক ছাপ দেখে লিও তাতে তার প্রাণ উড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রায় টিকটিকির মতোই দেওয়াল ধরে সে অন্য ধারে এসে পড়ে এবং দৌড় লাগায় স্কুলের মাঠের কোণাকুণি বরাবর, আর জর্জির নাম ধরে চেঁচাতে থাকে। কিন্তু বেশিদূর যেতে হয় না তাকে। 'ধর এই বেজন্মার বাচ্চাটাকে, যেন পালাতে না পারে' —বলতে বলতে একটা বলিষ্ঠ হাত এসে লিওনার্দোর ঘাড় ধরে শূন্যে তুলে ফেলে, 'এটাই সেই পাগলা জর্জির ভাইটা না? ভালোই হল বেচারি ভিসিয়েন্তেকে আর একাই তিন জনকে সুখ দেওয়ার কষ্ট করতে হবে না', হিসহিসিয়ে বলতে থাকে আরেকজন। মাটিতে নামাতেই একটা চড় এসে পড়ে লিওনার্দোর গালে, আর তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সে। লিওর চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাবে বলে পিছন ফিরেছে তারা, এমন সময় পেছন থেকে রূঢ় কর্কশ আদেশ ভেসে আসে, 'এই হারামজাদার দল। ওর গায়ে হাত দিয়েছিস, এত সাহস তোদের? সাহস থাকলে আমার মুখোমুখি হয়ে দেখ বেজন্মার বাচ্চারা, কুত্তার মতন পিটিয়ে যদি না মেরেছি...' সবাই একসঙ্গে পেছন ফেরে। সামনে দাঁড়িয়ে জর্জিনহো।

দাদাকে দেখে ভয়ে আঁতকে ওঠে লিও। হিংস্র নেকড়ের মতন ফুলে উঠেছে জর্জির শরীর। চোখ দুটো লাল, মাথার চুল উশকোখুশকো হয়ে উড়ছে। আর ঠোঁটের কোণে হাসি।

এই হাসিটাই যে কারও অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ডান দিকে সামান্য ঠোঁট বাঁকিয়ে অন্তরের যাবতীয় ক্রোধ, অশ্রদ্ধা আর ক্রূরতা যে দগদগে হাসিতে কারো বুকে গেঁথে দেওয়া যায়, আগে না দেখলে বিশ্বাস হত না লিওর। একধাক্কায় তাকে পাশে ঠেলে ফেলে দেয় এক জন। তারপর শিকারি কুকুরের মতন তিন দিকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পরে তারা। 'আজ তোকে বাগে পেয়েছি শয়তানের বাচ্চা, অনেকদিন ধরে সুযোগ খুঁজছিলাম তোকে হাতে পাওয়ার। আজ তোর সব শয়তানি আর কালাজাদুর শখ ঘুচিয়ে দেব শুয়ার' —বলতে বলতে তিন জন এগোয় জর্জির দিকে। ঠিক যেভাবে শিকারের দিকে এগোয় হায়েনার দল।

এরপর ঠিক কী হয় সেটা পুরোটা লিওর স্মরণে নেই। শুধু মনে আছে হঠাৎ করে জর্জির চোখ দুটো ভয়াবহ ভাবে উলটে যায়, মুখ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে দুর্বোধ্য মন্ত্রসমষ্টি এবং হাত দুটো এক আশ্চর্য

মুদ্রায় হাওয়ায় আঁকে অশনিসংকেত। আর সেই তিন মূর্তিমান পাপকে হঠাৎই যেন হাওয়ায় তৈরি ময়াল সাপেদের দল এসে শূন্যে তুলে ফেলে। আগেই স্নায়ু যথেষ্ট উত্তেজিত ছিল লিওর। এই অপার্থিব দৃশ্য দেখার পর স্বাভাবিকভাবেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

ঠিক কী ঘটেছিল সেটা পরে অবশ্য শুনতে হয়েছিল তাকে। ঘটনার সময় এক অশিক্ষক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তিনি এসে দেখেন তিনটি ছেলে উর্ধপদ হেঁটমুণ্ড হয়ে বাতাসে ঝুলছে। শুধু ঝুলছে না, শূন্যে ঝুলতে ঝুলতেই সারা স্কুল প্রাঙ্গন প্রদক্ষিণ করছে। প্রাঙ্গনের ঠিক মাঝখানে জর্জিনহো, তার ডান হাত সামনে তোলা, বাঁ-হাত দিয়ে ধরে আছে ডান হাতের কনুই। আর ডানহাতের কবজি থেকে তর্জনী অবধি অস্বাভাবিক নমনীয়তার সঙ্গে দ্রুত ঘুরে চলেছে। ছেলে তিনটির কিন্তু হুঁশ নেই, মৃতদেহের মতন তাদের হাতগুলো নীচে ঝুলছে, পা-গুলো কিন্তু টানটান, কে যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে ওপরে! যথারীতি ভদ্রলোক আঁ আঁ করে আর্তচিৎকার শুরু করেন। সেই শুনে দৌড়ে আসেন উপস্থিত শিক্ষকটি। তিনি প্রথমে এই কাণ্ড দেখে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েন। তারপর গলায় ঝোলানো ক্রুশ বার করে হাঁটু গেড়ে বসে বাইবেল আওড়াতে থাকেন।

পুরো ব্যাপারটা অবশ্য পাঁচ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়নি। এরপরই ছেলে তিনটেকে মাটিতে নামিয়ে লিওকে কোলে তুলে চম্পট দেয় জর্জিনহো।

সেইবার ভাজ পরিবারকে একটা বড়ো ধরনের ঝামেলায় পড়তে হয়। খুবই স্বাভাবিক ছিল ঝামেলায় জড়ানোটা, কারণ ছেলে তিনটি এরপর সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যায়। আইন অনুযায়ী জর্জিনহোর কপালে দুঃখ ছিল, কিন্তু ত্রাতা হয়ে দাঁড়ায় আরেকজন, ভিসিয়েন্তে। তারই সাক্ষ্যের জোরে বড়ো কোনো শাস্তির হাত থেকে বেঁচে গেলেও একবারে রেহাই পায় না জর্জি। তিন তিনটি প্রভাবশালী পরিবার তাদের এত বড়ো ক্ষতি মেনে নেবে, এটা ভাবার স্বভাবতই কোনো কারণ নেই। তারা তো পারলে জর্জিনহোকে ছিঁড়েই খায় কি জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। এমনকী তিন পরিবারে মিলে গুপ্তঘাতকও নিয়োগ করে বলে গোপনসূত্রে খবর পান অগাস্তিনহো। সে নিয়ে আবার মন্ত্রীপরিষদের কাছে নালিশ জানান তিনি। শেষে অশান্তি যখন চরমে উঠেছে, স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জনের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটার মিটমাট হয়। বিনিময়ে ভাজ পরিবারকে মেনে নিতে হয় যে ভূতপ্রেতের খপ্পরে পড়েছে তাদের ছেলে। যথারীতি চার্চ থেকে জর্জিকে এক্সরসিজ করার জন্যে ফতোয়া বেরোয়।

এক্সরসিজমও অবশ্য কম যন্ত্রণার নয় এবং দৈহিক অত্যাচারেরও শেষ থাকে না তাতে। দুর্বল শরীরের অনেকেই ওতে মারা যায়, অনেকেই পঙ্গু হয়ে পড়ে। এক্সরসিজমের পরেও সুস্থ সবল ভাবে বেঁচে থাকতে খুব কম লোককেই দেখা গেছে। তবে এত হ্যাপা পোয়ানোর আগেই এক রাতে বেশ কিছু টাকাপয়সা হাতিয়ে চম্পট দেয় জর্জি। সালটা সতেরো-শো ছত্রিশ।

ভাজ পরিবার ছেলে হারানোর কষ্টে থাকলেও একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। জর্জিনহো পরিবারের বড়ো ছেলে। স্মরণকালের মধ্যে এই প্রথম ভাজ পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান ষোলো বছরের গণ্ডি পার করেছে। যেখানেই থাকুক না কেন সে, নিশ্চয়ই বেঁচেবর্তে আছে। এই আশাতেই দিনাতিপাত করছিলেন জর্জি আর লিওর বাবা-মা, অগাস্তিনহো আর কাসান্দ্রা। তবে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে লিওনার্দোর ওপর। হাসিখুশি ছেলেটি ক্রমশ জেদি, ভীতু, কুঁড়ে ও ঘরকুনো হয়ে পড়ে।

আর তারও উনিশ বছর পর এই বছর মার্চের সন্ধ্যায় হঠাৎ ছদ্মবেশে জর্জির উদয়। কাসান্দ্রা প্রথমে চমকে গেছিলেন, তারপর বুকে জড়িয়ে ধরেন, বিহ্বল হয়ে পড়েন অগাস্তিনহোও। তারপরেই কয়েক জন বিশ্বস্ত কর্মচারীদের দায়িত্বে চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়ে রাখা হয় জর্জিকে। পঞ্চম জন মারা গেছেন দু-বছর আগে, এখন সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত প্রথম জোসেফ। প্রয়াত সম্রাটের আদেশ নাকচ করে নতুন আদেশ জারি করার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। গোপনে সেই ব্যবস্থাই করতে শুরু করেন অগাস্তিনহো। জর্জির

বয়েস এখন পঁয়ত্রিশ, লিও এখন পঁচিশ বছরের তরুণ। দাদাকে দেখে সব থেকে বেশি আনন্দ তারই হয়। সারাদিন ধরে সে পড়ে থাকে চিলেকোঠায়, শোনে এই ষোলো বছরে কী কী করেছে দাদা।

পড়াশোনায় জর্জির কোনোদিনই তেমন মন ছিল না। তার মন জুড়ে ছিল—তন্ত্রমন্ত্র জাদুবিদ্যা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির খোঁজ। বাড়ি থেকে পালিয়ে সে প্রথমে যায় বাভারিয়াতে। সেখানকার জঙ্গলে 'বুড়ো শয়তান' নামে খ্যাত এক বৃদ্ধ শামানিস্টের কাছে সে দানবমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করে। তারপর ফ্র্যাঙ্কোনিয়া আর স্যাক্সনি পেরিয়ে যায় অস্ট্রিয়ার উত্তরে মোরাভিয়াতে। সেখানে রাজপরিবারে এক জন ডাইনি রাজকন্যার বেশ ধরে অবস্থান করছিলেন, তাঁর সঙ্গে জর্জির আলাপ হয় এক বিচিত্র উপায়ে। সেই ডাইনির কাছে জর্জি শেখে শবসাধনা, শেখে মৃতদেহর মধ্যে নিজের আত্মাকে প্রবেশ করানোর বিদ্যা। তারপর সেখান থেকে তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে সে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে যায় হাঙ্গেরি। ততদিনে তার কাছে জমানো টাকা প্রায় শেষ। সেখানে প্রায় ভিক্ষা করে বেঁচে ছিল সে। শেষে এক পথচারীর কাছ থেকে কিছু টাকা চুরি করে সে পাড়ি দেয় ট্র্যানসিলভানিয়াতে।

ট্র্যানসিলভানিয়াতে এক জিপসি দলে ভিড়ে যায় জর্জি। ভালো ব্যবহার আর চমৎকার কথা বলতে পারার জন্যে অল্পদিনের মধ্যেই দলের কর্ত্রীর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে সে। সঙ্গে বংশগত ভাবে পাওয়া রূপ তো ছিলই। সেই মহিলার কাছেও বলকান অঞ্চলের এবং স্যাক্সন জনজাতির অনেক হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন জাদুবিদ্যা শেখে সে। শেখে পশুপাখির ভাষা, শেখে কেউটে সাপ আর জংলি নেকড়ে পোষ মানানোর মন্ত্র, শেখে সাপের বিষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষের প্রতিষেধক প্রক্রিয়া। আরও শেখে মানুষের ভাগ্য গণনা করার পদ্ধতি। সেই মধ্যবয়সি রমণী যত্ন করে জাদুর জগতের অনেক ঝাঁপি তার সামনে খুলে দেয়। শোনে জাদুবিদ্যা আর ব্ল্যাক আর্টের ওপর অসংখ্য বই এবং পাণ্ডুলিপির কথা, যার অধিকাংশই চার্চের আদেশে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। শোনে গ্র্যান্ড গ্রিমোয়ার বা রেড ড্র্যাগন, দ্য নেক্রোম্যান্সিয়া, ওয়েরা লিন্ডা, দ্য পিকাট্রিক্স ইত্যাদি জাদুজগৎ কাঁপানো বিখ্যাত গ্রিমোয়ার গুলির কথা। বদলে সেই জাদুকরীর কাছে নিজের কৌমার্যটুকু হারাতে হয় জর্জিনহোকে।

আর সেখানেই সে শোনে আইসল্যান্ডের এই হোলার অঞ্চলের কথা। শোনে ইউরোপের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে শক্তিশালী শয়তানের উপাসকের কথা। শোনে তাঁর লেখা সবচেয়ে অলৌকিক, সবচেয়ে রহস্যময়, সবচেয়ে ভয়ংকরী ডাকিনীবিদ্যার বইটির নাম। যে বইটির একটিই মাত্র কপি ছিল, এবং সেই অসীম শক্তিশালী তন্ত্রসাধকের মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে সেই বইটিকেও কবর দেওয়া হয়।

এরপর আজ থেকে পাঁচ বছর আগে জিপসির দল তাকে এক বসন্তের প্রারম্ভে ছেড়ে দেয় অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তানবুলের বাইরে। ছেড়ে দেওয়ার আগে সেই মধ্যবয়সি মহিলা বিদায়চুম্বনের পর একটি অদ্ভুত কথা বলেন, 'সিংহ রাশির উদয়কালে মঙ্গল ও রাহুর গ্রহযোগে তোমার জন্ম। আজ থেকে আর পাঁচটির বেশি বসন্ত দেখার সৌভাগ্য তোমার নেই। শুধু শুনে রাখো অনন্ত বিষাদের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে মহত্ত্বের সৌন্দর্য, কুটিল মরণের মধ্যেও শোনা যায় মুক্তির গাথা। মৃত্যুও তোমার পায়ে চুম্বন করার অপেক্ষায় ধন্য করবে নিজেকে। আর শোনো, জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য পালন করতে যাওয়ার দিনে নিজের ছায়াকে সঙ্গে রেখো।'

২০১৬। ৯ অক্টোবর, সপ্তমী, সোমবার। মুম্বাই

কনসুলেটের কাজ মেটাতে বিকেলই হয়ে গেল মার্টিনেজের। তাঁর আসল পরিচয় জানতেন শুধু কনসাল জেনারেল। তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। গোয়াতে ফ্লাইটেই যেতে পারতেন মার্টিনেজ, কিন্তু তিনি শুনেছেন কোঙ্কণ রেলপথের অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা। কাজেই তাঁর ইচ্ছেমতোই একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওখানে এখনও কিছু পর্তুগিজ প্রপার্টি

আছে, মুম্বাইয়ের কনসুলেটই তার দেখভাল করে। সেখানেই তাঁর থাকার ব্যবস্থাও করা আছে। এ ছাড়াও তাঁর ঘোরাফেরার জন্যে একটা গাড়ি সর্বক্ষণের জন্যে প্রস্তুত থাকবে, যেখানে বলবেন সেখানেই যেতে পারেন তিনি।

আমোনা নামের কোনো ভিলেজ আছে গোয়ার আশেপাশে? প্রশ্ন শুনে ভুরু কুঁচকোলেন কনসাল জেনারেল। তারপর ম্যাপ আনিয়ে দেখে জানালেন যে আছে তো বটেই। যেখানে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, সেই ক্যালাঙ্গুট বিচ থেকে তিরিশ চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, ঘন্টা খানেক কি ঘন্টা দেড়েকের রাস্তা। কিন্তু গোয়াতে এত দেখার জায়গা থাকতে হঠাৎ সেই অজপাড়াগাঁয়ে কেন? এনি স্পেশ্যাল রিজন?

'এমনিই', কাষ্ঠহাসি হেসে কনসাল জেনারেলের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে হয়েছে মার্টিনেজকে, 'জাস্ট ম্যাপে দেখছিলাম তাই আর কী।'

অফিস থেকে বেরিয়ে মেরিন ড্রাইভে যাওয়া মনস্থ করলেন তিনি। আসার আগে ইন্টারনেট থেকে দেখে এসেছেন মুম্বাইয়ের বিভিন্ন জায়গার ছবি। মেরিন ড্রাইভ তখনই নজর কেড়েছে তাঁর। ড্রাইভারকে বললেন সেদিকে গাড়ি নিয়ে যেতে। যেতে যেতে শহরটাকে দেখতে লাগলেন তিনি। ব্যস্তসমস্ত মানুষজন, যন্ত্রের মতন যে-যার কাজে চলেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ আড্ডা মারছে বা গল্পগুজব করছে দেখাই যায় না। তবে যেটা দেখে মার্টিনেজের বেশ ভালো লাগল, সেটা হচ্ছে বান্দ্রা ওরলি সি লিঙ্ক। প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সৌন্দর্যের মেলবন্ধন আগেও দেখেছেন তিনি। এই ব্রিজটির তারিফ করতে তাই আটকাল না তাঁর।

আধঘন্টা মেরিন ড্রাইভে সমুদ্রের ধারে বসে বেশ ভালো লাগল মার্টিনেজের। চমৎকার চওড়া ফুটপাথ। লোকে বসে আছে, ঘুরছে, বাচ্চারা খেলছে, কেউ কেউ গিটার বাজিয়ে গান গাইছে। বাঁধানো তীরভূমি আধখানা চাঁদের মতন বেঁকে গেছে। সমুদ্রের ওধারে মুম্বাইয়ের স্কাইলাইন। ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাই, তার সুউচ্চ বহুতল আর মহার্ঘ দ্যুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গরবিনী রানির মতন। আর সবচেয়ে যেটা ভালো লাগল তাঁর, বিদেশি বলে কেউ তাঁর দিকে অসভ্যের মতন হাঁ করে তাকিয়ে নেই, প্রাচ্যের অনেক দেশেই এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে তাঁকে পড়তে হয়েছে অনেক বার। স্বস্তিবোধ করলেন তিনি।

সন্ধ্যা নেমে আসছিল দ্রুত। আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে বাঁধানো রাস্তার একদম শেষে চলে এসেছিলেন মার্টিনেজ। রাস্তা শেষ হতেই ছোট্ট একটা বিচ। তাতে যেন কার্নিভ্যাল বসেছে। একই সঙ্গে এত মানুষ, এত আলো, এত রং, এত উল্লাস কমই দেখেছেন তিনি। বুড়ো, জোয়ান, শিশু, পুরুষ, মহিলা, বেলুনবিক্রেতা, কাচের চুড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা, রোস্টেড কর্ন থেকে শুরু করে লোকাল ক্যান্ডি আর স্ন্যাকসের দোকানে জায়গাটা জমজমাট। উলটো দিকে ফিরলেন তিনি। রাস্তা পার হবেন, তারপর ওদিকের রাস্তায় গিয়ে ডান দিকের ফুটপাথ ধরবেন, তিন চার কিলোমিটার পরেই কোথাও তাঁর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি গিয়ে ড্রাইভারকে কল করে নিলেই হল। সিগন্যালে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, এমন সময় পাশেই চোখ গেল তাঁর।

এক চল্লিশোর্ধ পুরুষ, মার্টিনেজের সমবয়সিই হবে প্রায়, ফুটপাথের ধারে একটা উঁচু স্টুলে বসে এক বছর দশেকের ছেলের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন, খুব সম্ভবত বাবা আর ছেলে। বাবা কানে কানে কিছু একটা মজার গল্প বলছে, আর ছেলে সেই শুনে হেসে গড়িয়ে কুটিপাটি।

ধক করে বুকে একটা শেল এসে বিঁধল মার্টিনেজের। সব ঠিক থাকলে আজ তিনি ফয়েসিয়া বা গুঁইশো বিচের ধারে বসে তিয়াগোর সঙ্গে এমনই মুহূর্ত কাটাতে পারতেন। তিনি তো আজ অবধি সজ্ঞানে কোনো পাপ করেননি। তবে কেন? তাঁকেই কেন তাঁর স্নেহপুত্তলিটির জন্যে এইরকম উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঘুরে বেড়াতে হবে? জায়গায় জায়গায় দরজায় দরজায় ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে? কী দোষ ছিল তাঁর? কী দোষ ছিল ওই দশ বছরের ছোট্ট শিশুটার? কবেকার কোন পূর্বপুরুষের পাপের দায় তাঁর ছেলেকে ভুগতে হবে কেন?

রাস্তার সিগন্যালের আলো পালটাতেই শোকে অভিভূত অন্ধের মতনই রাস্তা পেরোলেন মার্টিনেজ। তারপর ডান দিকে ঘোরার বদলে পথ ভুলে সোজা উলটোদিকের রাস্তায় ঢুকে পড়লেন। অক্টোবর মাসের

ভারতের উজ্জ্বল আকাশ মাথার ওপর। পূর্ব দিকের আকাশে তখন বৃষরাশির উদয় হচ্ছে, রোহিণী নক্ষত্র পূর্ণপ্রেমদৃষ্টিতে চাইলেন সদ্য উদয় হওয়া চাঁদের প্রতি। পশ্চিম আকাশে তখন শৌরি বা হারকিউলিস নক্ষত্রমণ্ডল। আর মাথার ওপর পূর্ব ও উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র দ্বারা বেষ্টিত পেগাসাস নক্ষত্রক্ষেত্র।

পেগাসাস উড়তে শুরু করল!

১৭৫৫। সেপ্টেম্বর । স্বিনভান লেক, হোলার, আইসল্যান্ড

ইস্তানবুলে তখন আপাতশান্তির আড়ালে ঘনিয়ে আসছে ক্ষয়িষ্ণুতার কাল। অটোমান সাম্রাজ্যের তখন বদ্ধতার সময়, শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত সুলতান প্রথম মেহমুদ। রাশিয়া তখন ইউরোপের নতুন উদীয়মান শক্তি। তাদের সঙ্গে লড়াই বেধেছিল সুইডেনের। সেই গ্রেট নর্দান ওয়রের সময় সুইডেনের পক্ষ নেওয়ার জন্যে, এবং পরাজিত সুইডেন সম্রাট দ্বাদশ চার্লসকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যে ইতিমধ্যেই অটোমান সাম্রাজ্য রাশিয়ার চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতন এই ক্ষীয়মাণ সাম্রাজ্যের শিরঃপীড়া হয়ে উঠেছে ইয়েনিসারি বা জ্যানিসারিদের বিদ্রোহ। এককালে যারা ছিল ইউরোপের দুর্দ্ধর্ষতম প্রতিরক্ষাবাহিনী, তুর্কী সাম্রাজ্যের সেরা অস্ত্র, আজ তারাই সম্রাটের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত!

এই গোলমালের মধ্যেই জর্জিনহো দৈবাৎ এক অসাধারণ মন্ত্রশক্তির অধিকারী ভারতীয় পুরুষের সাক্ষাৎ পায়। সেই ভারতীয় লোকটি তার বছর বিশেক আগে তুরস্কে এসেছিলেন ক্রীতদাস হিসেবে। তখন ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙনের মুখে, মারাঠা নামের এক হিন্দু শক্তি তখন অর্ধেক ভারতের অধীশ্বর। তারাই লুঠপাট করে, সমর্থ চেহারার মানুষজন ধরে বেঁধে বিদেশি দাসব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে বিপুল সম্পত্তি উপার্জন করেছিল। ভারতবর্ষের পূর্ব দিকের 'বাংগালা' নামের প্রদেশের বাসিন্দা এই মানুষটি তেমন করেই প্রথম যৌবনে মারাঠা দস্যুদের খপ্পরে পড়েন এবং আফগানি দাসব্যবসায়ীদের হাতফেরতা হয়ে ইস্তানবুলে আসেন। পরে এঁর বুদ্ধি ও ধীশক্তি দেখে এঁর মালিক এঁকে মুক্ত করে নিজের জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা করে দেন।

এই মানুষটি প্রাচ্যের যাবতীয় তন্ত্রমন্ত্র এবং জাদুকরী বিদ্যার আধার ছিলেন। অষ্টসিদ্ধি থেকে শুরু করে ভূতবন্ধন বা প্রেতকল্পে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এই মানুষটি। এ ছাড়াও চরাচরের সমস্ত ডাকিনীবিদ্যায় ছিলেন অদ্বিতীয় অতিরথ। কায়াধারণ থেকে শুরু করে নিজের আত্মাকে দেহের বাইরে নিয়ে যাওয়া, অন্যের জীবিত শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার অসামান্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। হাওয়া থেকে অদ্ভুত জিনিস সৃষ্টি করতে পারতেন, পারতেন নিজের শরীর হালকা তুলোর মতন করে ফেলতে।

জর্জির অধ্যবসায় দেখে তিনিই জর্জিকে পিশাচবিদ্যা দান করেন। এই পৃথিবীতে খুব কম লোকেরই যা অধিগত, শেখান সেই মৃতদের জগৎ জাগ্রত করার মন্ত্র। তবে এও বলেন যে জীবনে মাত্র এক বারই কেউ পারে এই ভয়ংকর কাজে ব্রতী হতে। এমনকী বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিতে প্রাণসংকট অবধি উপস্থিত হতে পারে।

জর্জিনহোর সমস্ত কথা তিনি শুনেছিলেন। জর্জি সমস্ত কথা জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। প্রিয় শিষ্যকে বিমুখ করেননি সেই শাস্ত্রবেত্তা, একদিন গোরস্থান গিয়ে বিশেষ তন্ত্রসাধনা করেন। তারপর ফিরে এসে জানান, যে অভিশাপ ভাজ পরিবারের ওপর আছে, তা খণ্ডন করা প্রায় অসম্ভব। কোটিকে গুটিক পারে, তাও ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ না হলে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি আরও নক্ষত্রবিচার করে বলেন উত্তরের হিমাবৃত দেশের এক মহাভৈরব সিদ্ধ পুরুষকে জাগানোর কথা। সেখান থেকেই নাকি চূড়ান্ত নির্দেশ আসবে।

বিদায় দেওয়ার দিন জর্জিনহোকে জড়িয়ে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন দেশে তিনি একটি ছোটো ভাইকে দেখে এসেছিলেন অপহৃত হওয়ার সময়। যদি সে বেঁচে থাকে, আজ নিশ্চয়ই সে জর্জিনহোর মতোই বড়োটি হয়েছে!

আজন্মকালের জন্যে তাঁর কেনা গোলাম হয়ে রয়েছে জর্জিনহো ভাজ!

চুপচাপ বইঠা বাইতে বাইতে কথাগুলো নিজের মনে ভাবছিল লিওনার্দো। আজ সে জানে জর্জি কারও টানে ভাজ পালাসেতেতে ফিরে আসেনি। ফিরে এসেছিল অন্য এক উদ্দেশ্য নিয়ে। আসার মাসখানেকের মধ্যেই সে লাইব্রেরি ঘরের গোপন ভল্টে আবিষ্কার করে মিগুয়েলের লুকোনো ডায়েরি, আজ অবধি যা কেউ চোখেই দেখেনি, আছে বলে শুনেছে শুধু।

সব কিছু পড়ার পর, সব কিছু জানার পর, জর্জি বুঝতে পারে মিগুয়েলের ডায়েরিতে উল্লিখিত সেই উত্তরের হিমাঞ্চলাবৃত দেশে মৃত্তিকাগর্ভে শায়িত 'লোহিত চর্মাবৃত' মহাযোগীর নাম কী। তাঁকে কেনই বা সেই জিপসি রমণী উল্লেখ করেছিল ইউরোপের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শয়তানের উপাসক বলে। কেনই বা ইস্তানবুলের সেই ভারতীয় তন্ত্রসাধক উত্তরের হিমাবৃত দেশের মহান মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষের কথা বলেছিলেন। এবং জেনেছিল সেই সবচেয়ে অলৌকিক, সবচেয়ে রহস্যময়, সবচেয়ে ভয়ংকরী ডাকিনীবিদ্যার বইটির নামও। যে বইটির একটিই মাত্র লিখিত রূপ ছিল, এবং সেই ভয়াল তন্ত্রসাধকের মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে বইটিকেও কবর দেওয়া হয়।

সেই মহাসিদ্ধ ঘোরভৈরব তন্ত্রপুরুষের নাম আজ জানে লিওনার্দোও, একটু আগেই জর্জি জানিয়েছে তাকে। জানে সেই অলৌকিক শক্তির ধারক গ্রিমোয়ারটির নামও, এও জানে কেন মিগুয়েলের ডায়েরিতে সেই অলৌকিক পুরুষের বিশেষণ হিসেবে 'লোহিত চর্মাবৃত' কথাটি বলা হয়েছে।

কারণ যে বইটি তার লেখকের সঙ্গেই সমাহিত করা হয়, সেই তন্ত্রচিহ্নধারী, শয়তানের মন্ত্রসিদ্ধ বইটির নাম হল রওডস্কিনা। ভাষাটা আইসল্যান্ডিক।

আর ইংরেজিতে এর নাম রেড স্কিন বা লাল চামড়া। লোহিত চর্ম।

আর সেই তন্ত্রবেত্তা মহাসাধকের নাম?

গটস্কলখ।

গটস্কলখ 'গ্রিমি' নিকুলসন।

২০১৬। ৯ অক্টোবর, সপ্তমী, সোমবার। মুম্বাই

রাস্তাটা চওড়া হলেও সামান্য অন্ধকার। সেটা আগে খেয়াল করেননি মার্টিনেজ। অন্ধের মতন রাস্তার ডান দিক ধরে সোজা হাঁটছিলেন। আশেপাশের জনস্রোত, তাদের বদলে যাওয়া প্রকৃতি, কিছুই লক্ষ্য করেননি। মাথার মধ্যে দপদপ করছিল ক্রোধ, কান্না আর যন্ত্রণা। মনে হচ্ছিল বুকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে নিজের হৃৎপিণ্ডটা যদি বার করে আনতে পারতেন এক বার... তিয়াগো.. ওহ তিয়াগো... এইভাবেই সারা জীবন একটা নির্জীব পদার্থের মতন বেঁচে থাকবে তাঁর ছেলে? রাত নেমে এসেছে এই মহানগরীর শরীরে, রন্ধ্রে রন্ধ্রেও বটে। খানিকক্ষণ পথ চলার পর সচেতন হলেন তিনি, পা দুটি ধীর হয়ে এল। তিনি জানেন না কতক্ষণ হেঁটে এসেছেন তিনি, কত দূর। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে তাঁর না থাকাই শ্রেয় ছিল। জায়গাটা একটা আলো-আঁধারি রাস্তা তেমাথা মোড়। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার ঠিক উলটোদিকে একটা সরু গলি। আকাশে সপ্তমীর বাঁকা চাঁদের ক্ষীণ আলো লুটিয়ে পড়েছে পিচের রাস্তায়। রাস্তার পাশের ভাঙা ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্পপোস্টের হলদেটে আলো যেন বিষাদের চাদরের মতন ছড়িয়ে আছে চারপাশে। চোখ তুলে মার্টিনেজ বুঝলেন যে জায়গায় তিনি এসে পড়েছেন সেখানে এই মুহূর্তে আসাটা তাঁর উচিত হয়নি।

সামনের গলিটার দু-পাশে অনেকগুলো ঘর। প্রতিটি ঘরের সামনে উজ্জ্বল রঙের দৃষ্টিকটু পোশাকে বসে আছে একদঙ্গল মেয়ে। তাদের রং মাখানো মুখ, উগ্র সাজগোছ, খিলখিল হাসি, উচ্চকিত আলাপ আলোচনা, বসার ভঙ্গি, এসবই বলে দিচ্ছিল ওরা কারা!

গলির মুখটায় আর চারিদিকে কাঠের গাড়ি, তাতে কিছু সস্তা খাবার বিক্রি হচ্ছে। মোড়ে একটা ছোট্ট দোকান, সামনে ঝুলছে রং-বেরঙের স্যাশে। সেখানে সিগারেট থেকে শুরু করে হরেক জিনিসের বিক্রি, তারস্বরে একটা রেডিয়ো চলছে। বাইরে থেকে আসা লোকজন মাথা নীচু করে একেকটা বাড়িতে ঢুকছে, আবার কেউ কেউ বেরিয়েও আসছে। এক জায়গায় ছোটো জটলা দেশি মদের উগ্র গন্ধে আর মৌতাতলোভী লোকেদের ভিড়ে নরকগুলজার হয়ে আছে জায়গাটা। মার্টিনেজ খেয়াল করলেন ইতিমধ্যেই তাঁর পাশে ঘনিয়ে এসেছে একটা লোক, তার নোংরা চেহারা, মলিন পোশাক-আশাক সবই বিবমিষা উদ্রেককারী। টলতে টলতে ফিসফিস করে সে বলল, 'ওয়ান্ট গুড কলেজ গার্ল স্যার? ফ্রেশ গার্ল স্যার, ভেরি ইয়ং, ভেরি চিপ।' স্থানীয় মদের কড়া গন্ধে মার্টিনেজের গা গুলিয়ে ওঠার উপক্রম হয়। তিনি মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাতের ঈঙ্গিতে লোকটাকে সরে যেতে বলতেই সে আরও গা ঘেঁষে আসে, শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে মার্টিনেজের জামার হাতা ধরে টানতে থাকে, 'টিপস সাহিব, টিপস। গিভ মি টেন ডলার...'

মার্টিনেজের ইচ্ছা হল টেনে একটা থাপ্পড় মারেন এই নোংরা ভিখিরির বাচ্চা বেশ্যার দালালটাকে। বহু কষ্টে মনের ইচ্ছা সংবরণ করে জামাটা ছাড়াবার জন্যে হাতটা শুধু এক বার সজোরে ঝাড়া দিতে লোকটা মাটি থেকে সামান্য উঁচু হয়ে ছিটকে পড়ে, মাথাটা সজোরে লাগে একটা ল্যাম্পপোস্টে ও স্থির হয়ে যায়।

মার্টিনেজ খেয়াল করলেন আশেপাশের দেওয়ালের গা ঘেঁষে থাকা অন্ধকারগুলো যেন একটু নড়ে উঠল। ইতিউতি জ্বলতে থাকা আগুনের বিন্দুগুলো একটু সচল হয়, দু-চারটে ছায়া উঠে এল এদিকে। বিদেশবিভুঁইতে কোনো ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ, স্থানীয় কনসুলেট বা দেশের টুর গাইড সেকথাই পই পই করে বলে দেয় বার বার। আর যে কাজটার জন্যে এসেছেন, তার আগে যথাসম্ভব ঝামেলা এড়িয়েই চলতে চাইছিলেন মার্টিনেজ। কিন্তু ঝামেলা নিজে থেকে ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে আর কী করা! ঘুরেই দাঁড়ালেন ইউরোপের ইস্পাত।

ঠিক সেই মুহূর্তে, সেই মুহূর্তেই ঝড়ের মতন একটা গাড়ি এসে থামল গলিটার মুখে। পাশের দরজা দুটো স্লাইড করে খুলে যেতে দু-পাশ থেকে দুটো করে মোট চারটে মোটাসোটা হুলিগান টাইপের লোক নামে পাথুরে রাস্তায়। না, শুধু তারা নয়, নামল একটা অল্পবয়সি মেয়েও।

মেয়েটা যে স্বেচ্ছায় আসেনি, সেটা না বললেও চলবে। গাড়ি থেকে টেনে নামানোর পর থেকেই তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে বাচ্চাটা। যাবে না, ওই গলির মধ্যে কিছুতেই যাবে না সে। ছটফট করছে মেয়েটা আর কাঁদছে। হাউহাউ করে কাঁদছে, বুক ফাটিয়ে কাঁদছে। ডান হাতটা দিয়ে নিজের বুক থাবড়ে থাবড়ে কাকুতিমিনতি করছে, পায়ে পড়ছে ওই চারটে লোকের। সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার। বলা বাহুল্য, চার জন মুশকো গুন্ডার কাছে এসব গা জোয়ারি কিছুই না। তার ওপর ভাবগতিক দেখে মনে হল এসব কাজ তাদের গা সওয়া। এক জন আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে সজোরে বায়ুত্যাগ করাতে সেই নিয়ে আবার হেসে লুটিয়ে পড়ল বাকি দু-জন। শেষের জনের হাতেই ধরা ছিল বাচ্চাটা, সে আবার এসবে ক্যাঁচরম্যাচরে বিরক্ত হয়ে সে সজোরে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল মেয়েটাকে। আঁক করে ওঠার সঙ্গেসঙ্গে মেয়েটার মাথাটা স্প্রিং এর মতন বাঁ-দিকে ঘুরে যায়, আর দৃশ্যটা দেখে চড়াৎ করে মাথায় রক্ত চড়ে যায় মার্টিনেজ ভাজের।

অনেক কষ্টে রাগ সামলালেন তিনি, যদিও ভেবে পাচ্ছিলেন না যে এই মুহূর্তে তাঁর কি করা উচিত। তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধি তাঁকে বলছিল এখান থেকে চুপচাপ কেটে পড়াই আপাতত ঠিক। পরে না হয় কনসুলেটের সাহায্যে পুলিশে একটা অভিযোগ...

ভাবতে ভাবতেই একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। মেয়েটা তাকে ধরে থাকা হাতটায় সজোরে একটা কামড় দিতেই লোকটা উঃ আওয়াজ করে হাতটা আলগা দেয়। আর সেইটুকু সময়ের মধ্যেই মেয়েটি পালাতে গিয়ে সোজা এসে মার্টিনেজের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, এতে একটু চমকেই যান তিনি। দ্রুত মেয়েটাকে দু-হাতে ধরে তোলেন, আর তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান

তিনি! যতটা ভেবেছিলেন তার থেকেও অনেক বাচ্চা হবে মেয়েটা। দশ কি এগারো। প্রায় তিয়াগোর বয়সি! মেয়েটাকে দাঁড় করিয়ে নিজের পিছনের দিকে ঠেলে দিলেন মার্টিনেজ। নাহ, ঝামেলাটা আর এড়ানো গেল না।

ইতিমধ্যেই টি-শার্ট, জিন্স আর স্নিকার্স পরা চার মূর্তিমান ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এদিকে। দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো ছায়াগুলো তাদের অনুসরণ করে তৎক্ষণাৎ। ছায়াদের কেউ একজন চেঁচিয়ে চার জনের দলের নেতাগোছের লোকটিকে বলে কিছু, আর তারপর রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা দালালটিকে দেখায়। নেতাগোছের লোকটি এগিয়ে এসে মার্টিনেজের থেকে ফুট তিনেক দূরে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়। কুতকুতে লাল চোখ, গলায় সোনার মোটা চেইন, চুইংগাম চিবোনো লোকটার সারা শরীর থেকে যেন ঔদ্ধত্য চুঁইয়ে পড়ছে। হোঁতকা কালো মুখে ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে লোকটা বলল, 'ইউ ইংলিশ? আই ইংলিশ। গিভ গার্ল। নো ফাইটিং। গার্ল ইজ বিজনেস। ইউ গো সি বিচ।' চোয়াল শক্ত করে সরু চোখে তাকিয়ে থাকেন মার্টিনেজ। লোকটা বোধ হয় বুঝতে পারে যে সাহেবের কথাটা ঠিক পছন্দসই হয়নি। সে আবার বলে, 'ইউ ফরেনার, নো ফাইটিং, নো ট্রাবল। উই কিং হিয়ার। গিভ গার্ল। গো ব্যাক। অর ইউ পে ডলার, এনজয় দ্য গার্ল।' স্থির চোখে সাপের চাউনি নিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকেন মার্টিনেজ আর সেই দৃষ্টি দেখে যেন হঠাৎ করেই হাসিটা উবে যায় তার মুখ থেকে। লোকটা নোংরা একটা মুখভঙ্গি করে চুইংগামটা থু করে ছুঁড়ে দেয় মার্টিনেজের মুখে, আর বেরিয়ে আসে অশ্রাব্য খিস্তি, 'নো হিয়ারিং বাস্টার্ড? ফাক ইউ অ্যাসহোল, মাদারফা...' একটা লোক যে শরীরের উর্ধ্বাংশ যৎসামান্য বাঁকিয়ে আর বাঁ-হাতটা মুখের কাছে এনে, সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে শরীরের ভারসাম্যটা বাঁ-পায়ের ওপর চালান করে দিতে পারে, আর পারে ডান পা-টা প্রায় পাঁচ ফুট তুলে দিতে, সেটা নেতাগোছের লোকটি আন্দাজই করতে পারেনি। অবশ্য আন্দাজ করে লাভও হত না একটুও। পাঁজরের ঠিক নীচে, পেটের একটু ওপরে অংশটাকে বলে সোলার প্লেক্সাস। মানব শরীরের যে যে জায়গায় আঘাত করলে মুহূর্তের মধ্যে শত্রুকে অকেজো করা যায়, তার প্রথম তিনের মধ্যেই এর নাম আসবে। আঘাতটা আসে ডায়াফ্রামের ওপর, এবং স্বভাবতই সেখানে সজোরে আঘাত করলে নিশ্বাস নেওয়াটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এসবই হ্যান্ড টু হ্যান্ড কমব্যাটের একদম গোড়ার দিকের কথা। লোকটার অবশ্য এসব জানার কথাও নয়। লাথিটা খাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে তার মনে হয় যেন একটা লোহার মুগুর তার ফুসফুসটা ফাটিয়ে দিয়েছে। পড়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে যে দৃষ্টিটা তার চোখে ঝুলে ছিল তার মধ্যে যন্ত্রণার সঙ্গে মিশে ছিল বেশ খানিকটা বিস্ময় ও ভয়। মরণান্তিক ভয়।

এরপরে স্বাভাবিকভাবেই বাকিরা তেড়ে আসে মার্টিনেজের দিকে। আর তারপর যেন একটুকরো ক্যারিবিয়ান হ্যারিকেনই উঠে এল মুম্বাইয়ের কামাথিপুরার বুকে। পুরো লড়াইটা শেষ হতে সময় লাগে ঠিক এগারো মিনিট। তারপর সেই ধ্বংসস্তূপের চারিপাশে যখন তাকালেন মার্টিনেজ, তখন এলাকা পুরো খালি। সটাসট বন্ধ হয়ে গেছে পান সিগারেট আর বাকি দোকানগুলো। যে মেয়েগুলো দরজার সামনে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে কাস্টমারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, তারাও অবস্থা বুঝে ঘরের মধ্যে সেঁধিয়েছে, জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে এদিকেই।

ভয়ে আতঙ্কে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বাচ্চা মেয়েটার নড়া ধরে দাঁড় করালেন মার্টিনেজ। তারপর মেয়েটাকে প্রায় টানতে টানতে পেছন ফিরে দৌড়তে থাকেন তিনি। বাচ্চাটাকে নিয়ে এক্ষুনি এখান থেকে পালাতে হবে তাঁকে, তাঁর মন বলছিল বড়ো একটা ঝামেলা বাধতে চলেছে বলে। দৌড়তে দৌড়তেই দু-একটা ট্যাক্সি থামাবার চেষ্টা করলেন তিনি, এবং তাদের এই দু-জনকে দেখেই দ্রুতবেগে উধাও হয়ে যাওয়া দেখে বুঝলেন খবরটা এই এলাকায় এর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে ভালোই। বাঁ-দিকে একটা বাঁক নিলেন মার্টিনেজ। এবার রাস্তাটা একটু চওড়া, দোকানপাট আছে। লোকজন একটু-আধটু তাকাচ্ছেও দু-জনের দিকে। ভাবখানা যেন, রেড লাইট এরিয়া থেকে সাহেব মেয়ে তুলে পালাচ্ছে নাকি? একটা ক্যাব যেন অন্ধকার ফুঁড়েই পাশে এসে দাঁড়াল মার্টিনেজের পাশে। সেদিকে এক বার তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন

তিনি, ক্যাবটা ভরতি। পেছনের সিটে প্যাসেঞ্জার বসে আছে। ‘সাহেব, কাম হিয়ার। আই অ্যাম হিয়ার টু হেল্প ইউ।’ থেমে পেছনে ফিরলেন উত্তেজিত, ঘর্মাক্ত মার্টিনেজ। ট্যাক্সিটাও তাঁর পাশে এসে থামে। পেছনের প্যাসেঞ্জারটি মুখ বার করেন, ‘কাম হিয়ার সাহেব, জলদি। উই ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম।’ এটা কি একটা ফাঁদ? হতেও পারে। কিন্তু ক্যাবের জানলা থেকে মুণ্ডু বার করে রাখা লোকটাকে দেখে তাঁর কী মনে হল কে জানে, মেয়েটাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে নিজের অত বড়ো শরীরটা নিয়ে ট্যাক্সির পেছনে সেঁধিয়ে গেলেন মার্টিনেজ।

১৭৫৫। সেপ্টেম্বর। স্বিনভান লেকের ধার, হোলার, আইসল্যান্ড

‘নিয়তির কী আশ্চর্য গতিপ্রকৃতি দেখ লিও, গটস্কলখ যে বছর মারা যান, ঠিক সেই বছরেই মিগুয়েলের জন্ম’, নিস্তরঙ্গ লেকে নৌকো বাইতে বাইতে বলে জর্জি। দাঁড় টানতে টানতে চুপচাপ শুনছিল লিও। আর মিনিট দশেকের মধ্যেই তারা পৌঁছে যাবে অপর পাড়ে। বিশাল অন্ধ পাহাড়ের মতন সেই প্রাচীন চার্চ এখন তাদের দৃষ্টিসীমার প্রায় অনেকটাই জুড়ে আছে। এক বার করে সেদিকে চোখ যাচ্ছে লিওর, আর বুকটা একটু করে দমে যাচ্ছে। বিশ্বচরাচরে আর কেউ নেই, কোত্থাও নেই। চারিদিকে নিরেট জমাট অন্ধকার যেন ভ্রুকুটি করে তাকিয়ে আছে এই দুই দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দিকে। সামনে সেই পরিত্যক্ত চার্চ, যেখানে গত দু-শো বছরে কেউ সাহস করে দিনের বেলাতেই পা দেয়নি, রাতের বেলায় আসা তো অসম্ভব! বরফ ঠান্ডা জলে ছোটো ছোটো ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে দশমীর বাঁকা চাঁদ। লিও-র মনে হল অত বড়ো চার্চটা যেন হাঁ করে আছে, তাকে গিলে খাওয়ার জন্যে। নেহাত জর্জি সঙ্গে আছে তাই...

‘গটস্কলখ ছিলেন আইসল্যান্ডের তো বটেই, সেযুগে ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম তন্ত্রসিদ্ধ অঘোরী উপাসক। এযুগেও তাঁর মতন প্রতিভা নিয়ে খুব কম লোকই জন্মেছে। হোলার চার্চের বিশপ ছিলেন তিনি। একজন খ্রিস্টীয় উপাসক হয়ে তিনি কী করে যে মন্ত্রসাধনা আর তন্ত্রবিদ্যায় আসক্ত হয়ে পড়লেন কে জানে! লোকে বলত তিনি নাকি যেকোনো পশু বা প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারতেন, পারতেন কিছুক্ষণের জন্যে কাউকে মেরে ফেলতে ও আবার বাঁচিয়ে তুলতে। লোকে বলে চার্চে তাঁর অধীনে যত শিষ্য ছিলেন, সবাইকেই তিনি তন্ত্রসাধনায় দীক্ষা দেন। ধীরে ধীরে হোলার চার্চে লোকজন প্রার্থনা করতে আসা বন্ধ করে দেয়, লোকজনের যাতায়াত কমে আসে। এখনও লোকে যেমন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে ভয় পায়, তখনও পেত, ফলে লোকটার নামে উলটোপালটা প্রচুর বদনাম রটানো হয়। গটস্কলখ নাকি রোজ রাত্রে ওয়্যারউল্ফ হয়ে ঘুরে বেড়াতেন আর অসতর্ক পথিক বা শিশুদের আক্রমণ করে তাদের কাঁচা রক্ত-মাংস খেতেন।’ এবার সত্যিই ঠান্ডা লাগতে শুরু করল লিওর। ‘লোকে বলে তিনি নাকি শয়তানের উপাসনা করতেন। ধীরে ধীরে তাঁর নামই হয়ে যায় নিষ্ঠুর গটস্কলখ।’

‘সত্যি?’ ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করে লিও।

‘শয়তান কাকে বলে লিও? সাধারণত তন্ত্রসাধকরা প্রকৃতির মধ্যেই অদৃশ্য ভাবে মিশে থাকা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করেন। অশিক্ষিত লোকজন তাকেই বলে শয়তানের উপাসনা। শয়তান বলে কিছুই নেই লিও। ইতিহাসের শুরু থেকে আজ অবধি মানুষের মনে যত অন্ধকার ইচ্ছা, যত গহীন আকাঙ্ক্ষা, যত গোপন পাপ, যত অব্যক্ত কামনা জমেছিল, বা জমে আছে, সেসবই পৃথিবীতে রয়ে গেছে লিও। আমাদের চৈতন্যের স্তরে স্তরে তার প্রতিটি পরত রয়ে গেছে, রয়ে গেছে আমাদের অস্তিত্বে আলজিভের মতন। তাকেই আমরা শয়তান বলে জানি, আমাদের মধ্যে মিশে থাকা অন্ধকার আমিটাকেই আমরা শয়তান বলে চিনি, জানি যে সে আছে। আর আমাদের সেই সম্মিলিত অবচেতনের গহীনে লুকিয়ে থাকা শয়তানকে যে বা যাঁরা একটি মাত্র রূপদান করে তাকে আহ্বান করতে পারেন, তাঁদেরই আমরা তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষ বলে জানি। গটস্কলখ তাঁর সাধনবলে এরও অনেক ওপরের স্তরে পৌঁছেছিলেন লিও। তিনি সেই ক্ষণজন্মা

পুরুষদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি শুধু যে ইচ্ছেমতো শয়তানকে আহ্বান করতে পারতেন তা নয়, শয়তানকে যিনি নিয়ন্ত্রণও করতে পারতেন!'

চুপ করে রইল লিও। তার মনে চলছিল বিচিত্র এক ছায়াখেলা। একদিকে আজন্মলালিত গোঁড়া ক্রিশ্চান সংস্কার, আরেক দিকে জর্জির হাত ধরে নতুন এক অজানা রোমাঞ্চকর জগতের উদ্ভাস। দুনিয়ার তাহলে সবটা যে শুধু সাদা আর কালো তা নয়, তাই না?

'আজ আমরা কী করব জর্জি?'

'গটস্কলখ একটি অসামান্য বইতে তাঁর আজন্মকাল সঞ্চিত জ্ঞান লিখে রাখেন। লিখে রাখেন মৃতদের জগত জাগানোর প্রক্রিয়া। লিখে রাখেন শয়তানকে আহ্বান করার যাবতীয় মন্ত্র, প্রক্রিয়াদি এবং বিশদ বিবরণ। বইটির মলাট ছিল নিহত এক মাদী শুকরের মন্ত্রসিদ্ধ চামড়া দিয়ে। লাল রঙে রাঙানো চামড়া দিয়ে বাঁধানো বইটি নাকি লেখা হয় কমন রাভেনের রক্ত, কুকুরির দুধ, আর বাদুড়ের মুখের লালা দিয়ে তৈরি কালিতে।' একটু চুপ করল জর্জিনহো। তারপর ফিসফিস করে বলে, 'লোকে বলে মৃত মানুষের কাটা আঙুল নাকি ব্যবহৃত হয়েছিল কলম হিসেবে। গটস্কলখ নাকি শুধু বলে যেতেন, আর সেই কাটা আঙুল নিজে নিজে পাতায় আঁচড় কেটে সেইসব লিখে যেত।'

স্তম্ভিত হয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে থাকে লিও!

'লোকে বলে বইটি নিজেও অসামান্য ক্ষমতার আধার ছিল। অনুমতিহীন অনেকেই বইটি ছুঁতে গিয়ে অভিশাপগ্রস্ত হয় বলে শোনা যায়। লেখকের অনুমতি ছাড়া অনধিকারী কেউই এই বইটি হাতে নেওয়ার সাহস করেনি কখনো। জনশ্রুতি অনুযায়ী তার নামই হয়ে যায় লাল চামড়া, বা রেড স্কিন। আইসল্যান্ডীয় ভাষায় রওডস্কিনা।

পনেরো-শো কুড়ি সালে যখন গটস্কলখ মারা যান, হোলার চার্চে তখন আর কেউ আসে না। তাকে শয়তানের আখড়া বলে ত্যাজ্য ঘোষণা করেছেন আইসল্যান্ডের আর্চবিশপ। তাঁরই আদেশক্রমে গটস্কলখেরই এক প্রিয় শিষ্য মৃতদেহের সঙ্গে তাঁর লেখা বইটিও একই কবরে সমাহিত করে। আর তার পর পরই এই চার্চ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। নতুন হোলার চার্চ এখন হোলার শহরের মধ্যিখানে। সেই থেকে এই চত্বরে কেউ পা রাখার কথা ভাবতেই পারে না।'

এইটি বলার সঙ্গেসঙ্গে ছোট নৌকোটি তীরে ভেড়ে। লাফিয়ে তীরে নামে জর্জিনহো এবং নৌকোটিকে টেনে ডাঙায় তোলে। তারপর লিও নামে নৌকো থেকে। তীরে দাঁড়িয়ে আগের প্রশ্নটাই ফের করে সে, 'আজ এখানে আমরা কী করতে এসেছি জর্জি?' নৌকোটা টেনে একটা বড়ো পাথরের পেছনে এনে ফেলে জর্জিনহো, একাই। তারপর সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে, অপার্থিব আলো-আঁধারির মধ্যে প্রায় মিশে যাওয়া জর্জির গলা থেকে সামান্য কৌতুকময় কথাটা ভেসে এল, 'আজ আমরা কবর থেকে গটস্কলখকে জাগাতে এসেছি লিও। জানতে এসেছি আমাদের পরিবারের ওপর ছেয়ে থাকা এই ভয়ংকর অভিশাপ থেকে মুক্তির কী উপায়। শয়তানেরও ওপরে প্রভুত্ব করা একমাত্র ইনিই আমাদের সঠিক রাস্তা দেখাতে পারেন।'

আতঙ্কটা লিওর বুকে পুরোপুরিভাবে চেপে বসার আগে ফিসফিস করে ফের বলে ওঠে জর্জিনহো ভাজ, 'এইটাই নিয়তির বিধান লিও, শয়তান এসে মিগুয়েলকে এটাই বলে গেছিলেন। আর আজ যা করতে এসেছি তাতে তুমি এমন অনেক অলৌকিক কিছু দেখবে, যা দেখে তোমার হুঁশ উড়ে যেতে পারে। সাহস রেখো লিও, যদি কিছু ক্ষতি হয় তো আমার হবে। তোমার গায়ে একটি আঁচড়ও পড়বে না, পড়তে পারে না, সে ব্যবস্থা আমি করে রাখব। আজ যা ঘটবে, তার প্রতিটি মুহূর্তের নিখুঁত বর্ণনা নিজের মগজে গেঁথে নিও তুমি। আজ রাত থেকে ভাজ পরিবারের রক্ষার একমাত্র উপায় তোমার কাছেই গচ্ছিত থাকবে মিস্টার লিওনার্দো ভাজ। কিপ ইট সেফ।'

২০১৬। ১০ অক্টোবর, অষ্টমী, মঙ্গলবার। মুম্বাই

জুহু বিচের একটা কোণায় অনেকক্ষণ বসে ছিলেন মার্টিনেজ। তাঁর মনে বিচিত্র আলোর খেলা চলছিল, চলছিল অবশ্য কাল রাত থেকেই। রাতেই মেয়েটিকে নিয়ে সটান নিজের কনসুলেটে চলে যান মার্টিনেজ। গিয়ে সেখান থেকেই পুলিশে ফোন করেন। সেই নিয়ে যথারীতি হুলুস্থুলু কাণ্ড বেঁধে যায় কনসুলেটের মধ্যেই। বিভিন্ন প্রোটোকলের গেরো পেরিয়ে যখন মেয়েটিকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়, তখন প্রায় শেষরাত বা ভোর। পুলিশ কমিশনার জয়ন্তী মুদলিয়ার কেসের গুরুত্ব বুঝে নিজে এসে উপস্থিত হন অকুস্থলে। খুব সম্ভবত নিজে মহিলা হওয়ার কারণেই খুব দ্রুত ব্যাপারটা মিটে যায়। তিনি নিজে মার্টিনেজের দু-হাত ঝাঁকিয়ে কনগ্র্যাচুলেট করে যান, 'গুড জব ডান, মিস্টার ভাজ। প্লিজ অ্যাক্সেপ্ট মাই সিনসিয়ার রিগার্ডস।' কনসাল জেনারেল বলা বাহুল্য এতে বিশেষ প্রসন্ন হননি, হওয়ার কথাও নয়। এসব ঝামেলা থেকে শতহস্ত দূরে থাকাই তাঁদের ট্রেনিং মোতাবেক শিক্ষা। মার্টিনেজ অবশ্য এসব চাপা অসন্তোষ বিশেষ পাত্তা দেন না। যা উচিত মনে করেছেন তাই করেছেন। বেশ করেছেন।

তাঁর পাশে বসে নির্বিকার মুখে ভেলপুরি নামের অত্যন্ত আনহাইজিনিক ইন্ডিয়ান স্ন্যাক্স খাচ্ছিলেন যে পাঁচ ফুট দু-ইঞ্চির টেকো ভদ্রলোক, তিনিই কাল মার্টিনেজকে ট্যাক্সিতে তুলে উদ্ধার করেন। সেই থেকে তিনি কেন কে জানে, মার্টিনেজকে ছাড়তেই চাইছেন না। রাত্রে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছিলেন, সকাল হতে না হতেই ফের এসে জুটেছেন।

এমনিতে লোকটার মধ্যে বৈচিত্র্যময় কিছুই নেই। অতি সাধারণ স্থূলোদর মধ্যবয়সি ভারতীয় শরীর। বয়েস পঞ্চাশের ওপরেই। পরনে হাফ স্লিভ শার্ট আর ট্রাউজার্স, সঙ্গে পায়ে একটা লেদারের তৈরি সস্তা লোফার্স। বাঁ-হাতে একটা প্রাচীন রিস্টওয়াচ আর মাথায় সুবৃহৎ টাক। মুখে সদাসর্বদাই একটা অমলিন হাসি লেগে রয়েছে। আর চোখে...

হ্যাঁ চোখে। লোকটার সারা বৈশিষ্ট্য ওই দুটো চোখেই যেন ফুটে উঠেছে। অমন ঝকঝকে, বুদ্ধিমান, খুশিয়াল আর অতলান্ত গভীর চোখ আর দেখেননি মার্টিনেজ। মেধা আর কৌতুকে যেন ঝকমক করছে চোখের মণি দুটি। শান্ত, ধীর, স্থিতধী সেই চোখ দুটির সামনে এসে নিজের অজান্তেই নম্র হয়ে পড়েন মার্টিনেজ। লোকটাকে তাই তাড়িয়ে দেবেন দেবেন করেও তাড়াতে পারেননি তিনি। অথচ লোকটার প্রায় কিছুই জানেন না মার্টিনেজ। লোকটা অত্যন্ত অদ্ভুত দেশীয় উচ্চারণে নির্ভুল ইংরেজি বলে। ব্যাকরণগত দিক থেকে এমন স্পষ্ট সঠিক ইংরেজি তিনি অদ্যাবধি গোটা ইউরোপ বা আমেরিকাতেও শোনেননি, ওভাবে কথ্য ইংরেজি আর বলাই হয় না। তার উপরে লোকটার আদবকায়দাও প্রায় প্রাচীন ব্রিটিশদের মতন, একটু নাটুকে। তবে সবমিলিয়ে লোকটাকে মোটামুটি ভালো না লেগে উপায় নেই। অল্প কিছু কথাবার্তা হয়েছে অবশ্য। লোকটা থাকে বম্বেতেই, যদিও এখানে ওর বাড়ি নয়। আসল বাড়ি ইন্ডিয়ার ইস্টার্ন পার্টে, বেঙ্গলে। 'বাড়ি তো অন্য জায়গায়, এখানে তাহলে কী করতে?' জিজ্ঞেস না করে পারলেন না মার্টিনেজ। 'পেটের ধান্ধায় সাহেব', অল্প হেসেছেন সেই ভদ্রলোক, চোখ দুটো ঝলসে উঠেছে কৌতুকে, 'একটা ওষুধ কোম্পানির সেলসে চাকরি করি, যাকে লোকে বলে বেচুগিরি। আপাতত এখানেই পোস্টিং।'

এরপর না হেসে পারা যায় না, হেসেই জিজ্ঞেস করেন মার্টিনেজ, 'একাই থাকো এখানে? বউ বাচ্চা?' 'তারা দেশে থাকে সাহেব। ইচ্ছে আছে আরও কিছু টাকা জমিয়ে দেশে ফিরে যাব। বিদেশবিভুঁইতে আর ভালো লাগে না।' বোঝেন মার্টিনেজ, মাথা নাড়েন, 'ক-টি সন্তান তোমার?' 'চার জন' একটু লজ্জিতই দেখায় নাকি লোকটাকে? 'চারটিই ছেলে।' 'হুমম, এইবারে বল তো চাঁদ, সেইদিন তুমি ওখানে কী করতে গেছিলে?' প্রশ্নটা করেই ফেলেন মার্টিনেজ, যে প্রশ্নটা তাঁর মনে কাল থেকেই ঘোরাফেরা করছে।

সশব্দে হেসে ওঠেন ভদ্রলোক, চোখে ঝলসে ওঠে বিদ্যুৎ। 'জানতাম সাহেব, তুমি এই প্রশ্নটা করবেই। তাহলে শোনো, কাল যে এলাকায় গেছিলে সাহেব, তার পাশেই আছে গ্রান্ট মেডিক্যাল কলেজ...

বাকিটা গুছিয়ে বলে লোকটা। গ্রান্ট মেডিক্যাল কলেজে নানা কাজকম্মে তার সেদিন রাত হয়ে যায় অনেক। এমনিতে গ্রান্ট মেডিক্যাল কলেজ থেকে মেরিন ড্রাইভে আসার একটা অন্য রাস্তা আছে। যে রাস্তাটা শর্টকাট, সেটাই সেই কুখ্যাত বেশ্যাপল্লির মধ্যে দিয়ে যায়। সেদিন নেহাত বাধ্য হয়েই শর্টকাটটা নিয়েছিল সে আর তারপর মার্টিনেজকে ওখানে দেখে হয়তো একটু কৌতূহল ভরেই দাঁড়িয়ে যায়। কাহিনির শুরুটা প্রায় পুরোটাই চাক্ষুষ করেছে লোকটা। মারামারি শুরু হতেই সে বোঝে যে গুরুতর একটা গণ্ডগোল হতে চলেছে। চট করে সে কোম্পানির টাকায় সারাদিনের জন্যে ভাড়া করা ক্যাবটা নিয়ে আড়ালে চলে যায়। তারপর পলায়মান মার্টিনেজকে অনুসরণ করে আসতে আর কতক্ষণ?

উপস্থিত বুদ্ধি দেখে তারিফ না করে পারেন না মার্টিনেজ। তবুও প্রশ্ন থেকেই যায়, ‘তুমি তো পালিয়ে যেতে পারতে, হঠাৎ আমাকে সাহায্য করার জন্যে দাঁড়ালে কেন?’ ঝকঝকে হাসিটা ধরে রেখেই মার্টিনেজের দিকে তাকায় লোকটা, এবং তাতেই যেন যা বলার বলে দেয়। এই প্রথম হঠাৎ করে মার্টিনেজ আবিষ্কার করেন যে এই লোকটার সমস্ত না বলা কথাও তিনি বুঝতে পারছেন, দু-জনের মধ্যে যেন একটা টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ আছে। যেন এই লোকটা তাঁর অনেকদিনের চেনা, বা যেন তাঁর জন্যেই লোকটা অনেকদিন ধরে অপেক্ষায় আছে। একটু মাথাটা ঠান্ডা হল মার্টিনেজের, কোথা থেকে যেন তাঁর বিক্ষুব্ধ চিত্তে একটা উদ্যমী সাহসের উদয় হল।

অনেকক্ষণ চুপ রইলেন দু-জনে। সামনে তখন ম্লান সূর্য জুহু বিচের ঘোলাটে জলে সিঁদুর গুলে দিয়ে অস্ত যাচ্ছেন। মুম্বাইতে সন্ধে নামে চট করে। দ্রুতই বিচে নেমে এল শত শহুরে রোশনাইতে ঝলমলানো সাঁঝ। তারই মাঝে সেই স্তব্ধতা পেরিয়ে যখন লোকটার পরের কথাটা বরফের শান্ত ছুরির মতন আছড়ে পড়ল, ইউরোপের ইস্পাতের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা অবিশ্বাস্য শিরশিরানিই নেমে চলে গেল যেন।

‘এইবার ঠিকঠাক করে বল তো সাহেব, কে তুমি? আর কেনই বা এখানে এসেছ? আর তোমার মাথার পেছনে কেনই বা মৃত্যুর কালো ছায়া ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সবসময়? তোমার শরীরের বাইরে তোমার আরেকটা ছায়াশরীর হাঁটছে, কে সে? আসলে কে তুমি?’

স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন মার্টিনেজ, কে এই লোক? এসব কথা কী করে বলছে? অভিশাপ, মৃত্যু, এসব তো এর জানার কথা নয়! তিনি তো কাউকে বলেননি তাঁর এদেশে আসার উদ্দেশ্য, এক ফার্নান্দো ছাড়া। কোনো ‘প্রাচ্যদেশীয় মহাপুরুষ’-এর খোঁজও করেননি, জুটলে নিজেই জুটবে ভেবে। কী বলছে এ লোকটা? তারপরেই তাঁর সন্দেহ হল, লোকটা বুজরুক, ধাপ্পাবাজ নয় তো? ভাবলেন, দেখা যাক, দেখাই যাক একটা চান্স নিয়ে, কত দূর এর দৌড়!

‘কী করে জানলে এসব তুমি? কে বলেছে তোমাকে?’

মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক, ‘আমি জানি সাহেব। আমি স্পষ্ট দেখছি মৃত্যুর বাজপাখি তোমার মাথার ওপর উড়ছে, যেকোনো মুহূর্তে তোমাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে। একটা কালো অভিশাপের ছায়া সবসময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। এবং এ জিনিস বড়ো সহজ জিনিস নয় সাহেব। হাজার বছরে এক বার কারো ওপরে এই অভিপাপ নেমে আসে।’

‘তুমি, তুমি কি তান্ত্রিক? ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান?’

‘বলতে পার, সাহেব। প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে যে শক্তি জড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে লতায়, পাতায় ও ফুলে, বাতাসে ও বৃক্ষে, জড়িয়ে আছে নদীতে ও পাহাড়ে, জড়িয়ে আছে প্রাণীজগৎ ঘিরে, তারই আরাধনা করি। তাকে তুমি তন্ত্র বললে আমি তান্ত্রিক তো বটেই। শোনো সাহেব, ওসব থাক, একটা কথা বলি মন দিয়ে শোনো। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি তোমার সঙ্গে আমার থাকা দরকার, খুব দরকার। আমাকে তুমি চলে যেতে বল না সাহেব, আখেরে তোমার মঙ্গলই হবে। এখন তুমি কে, কেন এসেছ সব কিছু খুলে বল তো দেখি।’

লোকটার বলার মধ্যে কী ছিল কে জানে, মার্টিনেজ চুপ করে রইলেন। না বলার কথা তাঁর মাথাতেই এল না। কিছুক্ষণ বাদে যদিও আগের প্রশ্নটাই ফের করলেন তিনি, 'কিন্তু কেন ব্রাদার, আমার ওপর এত দয়া কেন? আমাকে সাহায্য করার জন্যে এত উৎসাহ কেন তোমার?'

অন্ধকারে মুখ দেখা গেল না লোকটার, তারপর খানিকটা তিক্ত গলায় ভেসে এল এই কথাগুলো, 'আমাদের দেশ বড়ো আজব দেশ সাহেব। আমরা একদিকে নারীকে দেবী বলে পূজা করি, অন্যদিকে টাকার জন্যে তাদের পুড়িয়ে মারতে আমাদের হাত কাঁপে না। একদিকে নারী ভ্রূণ হত্যা করতে আমরা দ্বিতীয় বার ভাবি না, আবার আমরাই অন্য বাড়ি থেকে বাচ্চা মেয়েদের চেয়ে আনি কুমারীপুজো করার জন্যে। কাল তুমি বাচ্চা মেয়েটাকে উদ্ধার করে যা করেছ সাহেব, সে মহাপুন্যের কাজ। এখন আমাদের দেশজুড়ে দেবীপক্ষ চলছে সাহেব, জগন্মাতার বোধন চলছে। আমরা বলি দুর্গাপূজা। মায়ের পুজোর দিনে তুমি আরেক মা-কে নিজের জীবন বাজি রেখে উদ্ধার করেছ। মায়ের আশীর্বাদ তোমার ওপর থাকবে সাহেব, দেখে নিও। আর আমি যদি তন্ত্রবিদ্যা কিছুমাত্র শিখে থাকি, যদি পিতৃপুরুষের সামান্যতম আশীর্বাদও আমার সঙ্গে থাকে, যদি মহামায়া আমার ওপর বিন্দুমাত্র কৃপা করে থাকেন তবে আমি কথা দিচ্ছি, এই ব্রাহ্মণের শরীরে বিন্দুমাত্র প্রাণ থাকতে এই অভিশাপের ছায়া তোমার অঙ্গস্পর্শ করতে পারবে না।'

স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন মার্টিনেজ। এই কি সেই? সব কি মিলে যাচ্ছে? মিলে যাচ্ছে মিগুয়েলের ডায়েরির ভবিষ্যদ্বাণী? লিওনার্দোর ডিক্লারেশনের সতর্কবার্তা? তবুও এক বার বাজিয়ে দেখা দরকার, দরকার আরও সতর্ক হওয়ার।

'কিন্তু কেন? তুমি আমার জন্যে এত বড়ো ঝুঁকি নেবেই বা কেন ব্রাদার?'

'নিয়তি সাহেব, নিয়তি। ধরে নাও আমার তন্ত্রজ্ঞান আমাকে সেই শিক্ষাই দিয়েছে সাহেব। আজ সেইজন্যই নিয়তি আমাদের দু-জনকে একত্রে মিলিয়ে দিয়েছে। আরেকটা ব্যাপার কি জানো সাহেব?'

'আর কী?'

'একটা শিশুর জন্যে যে এত বড়ো ঝুঁকিটা নিতে পারে, তার বুকটা কত বিশাল সে আমি বুঝি। আমি এও বুঝি সেখানে কতটা ভালোবাসা থই থই করছে। জেনে রেখো সাহেব, ভালোবাসাই হল সবচেয়ে বড়ো তন্ত্র, সবচেয়ে বড়ো জাদু।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন মার্টিনেজ, 'এত কথা হল, তোমার নামটা কিন্তু জানা হল না এখনও যে।'

ক্ষণমুহূর্তের নৈঃশব্দ ভেঙে জবাব দিল লোকটা, 'তুমি আমাকে কৃষ্ণা বলেই ডেকো সাহেব। আমার নাম কে এন মৈত্র, পুরো নাম কৃষ্ণানন্দ মৈত্র।' বলে খানিকক্ষণ বাদে ফের মুখ খোলেন ভদ্রলোক, 'অবশ্য আমার আরেকটা নামও আছে। লোকে ডাকে আগমবাগীশ বলে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।'

১৭৫৫। সেপ্টেম্বর। প্রাচীন হোলার চার্চ, হোলার, আইসল্যান্ড

'ভয় পেও না লিও। যা দেখবে, যা শুনবে তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না, ভয় পাবে না। ভয় পেলেই কিন্তু মহাসর্বনাশ।' শুকনো পাতা মাড়িয়ে চার্চের চৌহদ্দিতে ঢোকার সময় লিওকে সতর্ক করে দিচ্ছিল জর্জি। তাতে যে লিও খুব ভরসা পাচ্ছিল তা নয়। কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞেস করে জর্জিকে, 'কী কী সর্বনাশ হতে পারে জর্জি? কী কী দেখতে পারি?' হেসে ফেলে জর্জি, 'মৃতদের জগৎ জাগাতে এসেছি লিও, খুব সাধারণ কিছু দেখবে বা শুনবে বলে আশা করছ কি? তবে তোমার ভয় নেই। আজ আমার দিন, গটস্কলখের আত্মার সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার দিন। তুমি শুধু সতর্ক থেকো। আর যা দেখবে যা শুনবে, মাথায় গেঁথে নিও।'

ঢোকার মুখেই বাঁ-দিকে একটা উঁচু মিনার। তার মাথায় চার্চের ভারী ঘণ্টা ঝোলানো থাকার কথা, কারণ ওটা বেল টাওয়ার। এখন টাওয়ারের সারা গা বেয়ে হাজারো সাপের মতন নেমে এসেছে লতাপাতা ও জংলি

গাছ। ঘণ্টার অবস্থাও নিশ্চয়ই সেরকমই, ভালো লিও। আকারে বিশাল এই হোলার চার্চ, যদিও স্থাপত্যের দিক দিয়ে লিসবনের পাড়ার চার্চও এর থেকে অনেক বেশি জাঁকজমকের। চারিদিকে পাথরের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, তার উচ্চতা ফুট দুয়েকের বেশি হবে না। মাঝখানে একটা চার্চের মূল বাড়ি, পেছন দিকে লম্বাটে হয়ে গেছে। প্রধান গেটের মাথায় বিশাল একটি ক্রুশ। আর দু-দিকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া ছাদ। সব মিলিয়ে এই। চার্চের ভেতরে ঢুকলই না জর্জি। লিওর হাত ধরে সোজা চার্চের দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে যেতে লাগল পেছন দিকে। যেতে যেতে চারিদিক লক্ষ্য করছিল লিও। ডান দিকে দূরদূরান্ত অবধি পাথরের ছোটো ছোটো টিলা ছাড়া আর কিছু নেই। মাঝে মাঝে সেখান থেকে বয়ে আসা শিরশিরে হাওয়া তীক্ষ্ণ বল্লমের মতো বুকে বিঁধছিল তার। নজরটা সে এবার বাঁ-দিকে ঘোরায়। চার্চের পাথুরে দেওয়ালে এখন জংলি বুনো ঘাস আর লতাপাতার রাজত্ব। অযত্নে আর অবহেলায় শেষ হয়ে গেছে গটস্কলখ 'গ্রিমি' নিকুলাসনের সাধের হোলার চার্চ। মাঝে মাঝে উঁচু জানালা, তার মধ্যে দিয়ে চার্চের ভেতরের ঘন অন্ধকার যেন নিষিদ্ধ তরলের মতন বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চার্চের দেওয়াল শেষ হতেই, ম্যাজিক!

জায়গাটা যে একটা সমাধিক্ষেত্র সে বোঝাই যাচ্ছে। সামনে রয়েছে ধাপেধাপে উঠে যাওয়া একটা ছোটো পাহাড়। চাঁদের আলোয় বোঝা যাচ্ছে যে লিওনার্দো ও জর্জিনহোর পায়ের নীচ থেকে শুরু করে পাহাড়ের প্রায় মাথা অবধি ছেয়ে আছে গোড়ালি অবধি ডুবে থাকা নরম ঘাসে। আর তার মাঝে মাঝে মাথা তুলে আছে ক্রুশকাঠ আর ছোটো ছোটো সমাধিফলক। এই এলাকায় বড়ো গাছ তেমন নেই। মাথার ওপর সেপ্টেম্বরের পরিষ্কার গাঢ় নীল আর কালোয় মেশানো আকাশ, ঝলমল করছে তারাদের জগৎ। যেন রাতের চাঁদোয়া ঝালরে হাজার হাজার হিরের কুচি বিছিয়ে দিয়েছে কেউ। ভারি মায়াময় নরম দশমীর চাঁদ পাহাড়ের প্রায় মাথা ঘেঁষে ঝুলে আছে। সামনে পিছনে আর কেউ নেই, কিছু নেই, কোত্থাও নেই। আহা, কী অনাবিল শান্তির মধ্যে মাটির নীচে ঘুমিয়ে আছে মৃতদের দল।

চার্চের ঠিক পেছনে একটা কুয়ো ছিল, বেশ উঁচু গোছের। তার মাথায় ছোট্ট একটা ছাউনি, তাতে কপিকল লাগানো। এত কাছে অত বড়ো হ্রদ থাকতে কুয়োর দরকারটা কী ভাবছিল লিও। এমন সময় জর্জির গলা ভেসে আসে, যেন লিওর মনের কথা ভেবেই বলে ওঠে সে, 'তন্ত্রসাধনায় সচরাচর মৃত্তিকাগর্ভের জলই ব্যবহার করা হয় লিও, বৃষ্টির জলের জন্যে অনেক বাড়তি শোধন প্রক্রিয়া দরকার হয়। গটস্কলখ নিজে এই কুয়ো খুঁড়িয়েছিলেন বলেই আমার বিশ্বাস। যদিও এসবের কোনো লিখিত প্রমাণ নেই, থাকার কথাও নয়। সে যাই হোক, এইবার তোমার কাজ লিও। ভালো করে দেখ কী করছি।'

এই বলে পোশাকের ভেতর হাত চালিয়ে একটা ছোটো শিশির মতন কী একটা বার করে আনে জর্জি। তারপর বার করে আনে কালো মতন বিশ্রী দেখতে একটা কিছু। 'ওটা কী জর্জি?' 'শকুনের পা।' লিও আর কিছু বলতে সাহস পেল না।

এরপর জর্জি যেটা করল সেটা অদ্ভুত। কুয়োর চারদিকে মাটিতে চারটে কী যেন আঁকল, আঁকল সেই শকুনের পা দিয়ে। আর প্রত্যেক বারই বিড়বিড় করে কী যেন মন্ত্র আবৃত্তি করল। তারপর উঠে দাঁড়ায়, তাকায় সেই পঞ্চমীর চাঁদের দিকে। দু-হাত ধরে সেই শিশিটা তুলে ধরে উচ্চৈঃস্বরে কী যেন বলতে থাকে সে, যার বিন্দুবিসর্গ লিওর বোধগম্য হয় না। খানিকক্ষণ পর হাত দুটো নামিয়ে আনে সে। তারপর শিশিটা খুলে ভেতরকার তরলটা খানিক হাতে নেয়, আর ফের বিড়বিড় করতে করতে কুয়োর চারিদিকে ছিটোতে থাকে। ফুরিয়ে গেলে আবার ঢেলে নেয়, আর এই কাজ চলতেই থাকে যতক্ষণ না শিশির ভেতরের সমস্ত তরল ফুরিয়ে যায়। এইভাবে কুয়ো থেকে প্রায় ফুট চারেক দূরত্বে সমকেন্দ্রিক একটি অদৃশ্য বৃত্ত তৈরি করে সে।

তারপর চারিদিক থেকে খুঁজেপেতে কতগুলো শুকনো কাঠি আনে জর্জি। চারটে কাঠি প্রথমে কুয়োর চারিদিকে পুঁতে দেয়, ঠিক যেখানে শকুনের পা দিয়ে কিছু এঁকেছিল সে। তারপর বাকি কাঠি গুলো কুয়োর চারিপাশে বৃত্তাকারে গুঁজে দেয়, ঠিক যে বৃত্ত ধরে সেই মন্ত্রপূত তরল ছিটিয়েছিল সে।

একটা রাতচরা পাখি কর্কশ আওয়াজ করে উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে।

'এদিকে এসো লিও', গম্ভীর গলায় ডাকে জর্জি। পায়ে পায়ে সেদিকে এগোতেই লিওকে দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধরে কুয়োর কাছাকাছি টেনে নেয় সে।

'এই যে বৃত্ত দেখলে, এর বাইরে যাবে না। যা খুশি হোক, দুনিয়া এদিক থেকে ওদিক হয়ে যায়, আকাশ খসে পড়ুক, হ্রদের জল ভীমবেগে জমিতে উঠে আসুক, ভূমিকম্প হোক, ধেয়ে আসুক দাবানল, কিছুতেই তুমি এই বৃত্ত ছেড়ে বেরোবে না। যতক্ষণ তুমি এর মধ্যে আছ, স্বয়ং শয়তানেরও সাহস নেই তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে। যত ভয়ংকর কিছুই তুমি দেখ না কেনো, নড়বে না আর এই সীমানার বাইরে পা রাখবে না। এই যে দেখছ চাঁদের আলোয় মাটিতে অল্প ছায়া পড়েছে কুয়োর, চেষ্টা করবে এই ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে। ছায়া সরে গেলে তুমিও সরে যাবে। যা বললাম মনে থাকবে তো?' ভীত মুখে মাথা নাড়ায় লিও। সেই দিকে খানিকক্ষণ স্নেহভরে তাকিয়ে থাকে জর্জি। তারপর খানিকটা যেন জোর করেই এগিয়ে যায় সামনে। লিও স্থির দাঁড়িয়ে থাকে।

খানিকটা এগিয়ে একটু পরিষ্কার জায়গায় দাঁড়ায় জর্জি। তারপর কিছু শুকনো কাঠি আর গাছের ডাল একত্র করে এবং সেই শকুনের পা দিয়ে একটা বর্গাকার ক্ষেত্র আঁকে মাটিতে। তারপর সেই কাঠকুটো গুলো স্তূপ করে রাখে সেই বর্গাকার ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যিখানেই। শুধু যে রাখে তা নয়। রাখে এক বিশেষ পদ্ধতিতে। প্রথমে তিনটি কাঠি দিয়ে একটি ত্রিকোণ বানায়। তার ওপরে একটি উলটো ত্রিকোণ বানায় আরও তিনটি কাঠি দিয়ে। এই প্রক্রিয়া ঠিক তিন বার করে সে। তারপর তার চারিপাশে একটি বৃত্ত আঁকে, এমনভাবে আঁকে যেন ওপর থেকে দেখলে মনে হয় ত্রিভুজের কোণগুলি বৃত্তের পরিধি ছুঁয়ে আছে। এরপর নিজের পোশকের ভেতর থেকে আরও বেশ কিছু সামগ্রী বার করে আনে জর্জি। শুকনো গাছের ডাল ছিল দুটি, তাদের ভেঙে সেই ত্রিভুজের মাঝখানে রাখে। তারপর বার করে আনে একটি ছোটো বাক্স, খুলে কিছু গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয় সেই গাছের ডালের মধ্যে। বাক্স থেকে বার করে আনে আরেকটি রুপোর তৈরি ছোটো লম্বাটে শিশি। তার মধ্যেকার তরল পুরোটাই ঢেলে দেয় সে সেই কাঠকুটোর মধ্যে।

আর তারপরে যেটা বার করল জর্জি, সেটাকে বলে স্ট্রাইকিং ফ্লিন্ট। এই দিয়েই এখন আগুন জ্বালানো হয়। অনেক কষ্টে সেই ফ্লিন্টের দুটো অগ্রভাগ ঘষে ঘষে আগুনের ফুলকি ফেলতেই জ্বলে উঠল সেই কাঠ ও ডালপালার স্তূপ। এরপর জর্জি দাঁড়িয়ে উঠে প্রদক্ষিণ করতে থাকে সেই অগ্নিকুণ্ড, আর বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকে। এরপর তাতে আহুতি দেয় শকুনের পা। তারপর তাতে ভেঙে কালো রঙের একটা ছোটো ডিমের মতন কিছু একটা।

এরপর যেটা করে জর্জি, তাতে ভয়ে বুকটা ঠান্ডা হয়ে যায় লিওর। হঠাৎ করে যেদিকে লিও আছে সেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়ে জর্জি, আর মুখ দিয়ে একটা উৎকট শিসের মতো আওয়াজ করে দু-হাত বাড়িয়ে কাকে যেন ডাকতে থাকে। করুণ কান্নার মতন সেই তীক্ষ্ণ আওয়াজ কে যেন লিওর কানের মধ্যে উগ্র চিতিসাপের বিষের মতোই ঢেলে দেয়। কী যেন একটা অপার্থিব ঘোর অমঙ্গলকর আছে ওই ডাকের মধ্যে। এক জন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ আর্তনাদ যেন ঘুরে বেড়াতে লাগল সমস্ত জায়গাটা জুড়ে। ঘাড়ের সমস্ত রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায় লিওর, বুকের ভেতরটা বরফ হয়ে আসে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কোথা থেকে যেন একটা কমন রাভেন উড়তে উড়তে আসে এদিকে, তারপর আগুনের ওপরে পাক খেতে খেতে ঘুরতে থাকে। দেখে অসম্ভব বিস্মিত হয় লিও। এত রাতে কমন রাভেনের তার বাসা ছেড়ে আসার কথাই নয়!

এদিকে দুটো হাত দু-দিকে বিছিয়ে দিয়েছে জর্জি। আর সেই শিস দিয়ে করুণ মৃত্যুর গান চলতেই থাকে। আস্তে আস্তে রাভেনটা ওড়ার বৃত্ত ছোটো করতে করতে নীচে নেমে আসে এবং শেষে জর্জির মাথার ওপর উড়তে উড়তে এক পর্যায়ে তার বাঁ-হাতে এসে বসে।

আর ঠিক তক্ষুনি ডান হাত দিয়ে রাভেনটাকে ধরে জর্জি। দ্রুতবেগে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে বাঁ-হাত দিয়ে অমানুষিক শক্তিতে রাভেনের মুণ্ডুটা একটানে মুচড়ে ছিঁড়ে আনে সে, আর রক্তটা ঢেলে দিতে থাকে সেই আগুনের মধ্যে।

কাজটা ঘটতে লাগে এক মিনিটের একটু কম সময়, আর এই নৃশংস দৃশ্যটা দেখে সাদা হয়ে যায় লিওর মুখ, ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে সে। এই কি জর্জিনহো? তার দাদা জর্জিনহো? আগুনের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে সম্পূর্ণ অচেনা লাগে জর্জির। এই নৃশংস, নিষ্ঠুর, ভাবলেশহীন চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটা কে? নিজের দাদার এমন ভয়ংকর রক্তখেকো রূপ দেখবে, স্বপ্নেও ভাবেনি সে। সে যদি জানত এখানেই শেষ নয়, তার আতঙ্কের তো সবে শুরু এখন!

এরপর জর্জি পকেট থেকে একটা দীর্ঘ ছুরি বার করে। বাঁ-হাতটা তুলে ধরে আগুনের ওপর, আর তারপর দীর্ঘ ছুরিটা চালিয়ে দেয় তালু বরাবর। টপটপ করে রক্ত পড়তে থাকে আগুনের মধ্যে আর সঙ্গে চলতে থাকে সেই অদ্ভুত ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ। আর দেখতে পারে না লিও। হাঁটু দুটো দুর্বল লাগে তার। মাটিতে বসে পড়ে সে।

খানিকক্ষণ পর আবার উঠে দাঁড়ায় সে। জর্জি বলেছে পুরোটা আজ তাকে দেখতে হবে, হুবহু গেঁথে রাখতে হবে স্মৃতিতে। তার হাতেই নাকি ভাজ পরিবারের এই অভিশাপ থেকে মুক্তির উপায়। আর আজ সে হেরে যাবে? পিছিয়ে যাবে লিও? সেই জন্যেই কি জর্জি ভরসা করে তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে এই দুরূহ কাজে? এই তার বুকের খাঁচা? জর্জির বিশ্বাসের প্রতিদান দেবে না লিও?

দেবে। অবশ্যই দেবে। উঠে দাঁড়ায় লিও।

ততক্ষণে আরও কতগুলো কাঠকুটো জুটিয়েছে জর্জি, তার মাথায় জড়িয়েছে একটা কাপড়ের টুকরো। তাই দিয়ে সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুন জ্বালিয়ে মশাল বানিয়ে জর্জি শুরু করে সেই সমাধিক্ষেত্রকে প্রদক্ষিণ করা! সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র আবৃত্তি করা তো আছেই। কিন্তু এবার শব্দগুলো এমন চেনা চেনা লাগছে কেন? আগের বারের উচ্চারণগুলো শুনে তো কিছুই বোঝেনি লিও! আরও খানিকক্ষণ শুনতেই লিও স্পষ্ট বুঝতে পারে কী আওড়াচ্ছে জর্জি।

বাইবেল!

এত ভয়ের আর আতঙ্কের মধ্যেও প্রথমে খুব অবাক হয়ে যায় লিও। এত তন্ত্রমন্ত্র অভ্যাস তাহলে কীসের জন্যে, যদি বাইবেলের শ্লোকই আওড়াতে হবে শেষে? জর্জি কি পাগল হয়ে গেল? আরও মন দিয়ে শোনে সে। তারপরই বিস্ময়ে আর ভয়ে তার হাতের সমস্ত লোম দাঁড়িয়ে পড়ে! জর্জি বাইবেল আওড়াচ্ছে বটে, কিন্তু সে অন্য বাইবেল! বাইবেলে শ্লোকে যেখানে যেখানে ঈশ্বরের প্রশংসা আছে, সেখানে সেখানে সে ঈশ্বরের জায়গায় শয়তানের উল্লেখ করছে। ঈশ্বরের আরাধনাকে জর্জি শয়তানের আরাধনার মন্ত্রে পরিণত করছে! সাপ যেমন বেদের বাঁশি শুনে স্থির হয়ে থাকে, ঠিক সেই ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল লিও।

আস্তে আস্তে সমগ্র দৃশ্যপটের মধ্যে কী যেন একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ করে লিও। কি সেটা ঠিক করে বোঝে না সে, শুধু মনে হয় চারিপাশ যেন সামান্য ঘোলাটে হয়ে গেছে, যেন একটু অপরিষ্কার। মনে হয় চারিপাশে যে পরিষ্কার দৃশ্যমানতা এতক্ষণ বজায় ছিল, তাতে যেন সামান্য অন্ধকারের পোঁচ লেগেছে। মানে আশেপাশের দৃশ্যগুলি আগের মতন অত উজ্জ্বল বা ধারালো নয়। শীতের মধ্যেও যেন খুব সামান্য হলেও সোঁদা জলীয়ভাব এসেছে চারিপাশে। আকাশের তারাগুলোও আগের মতন অত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না।

এই ব্যাপারটা ক্রমে একটু করে বাড়তেই থাকে। ক্রমশই যেন একটা বদ্ধ সোঁদা গন্ধ ছেয়ে ফেলে চারিদিক। দৃষ্টি যেন আরও অপরিষ্কার হয়ে আসতে থাকে লিওর, সব কিছু খুব ঘোলাটে মনে হয়। শুধু দূরে সেই অগ্নিকুণ্ড এখনও জ্বলছে আর জর্জির প্রদক্ষিণরত অবয়ব এখনও নজরে পড়ছে লিওর...

ভাবতে ভাবতেই তার সামনে ঠিক তিন থেকে চার ফুট দূরে একটা সমাধিফলক নীচের থেকে সামান্য নড়ে ওঠে!

পাথরের মূর্তির মতন আস্তে আস্তে ঘাড়টা ওপরে তোলে লিও। এতক্ষণ দেখেনি সে, মাটি থেকে দশ বারো ফুট ওপর থেকে একটা কালো পর্দার মতন ছায়াপুঞ্জ সমস্ত সমাধিক্ষেত্রের আকাশ দখল করে রেখেছে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার যে সেই ছায়াপুঞ্জ বড়ো সচল, মুহুর্মুহু তার আকার আকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে। বড়োই প্রাণবান ও চঞ্চল সেই ছায়াশরীর, যেন তার সক্রিয় চৈতন্য আছে, আছে রিরংসু একটি সত্তা। মাঝেমধ্যে সাপের ছোবলের মতন খানিকটা ছায়া বিদ্যুদ্বেগে নেমে আসছে জর্জির দিকে, কিন্তু বার বার সেই মশালের আগুন দেখে ফিরে যাচ্ছে ব্যর্থকাম হয়ে। আরও অনুভব করে লিও, যে সেই ছায়াপুঞ্জ ক্রোধে ফুটছে। অব্যক্ত ক্ষোভে রি রি করছে তারা। সেই হাহাকার করা নিষ্ফল ক্রোধে গুমরে গুমরে তারা কাতরাচ্ছে, চাইছে মৃত্যুর বিষ ঢেলে দিতে অব্যর্থ ছোবলে। কিন্তু প্রতিটি ব্যর্থ আক্রমণ বাড়িয়ে দিচ্ছে তার রোষ। তাদের সমস্ত স্নায়ু, সমস্ত অস্তিত্ব থেকে যেন ঝরে পড়ছে তীব্র বিষের নিশ্বাস...

মন্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে উঠল জর্জি, ‘হে ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ মহান গটস্কলখ, শয়তানেরও প্রভু জ্ঞানী গটস্কলখ, আপনি কি আমাদের মধ্যে উপস্থিত?’

উত্তরে লিওর সমস্ত চৈতন্য শিউরে তুলে, সেই ক্রুদ্ধ ছায়াপুঞ্জ থেকে ভেসে এল এক অশরীরী কর্কশ আওয়াজ, ‘ফিরে যা রে মূর্খ, সম্রাট ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে জাগাস না।’ জবাবে পোশাকের ভেতর থেকে কিছু গুঁড়ো বার করে আগুনের ওপর ছড়িয়ে দেয় জর্জি, তারপর আরও সোচ্চারে আওড়াতে থাকে বাইবেলের সেই বিকৃত শ্লোক। আকাশটা যেন লাল হয়ে আসে, রাতের অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পায় লিও। ঝড় আসছে নাকি? আশেপাশের একটি ঘাসও নড়ছে না। লিওর সঙ্গে প্রকৃতিও যেন দমবন্ধ করে দেখছে এই অত্যাশ্চার্য লড়াই। সেই ছায়াপুঞ্জ থেকে যেন জেগে ওঠে আর্ত কোলাহল, সহস্র কান্নার আওয়াজ যেন এই স্থানটিকে ঘিরে নাচতে থাকে। মার্বেল পাথরের গায়ে ছুরি দিয়ে আঁচড়ানোর মতন আওয়াজ তুলে হাহাকার ভেসে আসে, ‘ফিরে যা রে মূর্খ পথিক, সম্রাটকে জাগাস না। তিনি অনন্তশয্যায় শুয়ে আছেন, তাঁকে জাগাস না, জাগাস না, জাগাস না...।’

এমন সময়ে পায়ের তলার মাটি বীভৎসভাবে কেঁপে ওঠে। লিও পড়েই যেত, কুয়োর পাড় ধরে বসে পড়ে সে। তীরে ধাক্কা খেয়ে গর্জন করে ওঠে স্বিনভান লেকের জল, চার্চের গা থেকে খসে পড়ে কিছু পাথর আর টালি। পাঁচিলের একপাশ ধ্বসে ভগ্নস্তূপ হয়ে যায়। আর ঠিক সেই সেইসময় একটা বিকট গম্ভীর ‘গং’ শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে চারিদিক। হোলার চার্চের শতাব্দীপ্রাচীন ঘণ্টা এই ভূমিকম্পের ধাক্কায় বেজে উঠেছে!

ঠিক পনেরো সেকেন্ডের মাথায় ভূমিকম্প থামলে উঠে দাঁড়ায় লিও, এখন সে সমস্ত ভয় বা আতঙ্কের উর্ধ্বে। তার সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

এই বার সে দেখে যে এক রক্তবর্ণ ধূম্রপুঞ্জ আবির্ভূত হয়েছে, আবির্ভূত হয়েছে সেই কালো ছায়াশরীরের পিণ্ডগুলির মাঝখানে। আর তার দিকে দু-হাত উঁচু করে বলছে জর্জি, ‘হে মহান তন্ত্রবেত্তা গটস্কলখ, অন্ধকারের সম্রাট গটস্কলখ, এই অধমের অভিবাদন গ্রহণ করুন।’



জবাবে যেন যেই মেঘপুঞ্জের মধ্যে থেকেই কর্কশগম্ভীর স্বর ভেসে এল, ‘হে মানবসন্তান, তোমার ধীশক্তি ও মেধায় আমি প্রসন্ন। আজ অবধি এতদূর না কেউ পৌঁছতে পেরেছে, আর না কেউ পারবে। তন্ত্রের জগতে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করেছ তুমি। বল হে মানবপুত্র, কী জানতে চাও?’

১৭৫৫। অক্টোবর। ভাজ পালাসেতে

প্রবল শীতের কামড়ে এইবার পুরো ইউরোপ জবুথবু। স্তব্ধ দুপুরে চিলেকোঠার ঘরে বসে একাগ্রচিত্তে পার্চমেন্ট পেপারের ওপর খাগের কলম দিয়ে লিখে যাচ্ছিল লিওনার্দো। একমাসও হয়নি হোলার চার্চের সেই অভিযান থেকে ফিরেছে সে। ফিরেই অবশ্য ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সপ্তাহ দুয়েক যমে মানুষে প্রাণান্তকর টানাটানি গেছে। আজ তুলনায় একটু সুস্থ বোধ করছে সে। আর সেইজন্যই আজই বসেছে কাগজ কলম নিয়ে। স্মৃতিতে জাগরূক থাকতে থাকতে লিখে ফেলতে হবে, লিখে ফেলতে হবে সেদিন যা যা ঘটতে দেখেছে লিও। তারপর তাকে যত্নসহকারে লুকিয়ে রাখতে হবে যেখানে মিগুয়েলের ডায়েরি রাখা আছে সেখানে। ভবিষ্যতে যে উদ্ধার করতে আসবে ভাজ পরিবারকে, সেই বংশধরটির জন্যে সযত্নে সাজিয়ে রেখে যেতে হবে সব। নিজের উত্তরপুরুষদের প্রতি এই দায়িত্বটাই তাকে দিয়েছে জর্জি। দিয়েছে নয়, দিয়ে গেছে!

ধক করে বুকের ব্যাথাটা আবার চাগাড় দেয় লিওর, কিন্তু দমে না সে। কালির দোয়াতে খাগের কলমটা ডুবিয়ে তরতর করে লিখে যেতে থাকে।

দুপুরের গায়ে নেমে আসে বিকেলের আঁচল। সোনালি নরম রোদ লুটিয়ে পড়ল ভাজ পালাসেতের বাগানে, বারান্দায়। আকাশের নীল থেকে চোখ সরে না, এতই মায়া জড়িয়ে আছে সেখানে। মাঝে মাঝেই লেখা থামিয়ে সেদিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকছিল লিওনার্দো।

সন্ধের মুখে পরিচারক এসে ফায়ারপ্লেসে আগুন দিয়ে যেতেই একটু ওম বাড়ে, তাতে বেশ আরাম বোধ করে লিও। লিখতে লিখতেই থেমে যায় মাঝে এক বার, তারপর ফের চালু হয় তার কলম,

‘অতঃপর সেই রক্তবর্ণ মেঘপুঞ্জ থেকে উচ্চারিত হইল, ‘হে মানবপুত্র, বল কী জানিতে চাও?’

জর্জিনহো আভূমি প্রণত হইয়া অভিবাদন করিয়া কহিল, ‘হে প্রভো, সবই তো আপনার অবগত। ইহাও আপনার অবিদিত নহে যে কোন নিয়তিনির্দিষ্ট হইয়া এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছি। হে প্রভু, অদ্য অনুরোধ এই যে, দুই শত বৎসর ব্যাপী যে অভিশাপ আমাদিগের পরিবারের উপর পক্ষ বিস্তার করিয়া আছে, উহার স্বরূপ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া অধমকে বাধিত করুন। অতঃপর উহা হইতে পরিত্রাণের পথ নির্দেশ করিয়া এই অধমকে চিরন্তন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করুন।’

সেই মেঘপুঞ্জ হইতে ধ্বনি নির্গত হইল, ‘শোন হে মানব। যাঁহাকে সপরিবারে ধ্বংস করিয়া তোমার পূর্বপুরুষ এই অভিশাপের করালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের অনুগৃহীত এক মহাশক্তিধর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কাছে রক্ষিত যে বস্তুটির জন্যে এত বীভৎস রক্তপাত, এত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, সেটি একটি অসামান্য দৈবী শক্তির আধার, উহার নাম সৃষ্টিবিন্দু। উহা পৃথিবীর আদিতম শক্তির ভাণ্ডার, আদিমতম শক্তির জন্মচিহ্ন। উহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, সৃষ্টি নাই, লয় নাই। সৃষ্টির প্রথমে যখন স্থান ও কাল কিছুই ছিল না, চৈতন্যের আদি ও অন্ত ছিল না, তৎকালে ঈশ্বরীয় ইচ্ছায় অকস্মাৎ সময় ও শক্তির উদ্ভব ঘটে। সেই আদিশক্তির উৎস বীজাকারে এই সৃষ্টিবিন্দুতে সন্নিহিত আছে। যে পরাশক্তি ও অপরাশক্তি যুগ্মভাবে এই সৃষ্টির প্রাণ ও চৈতন্য আনয়ন করিয়াছে, উহারা দুইটি ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ সর্পের আকারে এই দৈবী খণ্ডের মধ্যে যোগনিদ্রায় শায়িত। উহাদের জাগ্রত করিলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, ঈশ্বরীয় ত্রাসদল সংহারমূর্তি ধরিয়া এই জগতকে গ্রাস করেন। আদিকাল হইতে জ্ঞানী ঋষিরা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রাপ্তিপূর্বক এই শক্তিবিন্দুটিকে লোকচক্ষু হইতে সুরক্ষিত রাখিবার প্রযত্ন করেন। সেই হেতু শতাব্দীপ্রাচীন আধিদৈবিক

তন্ত্রমন্ত্রাদি দ্বারা উহাকে আচ্ছাদিত করেন, উহাকে স্থায়ী যোগস্থিতিতে নিবিষ্ট করেন। তোমাদিগের সেই পূর্বপুরুষ স্বীয় ক্ষুদ্র বাসনা পূরণের নিমিত্ত এই যোগস্থিতি বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়েন, অকারণ নিষ্ঠুরতার সহিত কয়েকটি নিরীহ মানুষকে বধ করেন। সেই হেতু অসহ ক্রোধাগ্নিতে উন্মত্ত হইয়া এই ভয়ানক নরকাভিশাপ প্রদান করেন সেই অসামান্য শক্তিধর পুরোহিত। অভিশাপ প্রদানকালে অন্য কোনো আধার অনুপস্থিত থাকিতে তিনি নিজ পুত্র হনন সঞ্জাত যাবতীয় ক্রোধ উপস্থিত নরকরাজ বেতালের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। সেই হইতে মৃত্যুর রাজা অদ্যাবধি তোমার পরিবারের প্রথম পুরুষদের সংহার করিয়া ফিরিতেছে।'

শুনিয়া ভয় ও আতঙ্কে আমার অন্তর শীতল পাষাণবৎ স্থবির হইয়া আসিতেছিল। জর্জি কিঞ্চিদধিক কাল স্থাণু রহিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'এই মহাশাপ খণ্ডনের উপায় কী প্রভু?'

সেই মেঘপুঞ্জ হইতে সেই গম্ভীর এবং অলৌকিক স্বর ধ্বনিত হইল, 'অদ্য হইতে আনুমানিক তিন শত বৎসর পশ্চাৎ তোমার পরিবারে এক অসীম সাহসী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, অদ্ভুতকর্মা বীরশ্রেষ্ঠর আবির্ভাব হইবে। সেই পুণ্যকর্মা বীর নিজ সন্তানের প্রাণহানির শঙ্কাহেতু এই বিশালকর্মে ব্রতী হইবে। তৎকালে এক বিশেষ ক্ষণে পাঁচ শত বৎসর পূর্বেকার নক্ষত্রাদি পুনরায় একত্রিত হইবে, পৃথিবী হইতে মহাকাশ অবধি স্থাপিত হইবে অদৃশ্য আধিভৌতিক যোগাযোগ। শিকারের সন্ধানে প্রাচীন প্রেতের দল নরক হইতে উঠিয়া আসিবে। নক্ষত্রমালা উৎক্ষিপ্ত হইবার উপক্রম হইবে, পাতালের রক্ত ও বসাপায়ী লোলুপ আত্মাদের অস্থি ও মাংস পুনর্বার জাগ্রত হইবে। জাগ্রত হইবে দশ দিকের দিকপালের দল, মূর্তি পরিগ্রহ করিবে মৃত্তিকা সঞ্জাত পাপসমূহ। সেই রাত্রে আকাশ হইবে রক্তচক্ষু, বাতাস হইবে পূতিগন্ধময়। তৎকালে সেই সাহসী পুরুষের সম্মুখে স্বয়ং মৃত্যুর দেবতা জাগ্রত হইবেন। সেই বিশেষ নক্ষত্রকালে যদি তোদের উত্তরপুরুষ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সৃষ্টিবিন্দুটি প্রত্যর্পণ করিতে পারে, তবেই সেই অভিশাপ প্রত্যাহৃত হইবে, তৎপরবর্তী উত্তরপুরুষেরা পাপমুক্ত হইবে। তদন্তর, সেই মৃত্যুর দেবতা তোদের সেই পুরুষের প্রাণহরণ করিবেন, উহাই হইবে এই মৃত্যুপূজার শেষ বলি।'

কিয়ৎক্ষণের স্তব্ধতার পর পুনরায় উচ্চারিত হইল,

'কিন্তু ইহা একমাত্র তখনই সম্ভব হইবে, যখন ঈশ্বরী শক্তিতে বলীয়ান কোনো তন্ত্রসাধক তোর সেই উত্তরপুরুষের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবেন। ইহা ভিন্ন পাতাল হইতে নক্ষত্রলোকের পথ উন্মুক্ত করিবার আর কোনো উপায় নাই। একমাত্র কোনো সিদ্ধ সাধকই তাঁহার দৈবী ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া মৃত্যুর দেবতাকে আহ্বান করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নাই, নাই, নাই।'

এতটা লিখে চুপচাপ বসে থাকে লিও। দরজা বন্ধ, দরজার ওদিকে বয়ে যাচ্ছে ক্লান্তিকর জীবন, ঘরের মধ্যে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে মাসখানেক আগেই ঘটে যাওয়া সেই ভয়াবহ রাতের কথা মনে করে লিও।

সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর দু-জনে ছোটো নৌকোটি করে ফিরে আসছিল এপারে। আসার সময়ে খুবই অস্থির লাগছিল জর্জিকে, ক্রমশ ছটফটানি বেড়েই চলেছিল তার। দেখে একটু আশ্চর্যই হয়েছিল লিও, কাজ তো হয়েই গেছে। এই তো আর কিছুক্ষণ, তার পরেই তো তীরে পৌঁছবে নৌকো। এতেই এত ভয় পাওয়ার কী আছে?

কালো ভারী সিসের মতন নিস্তরঙ্গ জল। জল শেষ হলে মাটি। মাটি শেষ হলে দিগন্ত। দিগন্তে মিশেছে তারায় ভরা আকাশ। থেকে থেকেই সেদিকে চোখ চলে যাচ্ছিল লিওর। আহা, কী অপরূপ দৃশ্য! যেন রেশমি মখমলের চাদরে কেউ অকাতরে ঢেলে দিয়েছে ছোটো-বড়ো হিরের কুচি। এই ক-দিনে লিওকে অনেক নক্ষত্রমণ্ডল চিনিয়েছে জর্জি। বইঠা টানতে টানতে আকাশের দিকে তাকিয়ে সেইসব নক্ষত্রদের চিনে নেওয়াটা একবার ঝালিয়ে নিচ্ছিল লিও। তারপর কিছু একটা বলার জন্যে মুখ নামিয়ে জর্জির দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে যায় সে।

বইঠা টানছে বটে জর্জি, কিন্তু তার চোখে-মুখে এক অসম্ভব অস্থির আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে যেন। এদিকেওদিকে তাকাচ্ছে বার বার, উদ্ভ্রান্ত চোখে লিওকে দেখছে, আর বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। অবাক

হয়ে সেদিকে চাইতেই আশেপাশে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে আপনা থেকেই থেমে গেল লিও।

নৌকোটা তীর থেকে আর বেশি দূরে নয়, আশি নব্বই গজ হবে মাত্র। লিও তাকিয়ে দেখল তাদের নৌকো ঘিরে ছোটো-বড়ো বিভিন্ন আকারের বুড়বুড়ি উঠতে শুরু করেছে হ্রদে। তার মধ্যে কয়েকটা রীতিমতো বড়ো হওয়া শুরু করেছে। সেদিকেই অবাক হয়ে তাকিয়েছিল লিও। তারপর একটা জিনিস দেখে কী যেন একটা মাথায় ঘাই মারতে লাগল তার... গাঢ় কালো রঙের তরল যেন ফুটতে ফুটতেই একটু করে সরে যাচ্ছে। আর তার যায়গায় জেগে উঠছে ছোট্ট ছোট্ট ঘূর্ণি। প্রথমে ধীরে এবং পরে দ্রুত সেই ঘূর্ণিগুলো বড়ো হয়ে উঠছে আর তৈরি করছে নানা আকারের ঘূর্ণিস্রোত!

এতক্ষণে মুখ খুলল জর্জি, বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঝাঁপ দাও, এক্ষুণি জলে ঝাঁপ দাও লিও... আর সময় নেই... ঝাঁপাও... এক্ষুণি...' হতভম্ভ হয়ে গেল লিও। অক্টোবর মাসে এই বরফঠান্ডা জলে ঝাঁপ দেওয়ার মানে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ডেকে আনা। জর্জি কি পাগল হয়ে গেছে? জেনেশুনে লিওকে এর মধ্যে ঠেলে দিতে চাইছে? আর হয়েছেই বা কী? এসব ছোটো ছোটো ঘূর্ণি নানা কারণে আসেই... নৌকো তো আর বেশি দূরে নেই, নব্বই গজ হবে বড়োজোর। দুই ভাইতে মিলে জোরে বইঠা টানলে আর কতক্ষণ... ভাবতে ভাবতেই ছোটো নৌকোটা এক বার সজোরে দুলে উঠল। দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো জলেই পড়ে যেত দু-জনে। মনে হল জলের নীচে কে যেন দু-হাতে নৌকোটা ধরে সজোরে এক বার ঝাঁকিয়ে দিল। আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল জর্জি, 'ঈশ্বরের দোহাই লিও, ঝাঁপ দাও এক্ষুনি। তীরে পৌঁছবার আগে এদিকে তাকাবে না। কথা দাও তুমি, কথা দাও।' হাঁ করে দাদার দিকে তাকিয়ে থাকে লিও। ঘণ্টাখানেক আগেই মৃতদের জগৎ জাগিয়ে তুলেও কুশলী ও স্থিতধী ছিল যে লোকটা, তার সঙ্গে এই জর্জির কোনো মিলই নেই। অজানা আতঙ্কে ও উত্তেজনায় কাঁপছে লোকটা। লিওর দিকে তাকিয়েই আরেক বার চিৎকার করে উঠল সে, 'এই হারামজাদা, কথা শুনতে পাচ্ছিস না? ঝাঁপ মার, এক্ষুনি জলে ঝাঁপ দে তুই...' অত্যন্ত অবাক হয়ে এই রেগে যাওয়া, কুবাক্য উচ্চারণ করা অসংলগ্ন ও উত্তেজিত লোকটাকে দেখছিল লিও। না, হতে পারে না, এই লোকটা তার দাদা হতেই পারে না...

ভাবতে ভাবতেই আবারও নৌকোটা ফের ভয়াবহ ভাবে দুলে ওঠে। কোনোরকমে দু-হাতে নৌকোর দু-পাশ ধরে নিজেকে সামলায় লিও। তার হাত থেকে বইঠাটি জলে পড়ে যায়, এবং মুহূর্তেই একটি বড়ো আকারের ঘূর্ণির মধ্যে তলিয়ে যায়। এইবার ভয় পেয়ে যায় সে, হে ভগবান, এটা আবার কী? এবার কী করে... 'নাম শুয়ার, জলে ঝাঁপ দে এক্ষুনি, নইলে তোর মাথা ফাটিয়ে ঘিলু বার করে দেবো বেজন্মার বাচ্চা', —বলতে বলতে উন্মত্তের মতো নিজের হাতের বইঠাটি মাথার উপর ধরে তেড়ে আসে জর্জি। সেই হিংস্র লোকটাকে দেখে ভয় পেয়ে যায় লিও। বলা যায় না, সত্যিই হয়তো মাথায় মেরে দেবে লোকটা...

ভাবতে ভাবতেই তৃতীয় ঝাঁকুনি, আরও প্রবল এবং ভয়ংকরতম। নৌকোটা প্রায় উলটেই যেত, জর্জিও প্রথমে বসে পড়ে। তারপর ফের পাগলের মতো উঠে দাঁড়ায় হাতে বইঠা নিয়ে, চোখে-মুখে সেই উন্মাদ আগ্রাসী ভঙ্গি। দ্বিবিধ আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে নেহাত বাধ্য হয়েই বাইরের কোটটা রেখে জলে ঝাঁপ মারে লিওনার্দো। এবং প্রায় জমে যায়। আর সপ্তাহ দুয়েক বাদে হয়তো জল বরফ হতে শুরু করবে এই এলাকায়। সেই বরফঠান্ডা জলে প্রথম ঝাঁপটা দিতেই যেন মনে হল হাজার মোটা দাগের বল্লম দিয়ে কেউ খোঁচাচ্ছে লিওকে। কয়েক গজ সাঁতার কেটেই বুঝল লিও, হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে তার। দাঁতে দাঁত লেগে ঠক ঠক করে কাঁপছিল সে। সারারাত ধরে যা যা হয়েছে, তাতে তার স্নায়ুকোষের ওপর যথেষ্টরও বেশি অত্যাচার হয়েছে। তার শরীরমন আর বিশেষ কিছু ধকল নিতে পারছিল না। ভেবেছিল সেসবের পালা বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ভুল ভেবেছিল সে, এইবার তার শারীরিক ও মানসিক সহ্যশক্তির চরমতম পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়েছে। এই পরীক্ষায় তাকে জিততেই হবে, দাঁতে দাঁত চেপে ভাবে সে। ভাজ পরিবারের রক্ষার একমাত্র উপায় তার কাছে, এমনটাই বলেছে জর্জি। যদিও শুধু তার কাছেই কেন সেটা তখনও বোঝেনি লিও। কিন্তু এত বড়ো দায়িত্ব সে ছেড়ে যেতে পারে না। কিছুতেই না। এত ঠান্ডাতেও তো

মানুষ বাঁচে, বাঁচে না? এই কিছুক্ষণের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না সে? তারই কত না পূর্বপুরুষ প্রাণ দিয়েছেন মৃত্যুর দেবতার হাতে? তাঁদের নামে, তাঁদের স্মরণে কিচ্ছু করতে পারবে না লিও, লিওনার্দো ভাজ?

শরীরের সমস্ত শক্তি, মনের সমস্ত ক্ষমতা, স্নায়ুর সমস্ত ইচ্ছা সংহত করে সাঁতার দেওয়া শুরু করল লিও।

প্রায় দশ মিনিট পর যখন তীরে উঠে থরথর কাঁপছে সে, ঘুরে এক বার নৌকোর দিকে তাকাল। তাকাল আর স্থির হয়ে গেল।

সারা দিগন্ত জুড়ে এখন ভূতুড়ে ছায়ার খেলা। হ্রদের ওপারে সেই বিশাল হোলার চার্চ, দাঁড়িয়ে আছে স্থবির বিভীষিকার মতন। দশমীর চাঁদ সরে এসেছে অনেকটা, দিগন্তের প্রায় অন্যদিকে। তার ক্ষীণ আলোয় যা দেখল লিও, সম্ভবত শেষ বিচারের দিন অবধি তার মনে থাকবে। নৌকোর চারিদিকে তৈরি হয়েছে অজস্র ছোটো-বড়ো ঘূর্ণি। আর সেই ঘূর্ণি থেকে উঠে আসছে শত শত জীবন্ত লতানে কী যেন। পাতালের কোন অতল থেকে ক্রমাগত উঠে আসছে সেইসব শুকনো শিকড়ের মতো জীবন্ত লতানে অভিশাপ...

লতা? না তো... লতা কই... ওসব তো...

সহসা শিহরিত হয়ে উঠল লিও। দেখতে পেয়েছে সে, এইবার সে দেখতে পেয়েছে সে। কিন্তু যা দেখেছে সেটা তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। এই পৈশাচিক দৃশ্য তাকে দেখতে হবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি! যেগুলোকে সে ভূতুড়ে লতা ভেবেছিল, সেগুলো আসলে হাত! শত শত কালো, শীর্ণ, অস্থিসর্বস্ব সেইসব হাত, হাতের আঙুল আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে সেই ক্ষুদ্র নৌকোটিকে, আর প্রবল আকর্ষণে চাইছে টেনে নিয়ে যেতে। নিয়ে যেতে চাইছে জলের তলায়, অতল গাঢ় নিঃসীমে। দৃশ্যটা আমূল নাড়িয়ে দিল লিওকে। শূন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রার জলে সাঁতরে আসার যাবতীয় কষ্ট ভুলে গেল সে। নির্নিমেষে সে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। যেন নরকের রসাতল থেকে উঠে আসছে প্রেতেদের সর্বগ্রাসী খিদে, উঠে আসছে তারা সাপের মতন, অভিশপ্ত লতার মতো। শয়ে শয়ে তারা উঠে আসছে সেই কালো জলের অতল থেকে। শীর্ণ বুভুক্ষু শিকড়ের মতো তাদের আঙুলগুলো একের-পর-এক পেঁচিয়ে ধরছে সেই ক্ষুদ্র নৌকোটিকে। শ-খানেক ভৌতিক হাত উঠে এসেছে নৌকোর ওপরেও, তারা মরণপাশে জড়িয়ে ধরেছে জর্জির পা, সমগ্র নিম্নাঙ্গ। ক্রমেই তাদের সেই মৃত্যুবাঁধন আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে, জড়িয়ে থাকে এমনভাবে যেন জর্জির শরীর আর সেই নৌকো এখন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। মৃত্যুর এই নিবিড় বাঁধন থেকে রক্ষা নেই, রক্ষা নেই কারও। আস্তে আস্তে ডুবতে থাকে সেই নৌকো। বিষাক্ত সাপের মতন হিংস্র হাতগুলো যেন আরও সজীব, আরও হিংস্র হয়ে ওঠে, যেন স্পষ্ট করে তাদের নারকীয় উল্লাসের শব্দ শুনতে পায় লিও। তার সমগ্র আত্মা থরহরি কেঁপে ওঠে এই দৃশ্য দেখে।

আর জর্জি?

ডুবে যাওয়ার শেষ মুহূর্ত অবধি নৌকোর মাঝখানে বীরের মতন দাঁড়িয়েছিল সে। সমগ্র নৌকো আর কোমর অবধি তার শরীর তখন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। হাত দুটো ওপরের দিকে তোলা ছিল তার, যেন নিজের ঈশ্বরের কাছে শেষ বারের মতো প্রার্থনা জানাচ্ছে সে। প্রার্থনা জানাতে জানাতেই, পঞ্চমীর চাঁদকে সাক্ষী রেখেই, লিওর আতঙ্কিত চোখের সামনেই নৌকোসুদ্ধু জলের নীচে তলিয়ে যায় জর্জি। ভাজ পরিবারকে মুক্তির আলো দেখানো জর্জিনহো ভাজ।

২০১৬। ১২ অক্টোবর, দশমী। আমোনা গ্রাম, বেতাল মন্দির, গোয়া

‘ভয় পেও না সাহেব। আজ তুমি এমন অনেক কিছুই দেখবে বা শুনবে যা তোমার বোধবুদ্ধি যুক্তির অতীত। তাতে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না, ভয় পাবে না। ভয় পেলেই কিন্তু মহাসর্বনাশ। জানবে যা দেখছ সব মায়া, কিছুই সত্যি নয়।’

গতকাল সকালেই দু-জনে ফ্লাইটে করে চলে এসেছেন গোয়া। উঠেছেন উত্তর গোয়াতেই, ক্যালাঙ্গুট বিচের কাছে। পর্তুগিজ কনসুলেটের একটা পার্মানেন্ট গেস্ট হাউস আছে এখানে। কাল সারা সকাল ধরে তাঁর এই গোয়া অভিযানের যাবতীয় ইতিবৃত্ত এই পণ্ডিতকে বলেছেন মার্টিনেজ। জানিয়েছেন সব কথাই, একটা কিচ্ছু বাদ দেননি। বর্ণনা করেছেন ইনকুইজিশনের নামে মিগুয়েলের হত্যাকাণ্ডের কথা, জানিয়েছেন সেই প্রাচীন অভিশাপের ইতিবৃত্ত। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত করেছেন মিগুয়েলের ডায়েরি আর অনুতাপে দগ্ধ হওয়ার কথা। বলেছেন মিগুয়েলের শয়তান আরাধনার কথাও। লিওনার্দোর ডিক্লারেশন প্রায় হুবহু বিবৃত করেছেন, জানিয়েছেন ফার্নান্দোর সঙ্গে মার্টিনেজের এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার ইতিকথা। সব কথাই খুলে বলেছেন তিনি, কিছুই বাদ রাখেননি। আর বলেছেনে তিয়াগোর কথা। তাঁর ধুঁকতে থাকা হৃৎপিণ্ডটার কথা, যাকে তিনি সেই সুদূর লিসবনে মিজেরিকর্দিয়া হাসপাতালের বিছানায় রেখে এসেছেন।

আশ্চর্য জীবনীশক্তি এই ভারতীয় ব্রাহ্মণের, অবাক হয়ে ভাবেন মার্টিনেজ। কাল এসে দুপুরের পরেই তিনি উধাও হয়ে গেলেন কোথায়। তারপর এসে উদয় হলেন বিকেল নাগাদ। নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে কীসব যেন করেন, ফের কোথায় বেরিয়ে যান তিনি। ফিরেছেন অনেক রাত করে, ততক্ষণে মার্টিনেজ ঘুমিয়ে কাদা।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই পণ্ডিতের ঘরে ডাক পড়ে মার্টিনেজের। সেখানেই আজকের রাতের এই অভিযানের প্ল্যান চূড়ান্ত করা হয়।

জায়গাটা ক্যালাঙ্গুট থেকে একটু দূর, প্রায় ঘন্টাদেড়েকের রাস্তা। সময়টাও সন্ধের শেষের দিকে। গাড়িটা বেশ খানিকটা দূরেই রেখে আসতে হয়েছে, কারণ গ্রামের মধ্যে গাড়ি নিয়ে ঢুকে অযথা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মানেই হয় না। ড্রাইভার অবশ্য মৃদু আপত্তি তুলেছিল, ওদিকে যে বিশেষ কিছুই দেখার নেই, এই ছিল তার বক্তব্য। তাকে কিছু এক্সট্রা পয়সা দেওয়ার কড়ারে চুপ করিয়ে রেখে দু-জনে পায়ে হেঁটে এসেছেন এতটা। গতকালই এদিকে এসেছিলেন কৃষ্ণানন্দ, দেখে গেছিলেন রাস্তাঘাট। তিনি গ্রামের বাইরের সুঁড়িপথটি ধরে ছোটো জঙ্গল পেরিয়ে দ্রুতপায়ে চলে এলেন মন্দিরের একেবারে সামনে। আজ এই চত্বর একদম শুনশান। দূরে কোনো ময়দান থেকে ঢাক ঢোল আর হইচইয়ের মৃদু আওয়াজ আসছে। একটু পরেই শুরু হবে দশেরার রাবণ পোড়ানো। তারপর সারারাত ধরে যাত্রা হবে পৌরাণিক আখ্যান নিয়ে। সমস্ত গ্রাম ঝেঁটিয়ে সেখানে গিয়ে তামাশা দেখতে হাজির, এইদিকে এখন দূরদূরান্ত অবধি জনমানব নেই।

মন্দিরটি ছোটোখাটো, ভারতের অগুনতি মন্দির যেমন হয় তেমনই। পোড়া ইটের মন্দির, মাথার ওপরে টালি দেওয়া। মন্দিরটা আবার দোতলা। দ্বিতীয় তলার মাথাতেও টালির আচ্ছাদন। চারিপাশে বিভিন্ন ফুলের আর ফলের গাছ লাগানো, তার কোনোটাকেই চেনেন না মার্টিনেজ। সামনের চত্বরটা সম্পূর্ণ খালি আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মন্দিরের প্রধান দরজা থেকে বেশ কিছুদূরে একটা বড়ো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন মার্টিনেজ। সংবিৎ ফেরে সেই ব্রাহ্মণের গলায়, কৃষ্ণানন্দ ডাকছেন তাঁকে। ধীর পায়ে এগিয়ে আসেন তিনি এবং একটি সাদা বস্ত্রখণ্ড তুলে দেন মার্টিনেজের হাতে। গম্ভীর গলায় বলেন, ‘বাকি সমস্ত পোশাক ছেড়ে এই কাপড়টা পরে নাও সাহেব। আর সেই শক্তিখণ্ডটি সঙ্গে এনেছ তো? ওটিকে হাতে নিয়ে এসে বসো আমার সঙ্গে।’ এই বলে তিনি ফিরে যান।

আদেশ পালন করেন মার্টিনেজ। তারপর ধীরপায়ে এগিয়ে যান সামনের দিকে। কৃষ্ণানন্দ তখন মন্দিরের প্রধান দরজা থেকে প্রায় কুড়ি ফুট দূরে মন্দিরের দিকে মুখ করে, দক্ষিণাস্য হয়ে একটি কুশাসনের ওপরে বসেছিলেন। পাশে আরেকটি কুশাসন রাখা ছিল। হাতের ইশারায় তিনি মার্টিনেজকে সেই আসনের ওপর পূর্বাস্য হয়ে বসতে বলেন। সামনে একটা মাটির পাত্রে আগুন জ্বলছিল, আর তার পাশে মাটিতে পেতে রাখা কাগজের ওপর স্তূপ করে রাখা ছিল কিছু গাছের ছালের গুঁড়ো।

‘ভয় পেও না সাহেব। আজ তুমি এমন অনেক কিছুই দেখবে, বা শুনবে যা তোমার বোধবুদ্ধি যুক্তির অতীত। তাতে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না, ভয় পাবে না। ভয় পেলেই কিন্তু মহাসর্বনাশ। জানবে যা

দেখছ সব মায়া। কিছুই সত্যি নয়।' এই বলে পাশে রাখা পাত্র থেকে খানিকটা জল অঞ্জলিবদ্ধ হাতে নেন আগমবাগীশ, বিড়বিড় করে তিন বার মন্ত্রোচ্চারণ করেন আর তারপর জলটিকে ভূমিতে ফেলে দেন। এই কাজ তিন বার করার পর সামনে একটি বড়ো সবুজ পাতা বিছিয়ে রাখেন। কোন গাছের পাতা, সেটা চিনতে ভুল হয় না মার্টিনেজের। ব্যানানা! দিস ইজ ব্যানানা লিফ।

সেই পাতার ওপর প্রথমে গাঢ় লাল রঙের কী একটা খানিকটা লাগিয়ে রাখেন তিনি। নিশ্চয়ই ভার্মিলিয়ন পেস্ট, ভাবেন মার্টিনেজ। তারপর সাদা রঙের একটুখানি সান্দ্র তরল রাখেন। তার সুন্দর গন্ধেই প্রকাশ পায় যে সেটা কীসের মিশ্রন, চন্দন! এরপর রাখেন জলে ধোওয়া একমুঠো চাল, তিনটি শিস আছে এমন দেখতে একরকমের ঘাস কিছুটা, বেশ কয়েকটা রেড হিবিসকাস ফুল আর একটা মালা। মোটা করে গাঁথা মালা। তাতে প্রচুর রকমের ফুল আছে, যার অর্ধেক মার্টিনেজ চিনতেই পারলেন না! আর পাতাটির ওইপাশে নৌকোর মতন দেখতে একটি তামার তৈরি জলপূর্ণ পাত্র।

'শক্তিখণ্ডটি এই পাতার ওপর রাখো সাহেব।' ধীরে ধীরে হাতের মুঠো খুলে সেই ঘনকৃষ্ণ শক্তিপীঠটিকে পাতার মধ্যিখানে রাখেন মার্টিনেজ। আর সঙ্গেসঙ্গে তাঁর মনে হয় যেন তাঁর চারপাশের পৃথিবীটা অকস্মাৎ একটু দুলে উঠেই স্থির হয়ে গেল। যেন এতদিন একটা বিশাল বড়ো গিয়ারহুইলের একটা ছোট্ট ঘাট ঠিকঠাক লাগছিল না। এক্ষুনি যেন হাতুড়ির একটা ছোটো ধাক্কায় সেটা ঠিক বসে গেল, বহুকষ্টে যেন এক প্রাচীন যন্ত্র ধীরে, অতি ধীইইইরে চলতে শুরু করল। 'শোনো সাহেব। এই আসন মন্ত্রসিদ্ধ আসন। যতক্ষণ তুমি এখানে বসে আছ কোনো মানুষ, ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, দানব কেউ তোমার একগাছি চুলও ছুঁতে পারবে না। যা খুশি হোক, দুনিয়া এদিক থেকে ওদিক হয়ে যাক, চন্দ্রমণ্ডল মাটিতে খসে পড়ুক, ভূমিকম্প হোক, সমুদ্র গ্রাস করতে আসুক, ধেয়ে আসুক দাবানল, কিছুতেই তুমি এই আসন ছেড়ে উঠবে না। যতক্ষণ তুমি এই আসনে বসে আছ, স্বয়ং যমরাজেরও সাহস নেই যে তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করেন। আর শোনো, এই যে দেখছ আগুন জ্বলছে, কিছুতেই যেন এ নিভে না যায়। নিভু নিভু হয়ে এলেই এই গুঁড়ো ছিটিয়ে দেবে। এই চলবে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া শেষ হয়।'

'প্রক্রিয়া কখন শেষ হবে পণ্ডিত?' এতক্ষণে কথা বলেন মার্টিনেজ। শান্ত সমাহিত কণ্ঠস্বর, কোনো আবেগের বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস নেই। ঠিক যে তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার আবেগহীন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অ্যাকশনে নামেন মার্টিনেজ, ঠিক সেরকমই ঠান্ডা মাথায়, শান্তচিত্তে, খোলা তরবারির মতো শিরদাঁড়া সটান করে কুশাসনে বসে আছেন ইউরোপের ইস্পাত, কর্নেল মার্টিনেজ ভাজ!

'আমরা প্রথমে কালভৈরবের আরাধনা করব সাহেব। তিনি সমস্ত ভীরুতা নাশ করেন, সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন ছিন্ন করেন। ইনি সময়ের রক্ষাকর্তা, সৃষ্টি ও প্রলয়ের চাবিকাঠি এঁরই হাতে। কালভৈরব অজ্ঞানপাশ ভেদ করেন ও বোধিচিত্ত জাগ্রত করেন, সাধককে দান করেন বরাভয়, দেখিয়ে দেন অভীষ্ট সিদ্ধির পথ। পিণাকপানি মহাদেবের ক্রোধ থেকে এঁর উৎপত্তি। ইনি প্রসন্ন হলে আর ভয় নেই সাহেব, দেবাদিদেব স্বয়ং প্রসন্ন হলে স্বর্গ মর্ত্য কি পাতাল, সমস্ত ভয় থেকে তুমি মুক্ত, বেতালের প্রতিশোধস্পৃহা থেকে তুমি মুক্ত। কালভৈরবকে প্রসন্ন করে আমরা সেই মহান বেতালকে আহ্বান করব সাহেব। তুমি প্রস্তুত থেকো।'

এই বলে ব্রাহ্মণ প্রথমে নিজের হাতের আঙুলগুলিকে বিচিত্র মুদ্রায় ধারণ করলেন। তারপর বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে সেই তামার পাত্র থেকে জল নিয়ে ছিটোতে লাগলেন চারিদিকে। তারপর তর্জনীর ডগায় লাল রঙের আর চন্দনের মিশ্রণ একসঙ্গে নেন তিনি। মধ্যমা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে খানিকটা সেই চালের দানা আর তিনটে শিসওয়ালা ঘাসের টুকরো তুলে ধরেন। তারপর সেই মিশ্রণটি শক্তিখণ্ডটির মাথায় লাগিয়ে দেন, ছিটিয়ে দেন চাল ও ঘাসের টুকরো। তারপর গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকেন, 'ভ্রাজচ্চণ্ডজটাধারং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং, দোর্দ্দণ্ডাত্তগদাকপাল মরুণস্রদ্বগবস্ত্রোজ্জ্বলম। ঘণ্টামেখলঘর্ঘরধ্বনিমিলজঝঙ্কারভীমং...'

স্থির বসেছিলেন মার্টিনেজ। হেমন্তের নির্মেঘ আকাশ। চারিদিকে ঝিরঝিরানি হাওয়া, গাছের পাতাগুলোয় ঝুমুরের আওয়াজ তুলছে। দূরদূরান্ত অবধি কেউ নেই। আকাশে দশমীর চাঁদ, অনেকটাই বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আলো বলতে চাঁদের মায়াবী নরম আলো আর সামনের এই অগ্নিকুণ্ডে জ্বলতে থাকা আগুন, যাতে মাঝেমধ্যে গাছের ছালের গুঁড়ো ফেলতে হচ্ছে মার্টিনেজকে। সামনে বসে থাকা লোকটি চোখ বুজে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করে চলেছে বিজাতীয় মন্ত্র সমূহ। লোকটিকে লক্ষ্য করেন মার্টিনেজ। এ তাঁর কেউ নয়, সম্পূর্ণ অনাত্মীয় একটি লোক। কে জানে কীসের কোন টানে তাঁর বিপদকে নিজের বিপদ বলে টেনে নিয়েছে। আধ ঘন্টাটাক পর মার্টিনেজের মনে হয় চারিপাশে সামান্য ধোঁয়াটে অস্বচ্ছতার সৃষ্টি হয়েছে যেন। যেখানে তাঁরা বসে আছেন, সেখান থেকে চার পাঁচ ফুট দূরে যেন ধীরে ধীরে নেমে আসছে ভারী ধোঁয়ার পর্দা। পরতে পরতে তার ঘনত্ব বেড়েই চলেছে। এত ধোঁয়া এল কোথা থেকে? আশ্চর্য হলেন মার্টিনেজ। আশেপাশে কিছুই আর দেখা যায় না ঠিকঠাক, মন্দিরের অবয়বও এখন অস্পষ্ট... মাথার ওপর তাকালেন মার্টিনেজ... আকাশও প্রায় ঢেকে এসেছে... হঠাৎ হলটা কী? ভাবতে ভাবতেই মাথা নামালেন তিনি, আর তাঁর হৃদস্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে এল!

এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অলৌকিক ভাবে তাঁদের মধ্যে আবির্ভাব হয়েছে এক প্রাণীর। একটি বিশালদেহী কুকুরের!

এই জীবনে ভয়ংকর কুকুর কম দেখেননি মার্টিনেজ। তিনি একজন আদ্যন্ত কুকুরপ্রেমী মানুষ। তাঁর নিজের বাড়িতেই পাহারা দেয় দুটো ভয়ালদর্শন রটওয়েলার। এ ছাড়াও ব্যানডগ, ম্যাস্টিনো, ক্যানারিয়ান ম্যাস্টিফ, বুলম্যাস্টিফ, বা জাগুয়ার শিকার করা ব্রাজিলিয়ান কুকুর ফিলা ব্রাজিলিয়েরো, কুকুর কম ঘাঁটেননি তিনি। এরা প্রত্যেকেই হিংস্র প্রজাতির কুকুর বলে অত্যন্ত কুখ্যাত। ডেঞ্জারাস ব্রিডের কুকুর ট্রেইন করে আনন্দ পান তিনি। কিন্তু তাঁর সামনে যেটি বসে আছে, সেটি এতই ভয়ংকর দেখতে, এতই ভয়াবহ তার উপস্থিতি, যে একটু ভয় পেতে শুরু করলেন মার্টিনেজ। কুকুরটা উচ্চতায় চার ফুটের কম হবে না, দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয়ের কাছাকাছি, অনুমান করলেন মার্টিনেজ। কুচকুচে কালো গা আর চোখ দুটো অস্বাভাবিক লাল। সারা মুখে একটা উগ্র, জান্তব ক্রোধ এবং ক্রূরতা মেশানো আছে। কুকুরটার মুখের দু-পাশ দিয়ে একটু একটু করে লালা ঝরছে। এ কুকুর যদি পাগল হয়, ভাবতেই একফোঁটা ঘাম শিরদাঁড়া বরাবর নেমে গেল মার্টিনেজের! প্রাণীটার প্রতিটি নিশ্বাসে কাঁচা মাংস ও রক্তের গন্ধ! উহ, কী বীভৎস। যেন নরক থেকে উঠে এসেছে এই ভীতিপ্রদ জন্তুটা। অথচ কুকুরটা কিন্তু কিছু করছে না। চুপ করে কৃষ্ণানন্দের সামনে থাবা পেতে বসে স্থির ভাবে লাল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে সেই ব্রাহ্মণের দিকে। যেন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে গম্ভীর গলায় উচ্চারিত সেই সুরেলা আবৃত্তি।

ঠিক সেইসময় আরেকটা! হুবহু অবিকল একইরকম আরও একটা ভয়ালদর্শন কুকুর ধোঁয়ার পর্দার মধ্যে থেকে এসে প্রথমটার থেকে একটু দূরে থাবা পেতে বসল। সেই এক দৃষ্টি, খরশান চোখে তাকিয়ে পণ্ডিতের দিকে! এইবার সতর্ক হয়ে উঠলেন মার্টিনেজ। যেটা ঘটছে, সেটা ঠিক স্বাভাবিক বুদ্ধির এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে কিনা, সেই নিয়ে সন্দেহ হতে থাকল তাঁর। তিনি খেয়াল করলেন যে কুকুর দুটির নজর তাঁর ওপর একদমই নেই। তারা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মন্ত্রকর্তার দিকে। এবং আরেকটা! আবার ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে আরেকটি কালান্তকদর্শন কুকুর এসে পণ্ডিতের পাশে বসল, পণ্ডিতের দিকে মুখ করেই।

এইবার ঘটনাটার অতিপ্রাকৃতিক দিক নিয়ে আর সন্দেহ রইল না মার্টিনেজের। তিন তিনটে এইরকম যমপুরীর প্রহরীর মতন ভয়াবহ দর্শন কুকুর এখানে আসা আর চুপ করে বসে থাকা কিছুতেই স্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে না। উত্তেজনায়, এবং বেশ কিছুটা ভয়ে তিনি স্থির কাষ্ঠপুত্তলিবৎ বসে রইলেন। ওদিকে কৃষ্ণানন্দের কোনো হুঁশই নেই। তিনি চোখ বুজে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে যাচ্ছেন, 'দেবরাজসেব্যমানপাবনাঙ্ঘ্রিপঙ্কজম ভালযজ্ঞসূত্রমিন্দুশেখরং কৃপাকরম। নারদাদিযোগীবৃন্দবন্দিতং দিগম্বরং কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবম্ ভজে।'

এর পরে আরও একটা!

একাদিক্রমে ছ-টা সেই বিশাল আকারের ভয়ালদর্শন কুকুর তাঁদের ঘিরে বসল। তাদের নিশ্বাসের আওয়াজ প্রতি মুহূর্তে ভয় ধরিয়ে দিতে লাগল মার্টিনেজের মতন শক্ত স্নায়ুর লোককেও। কাঁচা রক্ত মাংসের বমনোদ্রেককারী গন্ধে ভরে উঠেছে চারিপাশ। তাদের শ্বাসের ভারী শব্দে যেন চারিপাশের আবহাওয়াও ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। মার্টিনেজ বসে আছেন চিত্রার্পিতের মতন, খুব সাবধানে নিশ্বাস নিচ্ছেন। ভয়ে ও উত্তেজনায় তাঁর শরীর থেকে স্বেদবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে নীচের দিকে, ঘামে জবজবে ভিজে যাচ্ছেন তিনি। আড়চোখে নিজের হাতের দিকে তাকান তিনি, প্রতিটি রোম দাঁড়িয়ে আছে! অথচ এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কোনো হুঁশই নেই! তিনি সুরেলা গলায় গেয়ে চলেছেন, 'ভানুকোটিভাস্বরম্ ভবাব্ধিতারকং পরন্নী লকণ্ঠমীপ্সিতার্থদায়কং ত্রিলোচনম্। কালকালম্বুজাক্ষমক্ষশূলক্ষরম্কা শিকাপুরাধিনাথকালভৈরবম্ ভজে।'

ধীরে ধীরে মার্টিনেজের মনে হল তিনি যেন চারিপাশ থেকে আস্তে আস্তে বিযুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর চৈতন্য আর বোধ যেন তাঁর অস্তিত্ব থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, পরতে পরতে কী যেন উঠে আসছে তাঁর শরীর থেকে। তিনি যেন তাঁর দেহের বাইরে জেগে থাকা অন্য একটি সত্তা। পুরো দৃশ্যটাই যেন তিনি স্বপ্নে দেখছেন, তিনি আসলে এখানে নেই। আসলে তিনি ভাজ পালাসেতের চিলেকোঠার ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। একটু পর তাঁর দাদা রডরিগো তাঁকে ডাকতে আসবে, দুই ভাই মিলে আজ ঠিক করেছেন যে পিছনের বাগানে খেলতে যাবেন। ওই তো সিসিলিয়া, কিশোরী সিসিলিয়া। তাঁর দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসছে, যেমন হাসতো আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। হাত নাড়ছে তাঁর দিকে তাকিয়ে, তারপর একটি শিশুকে কোলে তুলে নিল... আরে ওই তো তিয়াগো... তিয়াগো তার দিকে তাকিয়ে হাসছে, হাত নাড়ছে...

হঠাৎ করে ঝটকা মেরে উঠে বসলেন তিনি। তিনি কি পাগল হয়ে গেলেন? এসব কী উলটোপালটা ভাবছেন তিনি? কোথায় রডরিগো? কোথায় সিসিলিয়া? তিয়াগোর জন্যে কোন মুল্লুকে এসে বিচিত্র সব তন্ত্রসাধনার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন তিনি। সেই কুকুরগুলো, উফ্ কী ভয়ংকর সব কুকুরগুলো...

চোখ রগড়ান তিনি, কোথায় কুকুর? কোথায় কী? সেই আগুনের কুণ্ড জ্বলছে সমানে। আর তাঁর দিকেই সটান তাকিয়ে আছেন কৃষ্ণানন্দ। তাকিয়ে আছেন সাগ্রহে, 'সাহেব কী হল তোমার?'

'কুকুরগুলো কোথায় গেল?' হতভম্বের মতন বলেন মার্টিনেজ, আর চারিপাশে তাকাতে থাকেন 'সেই ভয়ংকর ছ-টা কুকুর? উফ্, কী বীভৎস ছ-টা জন্তু। কোথায় গেল তারা?'

'ছ-টা কুকুর? ঠিক দেখেছ তুমি সাহেব?' আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন কৃষ্ণানন্দ।

'কী বলছ পণ্ডিত? দেখেছি মানে? তোমাকে যেমন দেখেছি, তেমনই তাদেরও দেখলাম যে। ছ-টা কুকুর, কী ভয়ংকর, কী বীভৎস বাপ রে... যেন নরক থেকে উঠে এসেছে... উফ্...'

দু-হাত তুলে কপালে ঠেকালেন সেই ভূয়োদর্শী ব্রাহ্মণ, তাঁর গলা উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে, 'ধন্য তুমি সাহেব। ধন্য তোমার পুণ্যকর্ম। যাদের দেখেছ তারা কুকুর নয় সাহেব, তারা মানুষের ষড়রিপুর রক্ষক, নিয়ন্তা। জাগতিক বন্ধনের প্রতীক তারা। তাদের দেখা পাওয়া মানে এই জীবনে তুমি উদ্ধার হয়ে গেলে সাহেব, তোমার যাবতীয় মোহপাশ ছিন্ন হয়ে গেল। তোমার যাবতীয় বিচারবুদ্ধি, মায়াবন্ধন, আজ শুদ্ধ হয়ে গেল। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যা পাপ করেছ, স্বয়ং কালভৈরব আজ নিজে এসে সেই পাপরাশি ধ্বংস করেছেন, তোমায় আশীর্বাদ করেছেন সাহেব। হা ঈশ্বর, কতই না হতভাগ্য আমি। এতদিন জপতপ ভজনপূজন করেও যে সৌভাগ্যের কণামাত্র পাইনি, তুমি অশেষ পুণ্যবলে আজ তার অধিকারী হলে, আমি ঈর্ষা করি তোমার ভাগ্যকে সাহেব', ব্রাহ্মণের প্রশংসা শেষই হতে চায় না। সংকুচিত হয়ে পড়েন মার্টিনেজ, 'কিন্তু পণ্ডিত, আমি তো ক্রিশ্চিয়ান। তোমার হিন্দু গড কি...'

'এক-শো-টা বাচ্চাকে প্রাণের বাজি রেখে উদ্ধার করার সময় ভেবেছিলে সাহেব, ওরা কোন ধর্মের? সেদিন যে বাচ্চা মেয়েটার জন্যে অতগুলো অমানুষের সঙ্গে খালি হাতে লড়ে গেলে, জিজ্ঞেস করেছিলে

মেয়েটা ক্রিশ্চান কিনা? কীসের ধর্ম সাহেব? কে কার ভগবান? পাপের যদি ধর্মাধর্ম না থাকে সাহেব, পুণ্যের কেন হবে?' চুপ করে থাকেন মার্টিনেজ। এখানে আসার আগে ফার্নান্দোও এমনই কিছু বলছিলেন।

এই পর মোটা মালাটি তিনি পরিয়ে দেন মার্টিনেজের গলায়, 'এইবারে আসল কাজ সাহেব। আমি সেই বেতালকে আহ্বান করব। তিনি আসবেন, তাঁর হাতে তুমি এই শক্তিখণ্ড তুলে দিও। তারপর দেখি কে জেতে, শয়তানের ভবিষ্যদ্বাণী না আমার গুরুর আশীর্বাদ। তুমি কিন্তু এই আসন ছেড়ে উঠবে না, যতক্ষণ না বেতালের আবির্ভাব ঘটে', বলে নিজে আসন থেকে উঠে দাঁড়ান।

এরপর দক্ষিণ দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন, থমকে দাঁড়ালেন, তারপর মৃদুকণ্ঠে কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। এরপর ফিরে এসে আসনে বসে আরও কিছু মন্ত্র বলতে বলতে আগুনের মধ্যে কিছু গুঁড়ো নিক্ষেপ করলেন। এরপর ফের উঠে দাঁড়িয়ে পূর্ব দিকে গেলেন, একই কাজের পুনরাবৃত্তি করলেন, ফের ফিরে এসে আসনে বসলেন। এইভাবে চারদিকের জন্যে চার বার উঠেলেন তিনি। এরপর এসে বসে, 'ওং হ্রীং ক্লীং শ্রীং ফট স্বাহা' বলে মেরুদণ্ড ঋজু করে ধ্যানে বসলেন। নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন মার্টিনেজ, এরপর কী হবে? আধ ঘণ্টা বাদে দূরে একটা বিদ্যুৎশিখা দেখতে পেলেন মার্টিনেজ। ঘন নীল দীপ্তিময় সেই শিখা, মনে হল যেন মন্দিরের সামনে নেমে এসেছে। কৃষ্ণানন্দ তৎক্ষণাৎ তার দিকে আঙুল তুলে বললেন 'তিষ্ঠ'। আশ্চর্যের বিষয়, সেই আলোকশিখা যেন থিরবিজুরি হয়ে সেখানেই অধিষ্ঠান করতে লাগল!

অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছেন মার্টিনেজ, হঠাৎ তিনি গুরুগুরু ডাকে সচকিত হয়ে উঠলেন। একী! বৃষ্টি হবে নাকি? এ তো মেঘের ডাক! ভাবতে ভাবতেই যেন আকাশ থেকে তাঁর হাঁটু ঘেঁষে কী একটা গড়িয়ে পড়ল, মার্টিনেজ সভয়ে তাকিয়ে দেখলেন, একটা মানুষের পায়ের হাড়! এরপর শুরু হল হাড়বৃষ্টি! কাঁচা হাড়, শুকনো হাড়, কাটা আঙুল, মাথার খুলি, কানের টুকরো, কিছুরই আর কোনো বাছবিচার রইল না। একের-পর-এক সদ্যকাটা দেহাংশ মার্টিনেজের দেহের বিভিন্ন অংশে পড়তে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি সহ্য করতে লাগলেন। তাঁর সারা দেহ রক্তে লাল হয়ে উঠল। হঠাৎ করে একটা কাটা মাথা তাঁর কোলে এসে পড়তে চমকে উঠলেন মার্টিনেজ। আরে...এ যে রডরিগোর মাথা! সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ, যা তিনি শেষ দেখেছিলেন অ্যাভেনিদা দ্য লিবারদাদের রাস্তায়, এক মহার্ঘ রেস্তরাঁর পেছনের গলিতে!

স্থির হয়ে বসেছিলেন মার্টিনেজ, তাঁর বুকটা মুচড়ে যাচ্ছিল। রডসি... রডসি... কত কষ্ট পেয়েছিলে তুমি? কে এসেছিল সেদিন তোমার মৃত্যুদূত হয়ে? মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করেছিলেন মার্টিনেজ, চোখ খুলে দেখলেন কোথায় কী? সব ভোঁ ভাঁ! অবাক হয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিলেন তিনি, এমন সময় ডান দিকের কাঁধে একটা শীতল স্পর্শ পেয়ে ঘাড় ঘোরাতেই স্থির হয়ে গেলেন তিনি। একটা মোটা মতন সাপ তাঁর ঘাড় বেয়ে মাথায় ওঠার চেষ্টা করছে। সাপটাকেও বিলক্ষণ চেনেন তিনি, কিং কোবরা, বিষধর সাপেদের রাজা! এদেশে বলে শঙ্খচূড়! এর এক ছোবলে হাতি পর্যন্ত মারা যায়! নিশ্বাস বন্ধ নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতন স্থির হয়ে রইলেন মার্টিনেজ। তারপর অনুভব করলেন যে তাঁর ডান হাঁটুতে সুড়সুড়ি দিচ্ছে কিছু একটা। অতিসাবধানে নীচে তাকালেন মার্টিনেজ।

অন্তত শতখানেক সাপ তাঁকে ঘিরে! সবকটাই দীর্ঘ ও ভয়ানক বিষধর! অগ্নিকুণ্ডের আলোয় এর মধ্যে ব্ল্যাক মাম্বা আর রাসেল ভাইপার চিনতে পারলেন মার্টিনেজ। তাঁর বাঁ-হাত পেঁচিয়ে উঠছে কালোতে হলুদে ওটা কী? সর্বনাশ, ও যে ইন্ডিয়ান ক্রেইট! যমের দোসর! দাঁতে দাঁত চিপে নিজেকে স্থির রাখলেন মার্টিনেজ। মায়া, সবই মায়া...বিড়বিড় করলেন তিনি। যতক্ষণ এই আসনে বসে আছেন... ভাবতে ভাবতেই শরীরে দুনো বল এল তাঁর। পেশি আলগা করে হাত বাড়িয়ে সেই আগুনে কিছু গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেন তিনি। ম্যাজিকের মতন সমস্ত সাপ উধাও!

এরপর শুরু হল চারিদিকে কান্না, চাবুক আর শিকলের শব্দ। একের-পর-এক মূঢ়, মূক, ম্লান মুখের ছায়াশরীর তাঁর সামনে দিয়ে চলে ফিরে বেড়াতে লাগল। তাদের পিছনে ভয়ালদর্শন একেকটা লোক, তারা চাবুকের সাঁই সাঁই আওয়াজ তুলে এদের পিঠে মারছে। আর ঝনঝানি শেকল জড়ানো হাত তুলে নিজেদের

বাঁচাবার জন্যে সে কী আকুতিবিকুতি সেই হতভাগ্যদের! সেই অসহায় কান্নার শব্দ, ফোঁপানো আর্তির আওয়াজ, করুণ অনুনয়-বিনয় যেন মার্টিনেজের কানের ভেতরে কেউ ঢেলে দিতে লাগল গরম সিসের মতন। খরদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলেন তিনি, সারা শরীর ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতন টানটান হয়ে রইল... এক বার, শুধু এক বার আজ্ঞা মিলুক এই ব্রাহ্মণের কাছ থেকে...

দেখতে দেখতে তারা কোথায় উধাও হয়ে গেল, চারিদিক এক অপার্থিব অলৌকিক কান্নার শব্দে আর্ত হয়ে উঠল। মার্টিনেজের সামনে কয়েক ফুট দূরে যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হল তিনটে মানুষের মূর্তির। দুটো সম্পূর্ণ উলঙ্গ পুরুষ যেন মারতে মারতে একটি উলঙ্গ নারীকে এদিকে নিয়ে আসছে। মেয়েটির করুণ কান্নায় চারিদিক ভেসে যেত লাগল। অমন ভীষণ মারের থেকে মুহূর্তের পরিত্রাণ চাইছে মেয়েটি, এক ফোঁটা জল ভিক্ষা চাইছে। জবাবে সে ভীষণদর্শন উলঙ্গ পুরুষ দুটি বার বার তার মাথায় ডাঙ্গশ মারছে। ধীরে ধীরে তারা সেই আগুনের কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে রক্তাক্ত, নগ্ন মেয়েটিকে চিনতে পারলেন মার্টিনেজ! এ যে সিসিলিয়া! চোখ বুঝলেন মার্টিনেজ। মায়া। সবই মায়া। চোখ খুললেন তিনি। সামনে কিছু নেই। কেউ নেই।

তারপর খট খট শব্দে ভরে গেল চারিদিক। কাদের যেন উল্লাসের খলখল হাসিতে চারিপাশ শিউরে উঠতে লাগল। সভয়ে চারিদিক চেয়ে দেখলেন মার্টিনেজ, রাশি রাশি কঙ্কাল যেন করতালি দিয়ে বেরিয়ে এল অন্ধকারের গর্ভ থেকে। ছায়ায় মেশানো তাদের অবয়ব, তারা করতালি দিয়ে নাচতে লাগল এই দুইজনকে ঘিরে। কে যেন একটা অশুভ খনখনে শব্দে হেসে উঠল, হাড়ের খটাখট শব্দে কান পাতা দায়। অসম্ভব বিশ্রী পূতিগন্ধে মার্টিনেজের পেটের নাড়িভুঁড়ি অবধি উঠে আসার জোগাড়! এমন সময় তিনি দেখলেন মন্দিরের দিক থেকে ধীর পায়ে কে যেন এক জন আসছে তাঁর দিকে। তার প্রসারিত দুই হাতে কী যেন একটা রাখা! আগুনের কাছাকাছি আসতে লোকটিকে চিনতে পারলেন তিনি, ফার্নান্দো! তার দু-হাতে কী তুলে এনেছেন ফার্নান্দো? লাশ। তিয়াগোর লাশ!

এইবার আর পারলেন না মার্টিনেজ। স্তম্ভিত চোখে চেয়ে রইলেন সামনে। তাঁর সমগ্র চৈতন্য ঘুরপাক খেতে লাগল। দুনিয়াটা তাঁর চোখের সামনে দুলতে লাগল ছেঁড়া পর্দার মতন। হল না? এত কাছে এসেও হল না? থরথর কাঁপতে লাগলেন তিনি, বুকটা মনে হল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। ফার্নান্দোও তাঁর দিকে সজল চোখে চেয়ে আছেন, যেন বলতে চাইছেন যে পারলেন না, তিনিও শেষপর্যন্ত পারলেন না। আর বসে থাকতে পারলেন না মার্টিনেজ, ভুলে গেলেন কৃষ্ণানন্দের সতর্কবার্তা। একটি বার, শেষ বারের মতন প্রিয়তম পুত্রের মৃতদেহ ছোঁয়ার জন্যে উদগ্রীব হলেন মার্টিনেজ। আসন ছেড়ে উঠতে যাবেন, এমন সময় চোখ খুলে হুংকার দিয়ে উঠলেন কৃষ্ণানন্দ, সব কিছু ভোজবাজির ছায়ার মতন মিলিয়ে গেল।

এরপর আকাশ বাতাস জুড়ে একটা হাহাকার উঠল। একটা করুণ কান্না যেন চারিদিক থেকে গলে গলে পড়তে লাগল তাঁদের ঘিরে। মার্টিনেজ খেয়াল করলেন একটা ক্ষীণ ধুলোর আলোড়ন যেন সাপের মতোই পাকিয়ে উঠতে শুরু করেছে মন্দিরের ঠিক সামনে। ঠিক তখনই কৃষ্ণানন্দ ফিসফিস করে, অথচ গম্ভীর গলায় বললেন, 'আসছেন, তিনি আসছেন।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেন মন্দিরের সামনের জমিতে সেই ক্ষীণ নীলবর্ণ স্থির বিদ্যুৎলতাটিকে ঘিরে ধুলোর ঝড় ক্রমশ আরও বেড়ে উঠল। ক্ষুধার্ত অজগরের মতন হাওয়ার স্রোত, ধুলোর রাশি এসে যোগ দিল সেই দুরন্ত ঘূর্ণিতে। চারিদিকের আকাশ বাতাস প্রকৃতি যেন গলে গলে মিশতে লাগল সেই ঝড়ে। স্থির চোখে তাকে দেখতে লাগলেন মার্টিনেজ। সেই করুণ আর্তি যেন, খেয়াল করলেন মার্টিনেজ, ধীরে ধীরে সেই আর্তস্বর যেন বদলে যাচ্ছে গর্জনে।

হ্যাঁ, গর্জন। যেটাকে হাহাকার বলে ভুল করছিলেন মার্টিনেজ, সেটা আস্তে আস্তে ক্রুদ্ধ গর্জনের আকার নিতে লাগল। স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি, একটা অব্যক্ত রুদ্ধ হতাশা যেন ক্রমশই মূর্তিমান হয়ে উঠতে লেগেছে তাঁদের সামনে। আরও লক্ষ্য করলেন মার্টিনেজ, সেই ধুলোর ঝড় যেন একটা মূর্তি পরিগ্রহ করার চেষ্টা করছে। না, চেষ্টা কই, ওই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তার হিংস্র অবয়ব। ক্রূর আক্রোশে দুই ঝোড়ো

হাত দিয়ে প্রবল হাওয়াকে মুঠির মধ্যে ধরতে চাইছে সেই মূর্তি। ধুলো আর ঝড়ে বানানো তার শরীর, আর সেই উলঙ্গতা যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে এই ছায়াময় বিভীষিকা। অসম্ভব নোংরা মড়াপচা গন্ধে ভরে গেল চারিদিক। ক্রুদ্ধ অথচ হতাশ গর্জনে যেন জেগে উঠলেন মৃতদের জগতের রাজা! আরেকটা জিনিস খেয়াল করলেন মার্টিনেজ। এই মূর্তি রোষে উন্মত্ত, অথচ অন্ধ। সে ক্রোধে হাতড়াচ্ছে চারিদিক, কিন্তু তাতে তার গতিবিধিতে যতটা ক্রোধোন্মত্ত ভাব আছে, ততটাই মিশে আছে অসহায়তা। কারণটা বুঝতে দেরি হল না মার্টিনেজের! তিনি দেখলেন যে মূর্তির বুকের কাছটা ফাঁকা! কে যেন হিংস্র আক্রোশে এই অমানুষী ছায়ামূর্তির বুকের ভেতর থেকে উপড়ে এনেছে তার হৃৎপিণ্ডটা। ওটাই যেন তার চোখ, তার অস্তিত্ব, তার চৈতন্য! যেন তারই খোঁজে সে দিশেহারা, তার অভাবেই সে বুঝতে পারছে না যে সে কোথায়!

কার মতন এই মূর্তি? কোথায় যেন পড়েছেন মার্টিনেজ বুক চিরে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নেওয়ার কথা? খুব চেনা চেনা লাগছে অথচ... চকিতে মার্টিনেজের মনে পড়ে গেল মিগুয়েলের ডায়েরির কথা। সেই হিন্দু প্রিস্টের ছেলেকেও খুন করা হয়েছিল জ্যান্ত অবস্থায় তার বুকের থেকে হৃৎপিণ্ড উপড়ে এনে! চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা যেন সরে গেল মার্টিনেজের। পাঁচ-শো, পাঁচ-শো বছর ধরে সেই নিহত হিন্দু পুরোহিতের খুন হওয়া ছেলের আত্মার দায়ভার বহন করে চলেছে এই বেতাল, সেই অভিশাপই দিয়ে গেছিলেন সেই পুরোহিত। এই বেতালই সেই মৃত্যুর দেবতা, কয়েক শতাব্দী ধরে এই বেতালের বুভুক্ষু আত্মাই ভাজ পরিবারের প্রতিটি জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রাণহরণ করে এসেছে। তাই কখনোই বোঝা যায়নি আততায়ী কে, মরণকালে কে উপস্থিত হয় সেই হতভাগ্যদের সামনে! লিওনার্দোর ডিক্লারেশনের প্রতিটি বাক্য যেন সজীব হয়ে অগ্নিআখরে ফুটে উঠল তাঁর চোখের সামনে। আজ পাঁচ-শো বছর পর সেই নির্দয় অমানুষিকতা যেন আরও বীভৎসতা বহন করে আনল মার্টিনেজের কাছে! আজ তার অন্তিম প্রতিশোধের সময়, আজ সেই ছায়াময় অশরীরীর শেষ হিসেব বুঝে নেওয়ার দিন।

সেই শক্তিপিণ্ডটি হাতে নিয়ে ভূতগ্রস্তের মতন উঠে দাঁড়ালেন মার্টিনেজ। আসনে বসে থাকার সময় শেষ হয়ে গেছে তাঁর। তিনি তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে ধরে সেই শক্তিপিণ্ডটি ধূলিময় বেতাল মূর্তির দিকে তুলে ধরলেন। সঙ্গেসঙ্গে মার্টিনেজের মনে হল কী যেন এক মহাশক্তিশালী চৌম্বক আকর্ষণ স্থাপিত হল এই শক্তিপীঠ ও বেতালের মধ্যে। ক্রুদ্ধ রিরংসায় মত্ত বেতাল যেন হঠাৎই এদিকে মুখ করে স্থির হয়ে গেল। হিংস্র পশু যেমন শিকারের গন্ধ পেলে স্থির হয়ে যায়, বাতাসে কীসের যেন অশরীরী স্পন্দন এসে সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নিল সেই বেতাল মূর্তির। আরও অনুভব করলেন মার্টিনেজ, তাঁর হাতে ধরা শক্তিপীঠটি হঠাৎ করেই অসম্ভব গরম হয়ে উঠতে লাগল। এত গরম যে তাকে হাতে ধরে রাখা যায় না। দু-আঙুলে তাকে ধরে রাখতে কষ্ট হতে লাগল মার্টিনেজের। কে যেন অমোঘ আকর্ষণে টানছে সেই শক্তিপীঠটিকে, টানছে সেই বেতালমূর্তির দিকে। সেই ছায়ামূর্তি সতর্কতার সঙ্গে এদিক-সেদিক মুখ ঘুরিয়ে শেষে এদিকে তাকাতেই দেখলেন মার্টিনেজ, অবয়বহীন সেই কাল মূর্তিতে দপ করে জ্বলে উঠেছে দুটি চোখ! আর সেই আগুনে দৃষ্টি মেলে এদিকেই তাকিয়ে আছে সে। বেতাল! তারপর সেই বেতালের দুই হাত যেন উঠে এল এদিকে। সেই শরীরী ভাষা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না মার্টিনেজের। আর পারলেন না তিনি, সেই অলৌকিক শক্তিখণ্ডটি সজোরে ছুঁড়ে মারলেন বেতালের দিকে।

যেন একটা আলোর বিস্ফোরণ ঘটে গেল মার্টিনেজ আর কৃষ্ণানন্দের চোখের সামনে। দপ করে যেন জ্বলে উঠল বিশ্বচরাচর। চোখ ধাঁধানো আলোর হাজার খানেক শব্দহীন রোশনাই যেন একসঙ্গে ফেটে পড়ল দু-জনের চোখে-মুখে। আকাশ জুড়ে একটা সুগভীর উল্লাসের স্বর যেন মহাসর্পের মতোই নেমে এল সেই জায়গাকে বেষ্টন করে, আকাশ থেকে যেন আতশবাজির মতোই খসে পড়তে লাগল নক্ষত্রমণ্ডল, অশ্লীল আনন্দের উন্মত্ত গর্জন বধির করে দিতে লাগল এই বিশ্বচরাচরকে... সেই আলোর নৃশংস উল্লাসে নীচু হয়ে বসে পড়লেন দু-জনেই। আর তখনই কে যেন মার্টিনেজের বুকের ভেতর বলে উঠল, পেরেছেন! তিনি পেরেছেন ফিরিয়ে দিতে সেই অভিশপ্ত শক্তিখণ্ডটিকে। পেরেছেন তিনি সেই শতাব্দীব্যাপী পাপের দায় খণ্ডন

করতে! পেরেছেন তাঁর পরিবারকে মুক্তির পথ দেখাতে, পেরেছেন পাঁচ-শো বছর ধরে চলে আসা একটি বৃত্তকে সম্পূর্ণ করতে। মুক্ত, আজ তিনি মুক্ত! মিগুয়েল থেকে শুরু করে জর্জিনহো, ফ্রান্সিসকো হয়ে রডরিগো... ভাজ পরিবারের প্রতিটি অকালমৃতের আত্মা আজ শান্তি পাবে। শান্তি পাবেন বুড়ো ফার্নান্দোও... আলোর সেই উল্লাস উদ্যাপন কমলে সটান উঠে দাঁড়ালেন মার্টিনেজ। দেখলেন সেই ছায়াবেতাল আজ পূর্ণ! মিশে গেছে তার বুকের ক্ষত। জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতন গভীর জিঘাংসায় জ্বলছে তার চোখ দুটি। এবং সেই চোখ দুটি তাকিয়ে আছে সোজা এদিকেই! সেই রক্তলোলুপ দৃষ্টির সামনে এই প্রথম বার ভয় পেলেন মার্টিনেজ। সেই দৃষ্টি যেন জ্বলন্ত লোহার শলাকা দিয়ে তাঁর চৈতন্যের মধ্যে, সমস্ত অনুভূতির মধ্যে অগ্নিঅক্ষরে খোদাই করে দিল একটি মাত্র শব্দ!

মৃত্যু!

এই প্রথম মৃত্যুভয় পেলেন মার্টিনেজ। জীবনে অনেক জীবন বিপন্ন করা প্রাণঘাতী কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন তিনি। সেখানে মুহূর্তের ভুলচুকে নিহত হতে পারতেন তিনি, তা ছিল তাঁর কর্তব্যের অংশ, প্রফেশনাল হ্যাজার্ডস! কিন্তু প্রতিবারেই তিনি উতরে গেছেন তাঁর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, দুর্জয় সাহস আর অসামান্য দক্ষতা দিয়ে। কিন্তু এই প্রথম তিনি বুঝলেন যে এর কোনোটাই আজ তাঁর কোনো কাজে আসবে না! তাঁর বহুপ্রশংসিত কর্মদক্ষতা আর অমানুষী সাহসের কোনো দরকারই নেই আজ। স্বয়ং মৃত্যু যদি পাশদণ্ড হাতে ঘাতকের রূপ ধরে সামনে দাঁড়ান, তাহলে আর কীসের কী?

থরহরি কাঁপতে লাগলেন মার্টিনেজ। তাঁর হাঁটু দুটো দুর্বল বোধ হতে লাগল। দরদর করে ঘামতে লাগলেন তিনি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সুগঠিত শরীর ভেসে যেতে লাগল অবিশ্রান্ত স্বেদে। তিনি আর এক পা-ও এগোবার শক্তি বা সাহস কিছুই পেলেন না। এবং ঠিক সেইসময়েই, সেই বেতাল মূর্তি তাঁর দিকে প্রথম পা ফেলল। মার্টিনেজের মনে হল এই যেন মৃত্যু তাঁর দিকে নিল তার প্রথম পদক্ষেপ।

প্রথম বারের মতন কৃষ্ণানন্দকে উত্তেজিত হতে দেখলেন মার্টিনেজ। সেই ব্রাহ্মণ এগিয়ে এলেন দু-পা, ডান হাত তুলে সরোষে উচ্চারণ করলেন, ‘তিষ্ঠ’। এক মুহূর্তের জন্যে হয়তো থমকালো সেই বেতালমূর্তি। তারপর যেন অনেক কষ্টে হলেও পরের পা ফেলল সে, কৃষ্ণানন্দের আদেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই।

বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করে আবার উচ্চগ্রামে চিৎকার করলেন কৃষ্ণানন্দ, ‘তিষ্ঠ’। ক্ষণকালের জন্যে ফের থমকাল সেই কাল মূর্তি, তারপর পরের পদক্ষেপে মাটি কাঁপিয়ে অগ্রসর হল আরও এক পা!

চকিতে নিজের আসনে ফিরে গেলেন কৃষ্ণানন্দ। বজ্রাসনে বসে জ্বলন্ত আগুনে আহুতি দিলেন কিছু মন্ত্রপূত চাল ও সিঁদুর চর্চিত দূর্বা ঘাস! দাউদাউ করে জ্বলে উঠল সেই অগ্নিকুণ্ড। বার বার মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই আগুনে নানা উপচার আহুতি দিতে লাগলেন তিনি। কিন্তু হায়, আজ যেন মৃত্যু তার অব্যর্থ গাণ্ডীবে অমোঘ তূণীর সাজিয়ে বসেছে! মুক্তি নেই, মুক্তি নেই মার্টিনেজের সেই নিশ্চিত মরণের হাত থেকে। বিফল হতে লাগল কৃষ্ণানন্দের যাবতীয় মন্ত্রোচ্চারণ। ধীরে কিন্তু আরও স্পষ্ট পদক্ষেপে সেই ধুলো ছায়ার মূর্তি এগিয়ে আসতে লাগল মার্টিনেজের দিকে।

ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল মার্টিনেজের। সারাজীবনে যা মনে রাখার মুহূর্ত আছে, সবই এক এক করে সিনেমার রিলের মতন তাঁর চোখের সামনে দিয়ে চলে যেতে লাগল। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল তাঁর। শুধু অস্ফুটে এক বার তাঁর মুখে উচ্চারিত হল, ‘তিয়াগো’।

ঠিক সেইসময়েই অসম্ভব গম্ভীরকণ্ঠে উচ্চারিত এই মন্ত্রগুলো ভেসে এল তাঁর কানে,

‘সর্বরুহাম মহাভীম ঘোরদ্রংষ্ট্রম হসন্মুখীম চতুর্ভুজম্ খড়গামুন্ডবরং ভয়ংকরম্ শিবম্মুন্ডমালা ধরম্ দেবী লোলজিহ্বান্ দিগম্বরম্ এবম্ সচ্চিন্তয়েৎ কালীম্ শ্মশানালয়বাসিনীম্ ক্রিং ক্রিং ক্রিং হ্রিং হ্রিং হুম্ হুম্ স্বাহা.... ওম তারেতুত্তারেতুরে সর্ব উপদ্রবেভয়ো রক্ষম কুরু স্বাহা ওম তারেতুত্তারেতুরে সর্ব দুঃস্বপ্নেভয়ো রক্ষম কুরুস্বাহা ওম তারেতুত্তারেতুরে সর্ব শত্রুভয়ো রক্ষম কুরু স্বাহা...’

কোনোরকমে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন মার্টিনেজ। বজ্রাসনে বসে দুই হাত দু-হাঁটুতে বিশেষ মুদ্রায় রেখে অনর্গল মন্ত্র উচ্চারণ করছেন কৃষ্ণানন্দ। ঘামে ভিজে যাচ্ছে তাঁর সর্বাঙ্গ, শরীরের সমস্থ মাংসপেশি ফুলে উঠেছে তাঁর, কপালে ঘনিয়ে উঠেছে গভীর ভ্রূকুটি ও স্বেদবিন্দু।

বেতালমূর্তি নিল তার পরের পদক্ষেপ, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে যেন ধেয়ে এল এক প্রবল তুফান! শনশন আওয়াজ তুলে হঠাৎই যেন তুমুল বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁদের ঘিরে। দমকা হাওয়ার উড়ে গেল সেই জ্বলন্ত অগ্নিপাত্র, সমস্ত পূজার উপচার। উড়ে যেতে লাগল আশেপাশের মাটি ও ধুলোর রাশি। ভয়ংকর ভাবে মাথা দোলাতে লাগল আশেপাশের বাগানের গাছগুলো, এই যেন তাদের শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলবে কে! মার্টিনেজের মনে হল মুহূর্তে মুহূর্তে যেন বেড়ে উঠছে সেই ঝড়ের তেজ। ক্রুদ্ধা প্রকৃতি যেন প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করেছেন পৃথিবীর টুঁটি ধরে সব কিছু নাড়িয়ে দেবেন বলে। মার্টিনেজের মনে হল আর কিছুক্ষণ এই ঝড় চললে তাঁদেরই যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে এই প্রবল হাওয়ার দামাল স্রোত।



একইসঙ্গে তিনি সামনে তাকিয়ে দেখলেন, এইবার যেন কিছু ব্যত্যয় এসেছে সেই বেতালমূর্তির চালচলনে। ঝড়ের সেই উন্মত্ত প্রকোপ যেন ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে চাইছে সেই ছায়ামূর্তিকে, আর সেই বেতালমূর্তি তাতে প্রাণপণ বাধা দিয়ে চলেছে। সেই প্রবল প্রলয়ঙ্কর ঝড় যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে চাইছে সেই বেতালকে, যেভাবে ময়াল সাপ পেঁচিয়ে ধরে তার শিকারকে। সেই বেতালমূর্তিও সমস্ত শক্তি সংহত করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাইছে, চাইছে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে ঝড়ের এক একটা ছোবল যেন ছিন্নভিন্ন করতে চাইছে সেই ছায়াশরীর। আর প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে নিজের অন্ধকারের প্রতিটি পরত যেন ধরে রাখতে চাইছে সেই বেতালমূর্তি। আর সেই ঝড়ের গগনভেদী গর্জন ছাপিয়ে ভেসে এল কৃষ্ণানন্দের গম্ভীর উদাত্ত আবৃত্তি,

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাং চ চণ্ডীকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥
সৌম্যানি য়ানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
য়ানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥
খড্গশূলগদাদীনি য়ানি চাস্ত্রানি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্রক্ষ সর্বতঃ।

সাপের চোখে চোখ রাখা ইঁদুরের মতন মোহগ্রস্ত হয়ে এই অনৈসর্গিক আসুরিক সংগ্রাম দেখছিলেন মার্টিনেজ। হঠাৎ করে পুরো দৃশ্যপটে একটি ক্ষীণ পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন তিনি। বাঁ-চোখের কোণা দিয়ে তিনি দেখলেন সামনের বেতাল মন্দিরের দরজা যেন ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। ঘাড়টা সামান্য ঘুরিয়ে মন্দিরের দিকে তাকালেন তিনি আর ওই বিপুল অনৈসর্গিক শক্তিমত্ততার মধ্যেও, আসন্ন মৃত্যুর মধ্যেও চমকে উঠলেন।

বেতাল মন্দিরের দরজা গেছে খুলে, আর সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি শিশু বালিকা!

এত আশ্চর্য জীবনে কখনো হননি মার্টিনেজ। এই বিপুল বিভীষিকার মধ্যে কোথা থেকে এল এই মেয়ে? এখনই কি তার এখানে আসতে হল? এতক্ষণ কী করছিল সে মন্দিরের ভেতর? এখন এর মধ্যে এলে যে শিশুটির সর্বনাশ হয়ে যাবে! বালিকাটির জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তিনি!

অথচ মেয়েটির কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র হুঁশ নেই। নয় কি দশ বছর বয়েস হবে তার, একঢাল কালো চুল হাওয়ায় উড়ছে উন্মাদিনীর মতন। দৃপ্ত পায়ে সে এসে দাঁড়াল মন্দিরের চাতালে। আর তখনই তাকে দশমীর চাঁদের আলো-আঁধারিতে সামান্য দেখতে পেলেন মার্টিনেজ। পরণে একটি লাল রঙের বস্ত্রখণ্ড শাড়ির মতো করে পরেছে সে। তার গায়ের রং ঘোর কালো। কিন্তু আহা, কালোর মধ্যেও অমন ভুবনমোহিনী রূপ কোনোদিন দেখেননি মার্টিনেজ। চোখ দুটো যেন ধক ধক করে জ্বলছে সেই মেয়েটির। ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে মাটিতে নেমে এল সেই বালিকা, আর ডান হাতটা তুলে যেন থামতে বলল সেই বেতাল মূর্তিকে।

মার্টিনেজের মনে হল সেই ছায়াবেতালের মাথার মধ্যে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। দু-হাত দিয়ে যেন মাথাটা চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সেই অশরীরী। তার সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল এইবার। ঝড়ের প্রকোপে এবার ধীরে ধীরে উড়ে যেতে লাগল তার শরীরের ছায়ার স্তর। একটু একটু করে অন্ধকারের পরত যেন টুকরো টুকরো অভিশাপের মতোই হাওয়ায় মিশে যেতে লাগল, প্রথমে ধীরে, পরে দ্রুত! আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে উঠতে লাগল সেই বেতাল শরীর। যখন শেষ ছায়ার টুকরোটিও মিশে গেল হাওয়ার সঙ্গে, একটা হাহাকারের শব্দ যেন মাটির ভেতর থেকে উঠেই আকাশের দিকে মিলিয়ে যেতে লাগল, মিশে যেতে লাগল সেই ঝড়ের মধ্যে! মাথা তুলে দেখলেন মার্টিনেজ, অন্ধকারের ছায়াপুঞ্জ ধাবিত হয়েছে উর্ধ্বাকাশে নক্ষত্রলোকের দিকে।

চরম বিস্ময়ে সেই শিশুটির দিকে তাকালেন মার্টিনেজ। আর একটা জিনিস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি! মেয়েটির উন্মুক্ত করতলে খেলে যাচ্ছে লাল রঙের বিদ্যুতের প্রভা। সেই কালোর মধ্যে যেন ঝিকিয়ে উঠছে দুইটি রক্তপায়ী তরবারির দীপ্তি। একইসঙ্গে বড়ো মায়াময় ও ভয়ানক ভীতিপ্রদ সেই আলোর খেলা।

চকিতে মনে পড়ে গেল মার্টিনেজের, লিওনার্দোর ডিক্লারেশন অনুযায়ী সেই শক্তিখণ্ডটির বর্ণনার কথা! আদিশক্তি। আদিমতম শক্তির বীজাধার। পরা ও অপরা, এই দুই শক্তি দুই রক্তবর্ণ সর্পের মতন খেলা করে সৃষ্টিবিন্দুর দেহ জুড়ে।

এ কে? কে এই মেয়ে? কোথা থেকে এল?

দু-পা পিছিয়ে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালেন মার্টিনেজ। তারপর মুখ ফিরিয়ে দৌড়ে গেলেন যেখানে কৃষ্ণানন্দ ধ্যান করছেন। কে এই মেয়ে? মৃত্যুর দেবতাকেও ফিরিয়ে দিতে পারে এমন অসামান্য অলৌকিক ক্ষমতা কী করে পেল সে? ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন তিনি, ‘পণ্ডিত ওঠো। দেখ একটি মেয়ে এসেছে কোথা থেকে, কী অসম্ভবকেই না সম্ভব করেছে সে! ওঠো পণ্ডিত, দেখো তাকে।’

চোখ খুললেন না কৃষ্ণানন্দ। তাঁর সর্বাঙ্গ থরথর কাঁপতে লাগল, দু-চোখ উপচে নেমে এল অশ্রুনদী। ফিসফিস করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘এসেছে? সে এসেছে সাহেব?’ বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন মার্টিনেজ, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে আসবে পণ্ডিত? এই মেয়েটা? তুমি জানতে তার কথা? তুমি জানতে সে আসবে?’ ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, ধরা গলায় বললেন, ‘সে আসে সাহেব, ডাকার মতন ডাকলে সে যে না এসে পারে না।’ কিছুই বুঝলেন না মার্টিনেজ, শুধু মূঢ়বিস্ময়ে এটুকুই জিজ্ঞেস করলেন, ‘কার কথা বলছ? এই বাচ্চা মেয়েটির কথা? ডাকলেই এ চলে আসে? এই মেয়েটি কে? তুমি একে চেনো, পণ্ডিত?’ দরবিগলিত অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে কৃষ্ণানন্দের বুক। চোখ বন্ধ করেই তিনি বহুকষ্টে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে শুধু বললেন, ‘চিনি সাহেব, খুব চিনি। ও আমার মেয়ে।’ ঘোর অবিশ্বাসের চোখে খানিকক্ষণ কৃষ্ণানন্দের দিকে তাকিয়ে রইলেন মার্টিনেজ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মন্দিরের দিকে ঘুরলেন মেয়েটিকে আরেক বার দেখবেন বলে।

কে কোথায়? কোথায় সেই বালিকা? মন্দিরের দরজা যেমন কে তেমন বন্ধ। মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে চলেছে, পরিষ্কার আকাশে উজ্জ্বল দশমীর চাঁদ। কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই। কে বলবে একটু আগে ঘটে যাচ্ছিল এক মহাপ্রলয়! সেই অলৌকিক যুদ্ধের চিহ্নমাত্র নেই। ভারি অবাক হয়ে পিছনে ফিরলেন মার্টিনেজ। এও কি মায়া? পণ্ডিতকে এর মানে জিজ্ঞেস করতে হবে।

কোথায় পণ্ডিত? কোথায় কে? কেউ কোত্থাও নেই! সব ফাঁকা!

হু হু করে একঝলক ঠান্ডা হাওয়া এসে যেন স্নান করিয়ে দিয়ে গেল আমোনা গ্রামের বেতাল মন্দিরের সামনে একলা দাঁড়িয়ে থাকা মার্টিনেজ ভাজকে।

২০১৮। ২৭ জানুয়ারি। গুঁইশো বিচ। পর্তুগাল

সি-বিচে বেশ বিকেল হয়ে এসেছে তখন। গুঁইশো পর্তুগালের খুবই জনপ্রিয় বিচ, তাই শীতের মধ্যেও কম লোকজন ভিড় জমায়নি এখানে। বিচের এক কোণে একটা ছাতার তলায় সত্তরোর্ধ বৃদ্ধটি বসে ঝিমোচ্ছিলেন। অদূরে হাঁটাচলা করছিলেন এক চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়সি সুগঠিত শরীরের পুরুষ। আর তাঁর হাত ধরে হাঁটছিল একটি বারো বছরের ছেলে। নানা প্রশ্নে সে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল তার বাবাকে। 'তাহলে বলছ অন্যকে কষ্ট দিলে পাপ হয় পাপা?'

'হ্যাঁ সোনা। কখনোই কাউকে কষ্ট দিতে নেই, দুঃখ দিতে নেই।'

'আর কেউ যদি আমাকে কষ্ট দেয়? আমার কোনো দোষ না থাকলেও?'

'তাহলে তুমি প্রতিবাদ করবে বাবা, অন্যায়ের জবাবে চুপ থাকাটাও অন্যায়। তবে জিসাস কি বলেছেন জানো তো? পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।'

'হুমম, আর যদি আমার খুব ইচ্ছে করে অন্যের কিছু নিয়ে নিতে?'

'সেটা অন্যায় বাবা। কখনো অন্যের জিনিসে লোভ করতে নেই, না বলে ছিনিয়ে নিতে নেই। ওতে পাপ হয়।'

'আচ্ছা পাপা, তুমি কি ম্যাজিক জানো?'

'কই, না তো।'

'জানো পাপা, আমাকে না দাদাই বলেছে ম্যাজিক শেখাবে। যাতে করে আমার অনেক পাওয়ার হয়, আর কেউ যেন না আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে।'

অপাঙ্গে এক বার বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেই পুরুষ। তারপর হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি তাঁর ছেলের সামনে, দুই হাত তার দুই কাঁধে রেখে বললেন, 'শোনো তিয়াগো। সবসময় সব্বার ভালো চাইতে হয়, সব্বাইকে ভালোবাসতে হয়। কখনো কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে নেই, কাউকে ঠকাতে নেই, কষ্ট দিতে নেই। দেখবে, কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাইবে না। সব্বাইকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করবে, দেখবে তোমার দরকারের সময় ঈশ্বর ঠিক কাউকে না কাউকে জুটিয়ে দেবেন। বি গুড টু দিস ওয়ার্ল্ড, দিস ওয়ার্ল্ড উইল বি গুড টু ইউ। তারজন্য ম্যাজিক শিখতে হবে না সোনা, ভালোবাসতে শিখলেই হবে। সবসময় মনে রাখবে, ভালোবাসাই হল সবচেয়ে বড়ো ম্যাজিক, সবচেয়ে বড়ো জাদু।'

তথ্যঋণ

ঠগী— শ্রীপান্থ
পৃথিবীর মাতৃসাধনা— নিগূঢ়ানন্দ
নরবলির ইতিহাস— দুর্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়
বৌদ্ধদের দেবদেবী— বিনয়তোষ ভট্টাচার্য
চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী— অলকা চট্টোপাধ্যায়
তান্ত্রিক সাধনা ও তন্ত্রকাহিনী— তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী
তিব্বতের রহস্যময় যোগ ও তন্ত্র— দেবদীপ
বিষয় বৌদ্ধধর্ম— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বৃহৎ তন্ত্রসার— কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ
ষটকর্ম্মদীপিকা— রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়
Confessions of a Thug— Philip Meadows Taylor
বিবিধ সহায়তা— Google

